পুরানো কথা

পুরানো কথা

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

নিবেদন

আমার "পুরানো কথা"-র এই অংশ ত্রৈমাসিক পত্রিকা "পরিচয়"-এ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থকার

পুরানো কথা

অনেক দিনের কথা। শাহজাদা সেলিম সবে জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেছেন, আর মেহেরউন্নিসাকে ছিনিয়ে এনে তাঁর জহান আলো করার ফন্দি আঁটছেন। সেই সময়ে দিল্লীর উপকণ্ঠে এক কুড়েঘরে অশীতিপর এক ফকীর বাস করেন। বৃদ্ধ হয়েছেন, আর ঘরের বাহির হন না। বহু লোক তাঁর কাছে আসে, পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য নয়, গল্প শুনতে। ফকীর রাজা-উজীরের পুরানো গল্প অনেক করেন। সব গল্প যে নিছক সত্য, তা বলা যায় না, তবে সত্য-মূলক বটে। আকবর বাদশাহের আমলে অনেক বৎসর ধরে প্রতিদিন এই শাহ সাহেব রাজধানীর এক প্রশস্ত রাজপথে ভিক্ষাভাণ্ড নিয়ে বসতেন। নীরবে বসে থাকতেন। কখনও "এক পয়সা দাও বাবা," বলে লোককে বিরক্ত করতেন না। তবু অযাচিত দানে তাঁর ভাণ্ড রোজ ছাপিয়ে উঠত। কেউ কেউ অলস অকর্ম্মণ্য বলে গালিও দিত না, এমন নয়। তবে ফকীর গালিগালাজ গায়ে মাখতেন না, ভিক্ষা-লব্ধ ধন নিয়ে রোজ সন্ধ্যায় আল্লার নাম করতে করতে বাসায় ফিরতেন। সেই রাজপথে অবিরাম জনস্রোত বয়ে যেত,—রাজা,

মহারাজা, আমীর, ওমরাহ, সিপাহী, সৌদাগর, সব রকমই। ফকীর সবাইকে চেয়ে চেয়ে দেখতেন, সবাইকে পরিচিত বন্ধু বলে মনে করতেন। এক শীতের সন্ধ্যায় খোদ বাদশাহ সেই পথে যেতে যেতে তাঁকে এক কাশ্মীরী শাল বখশীশ করেন। আর একবার মিঞা তানসেন তাঁকে দুই আশরফী দান করবার সময় সুর করে কি এক গজল গেয়ে দিয়েছিলেন। ফৈজী, বীরবল, আবুল ফজল, টোডরমল এঁদের হাত থেকে ত কতবারই ভিক্ষা পেয়েছিলেন! মানসিংহ কাবুল থেকে বিজয়বাহিনী নিয়ে ফেরবার পথে ফকীরকে পাঁচ আশরফী দিয়ে প্রণাম করে দুয়া চেয়েছিলেন। এই রকম নানা কাহিনী ফকীরের সঞ্চয় ছিল। ডালপালা দিয়ে এই সব পরের কথা বলাই ছিল তার বৃদ্ধ বয়সের পেশা। নিজের কথা বলতেন না, কারণ বলবার মত কিছু ছিল না। লোক-রঞ্জনই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

আমার অবস্থাও কতকটা এই শাহ সাহেবের মত। যে যুগে অর্দ্ধশতাব্দীর বেশী কাটিয়েছি সে যুগ আকবরের যুগের মত সমৃদ্ধ না হলেও ভারতের ইতিহাসে এক মহাসন্ধিস্থল। ফকীরের মত, আমিও এই পঞ্চাশ বৎসর ধরে অনেক অযাচিত দান পেয়েছি আর নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছি। সে সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা মিলিয়ে বন্ধুমহলে অনেক গল্পই করে থাকি। তারই দুদশটা নিয়ে আজ সাহস করে এই বড় আসরে হাজির হয়েছি। পড়ে কারও ভাল লাগলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। একটা ছোট গল্প বলে আমার মনের কথাটা আরও পরিষ্কার করে নিই। এক দিন ভোরের বেলায় এক বলদ

তার মুনিবের ক্ষেতে লাঙ্গল টানছিল। সেই সময় তার এক স্বজাতি সেখান দিয়ে যেতে যেতে তাকে সম্ভাষণ করে বললে, "কি ভাই, এত ভোরে করছ কি?" বলদ কিছু বলবার আগেই, তার শিঙ্গে বসেছিল এক মাছি, সে গম্ভীর গলায় জবাব দিলে, "আমরা ক্ষেতে লাঙ্গল দিচ্ছি।" ঐ মাছির মত আমিও ঘটনা-চক্রে শৃঙ্গোপরি অধিষ্ঠিত হয়েছি, কিন্তু "লাঙ্গল দিচ্ছি," এ কথা মনে করার মত কল্পনাশক্তি কখনও হয় নেই।

উত্তরাধিকার সূত্রে আমি বর্দ্ধমান জেলার লোক। বর্দ্ধমানের নাম না শুনেছেন এমন কি কেউ আছেন? যদি থাকেন, ত তাঁর জন্য নিজের জেলার গুণগান একটু করব। একদিন সুদূর দাক্ষিণাত্যের রাজকুমার সুন্দর বহু আয়াসে এইখানে বিদ্যালাভ করেন। লাভ করার আগে কিন্তু মশানে প্রায় নিজের মাথাটা দিয়ে ফেলেছিলেন। সুন্দর যা পারেন নেই, শের আফগান সপ্তদশ শতাব্দীতে সেটা করলেন। কাঁচা মাথাটা দিলেন, মেহেরউন্নিসাকে বিয়ে করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে। অনেক দিন গেল, আবার একজন এখানে মাথা দিলেন। তিনি হিন্দু বীর শোভাসিংহ। মোগলসৈন্যকে হারিয়ে দিয়ে মেদিনীপুর হতে অপ্রতিহত-গতিতে মুরশিদাবাদের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে বর্দ্ধমানে মতিচ্ছন্ন ধরল। রাত্রে শিবিরে রাজকুমারীর ছোরার ঘায়ে তাঁর হিন্দুরাজ্য স্থাপনেব স্বপ্ন শেষ হল। ইদানীং কই আর এ রকম ঘটনা বর্দ্ধমানে হওয়ার কথা শুনি নেই। সব চুপ চাপ।

এই বিখ্যাত জেলার এক প্রান্তে দামোদর পারে অতি

ক্ষুদ্র এক গ্রামে আমার বাড়ী। দুতিন পুরুষ আগে গ্রামখানা আমাদেরই ছিল। শুনেছি প্রপিতামহ-মহাশয় চাষীদের উপর রাগ করে তাদের জব্দ করবার অভিপ্রায়ে রাতারাতি এক নামজাদা জবরদস্ত জমীদারের কাছে বেচে দেন। সেই থেকে আমরাও নিজ গ্রামে প্রজা হয়ে গেলাম। নিকটস্থ দু একটা গ্রামের এক আধ পাই বখরা থাকার দরুন একেবারে প্রলেটেরিয়েট শ্রেণীভুক্ত হওয়া গেল না। "গাঁয়ের বাবুরা" নামটা রইল। পিতামহ নিরীহ লোক ছিলেন, তবে পুরানো বাড়ীর দেউড়ীর চালায় লুকান শখানেক মরচে-পড়া সড়কীর মাথা একবার ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। এক সময় সেগুলো ব্যবহারে লাগত মনে করলে দোষ হয় না। আমরা শাক্ত-বংশ বটে, কিন্তু সড়কী দিয়ে ত আর পাঁঠাবলি হয় না। বর্দ্ধমান জেলার নামও খারাপ ছিল। শুনতে পাই, যখন খ্যাতনামা কাপ্তেন শ্লীম্যান ঠগী দমন করে এলেন তখন কোম্পানী-বাহাদুর আমাদের জেলার লোককে শান্ত শিষ্ট করবার ভার তাঁকে দেন। তিনি এমন জোরে শান্তিস্থাপন করেছিলেন যে অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁর নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। এখনও খায় কি না, জানি না। কারণ আবার যা দিনকাল পড়েছে, গরুর কথা দূরে থাক, ছাগলেও বাঘসিংহীর জল কেড়ে খাচ্ছে।

আমার মামার বাড়ী রায়না। গ্রামটা এক সময়ে সকলেই জানত, তবে ডাকাতে রায়না এই নামে। বাঙ্গলা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ডাকাইতে জমীদারে অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। ভব্য শিষ্ট আমরা এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা পাই,

কিন্তু কথাটা সত্য। আমার মাতামহকে ছেলেবেলায় দেখেছি। সে কালের গ্রাম্য জমীদারের দোষগুণ সবই তাঁ'তে ছিল, কিন্তু মানুষের মতন মানুষ ছিলেন। তাঁকে দেখলেই একটা রোমান্টিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসাতে প্রাণ ভরে উঠত। তিনি রায়খাদে কি দামোদরের চরে ডাকাতি কখনও করেন নেই বটে, কিন্তু আশ-পাশের যত পাক, লেঠেল, ঠ্যাঙ্গাড়ে তাঁকে যমের মতন ভয় করত। অনেকেই লাঠি খেলায় তাঁর সাকরেদ ছিল, আর জানত যে তিনি নিজে লাঠি ধরলে দশজন লোকের মওড়া নিতে পারেন। দাদা-মশায়ের প্রধান কাজ ছিল প্রতিবেশী জমীদারদের সঙ্গে দাঙ্গা করা। এই করে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব খুইয়েছিলেন। আমার মনে আছে একদিন বলেছিলেন,"—কোম্পানী জেলায় জেলায় যে রকম কাজী কোটাল বসিয়েছে, আর ভদ্রলোকের বাঁচবার উপায় রাখলে না।" সেই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। আমাকে এক চমৎকার কুকরী ও আমার দুই ভাইকে এক তলোয়ার ও এক সাঁজোয়া উপহার দিয়েছিলেন। সেগুলোর ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু নির্দ্দেশ করেন নেই, তবে ইঙ্গিত করেছিলেন যে কুকরীটা সব রকম রক্তই খেয়েছে। আমি যে যুগের লোক, তাকে সব রকম খোরাক আর কোথা থেকে দেব, তবে অনেক অভ্যাসের পর ছেলেবেলায় দু চারটে ছাগমুণ্ড কেটেছি। স্বয়ং দেবী যখন আজ ছাগ-রক্তে তুষ্ট, তখন খড়োর তুষ্টি হয় নেই, মনে করার কারণ নেই। দাদামহাশয়ই বা ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে তাঁর হাতিয়ারকে নররক্ত কি করে যুগিয়ে ছিলেন, তা পাঠককে বোঝান দরকার। তাঁর রীতি এই ছিল যে

প্রতিপক্ষকে খবর না দিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা করতেন না। কারও সঙ্গে মন কষাকষি হলে তাকে এই রকম একটা চিঠি দিতেন, "কাল ভোর চারটের সময় আমি অমুক গ্রামে আমার কলুপুকুরে মাছ ধরতে যাব, আপনার রুচি হয় ত আমাকে বাধা দেবেন।" কলুপুকুরের মালিকী সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার আছে কি? বিপক্ষ রাত তিনটা হতে পুকুর ঘেরাও করে বসে থাকতেন। এঁরা চারটের সময় মশাল জ্বেলে লাঠি হাতে উপস্থিত হলে বল পরীক্ষার পর কলুপুকুরে মাছ ধরার হক সম্বন্ধে একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে যেত। কোম্পানীর আদালত উকীল জেঁকে বসবার আগে এর আর আপীল চলত না। সচরাচর এই রকমের হাঙ্গামায় নায়েব হুকুম দিলেই কাজ হত। বড় জোর তুচারটে হাত পা ভাঙ্গত। কিন্তু ঝগড়ার কারণটা একটু গুরুতর হলে লড়াই হত a l'outrance, অর্থাৎ খুনের মার। খুনের মারের বিশেষত্ব এই ছিল যে কর্ত্তা নিজে অভিযানের নেতা হয়ে গিয়ে হুকুম না দিলে লাঠি সড়কী উঠত না। হুকুমটা দিয়ে চলে গেলেই নিয়ম পালন হত, কিন্তু আমার দাদামহাশয় "Go on, lads"-এর পরিবর্ত্তে "Come on, lads" বলাতেই অভ্যস্ত ছিলেন। এই রকম কোনও শুভলগ্নে তাঁর কুকরীদেবীর নররক্ত পান ঘটে থাকবে। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে আমার মাতুলকুল বৈষ্ণব। কিন্তু তাতে কাজ বাধত না। বৌদ্ধ হিন্দু, শাক্ত বৈষ্ণব, আর্য্য অনার্য্যের মহা সমন্বয়ের ক্ষেত্র এই বাঙ্গলা দেশ।

একবার তাঁর কুকরীঠাকরুণকে এই রকম রক্তপান করানর পর দাদামহাশয় পালকী চেপে তু-আড়াই ঘণ্টায়

আটক্রোশ পথ ভেঙ্গে সদরে গিয়ে ভোর বেলা ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের সঙ্গে "জনাব, মেজাজ শরীফ" করে এলিবি প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর পালকীটার হাতল বড় করা যেত, আর আটজন বাহক একসঙ্গে কাঁধ দিয়ে সেটাকে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে পারত। সাহেব এতটা জানতেন না। তখন ত আর সি, আই, ডি, ছিল না!

সেকালে গ্রামে বিনা অনুমতিতে পুলিস ঢুকত না। আমার যে ভাই গ্রামে এখন আমাদের প্রতিনিধি, তিনি গৌরব করে বলেন, "বড় দা, আর ত সব গেছে, কিন্তু আপনাদের আশীর্ব্বাদে আজও গাঁয়ে পুলিস ঢুকতে দিই নেই।" আজ এটা কথার কথা, কিন্তু এক সময়ে এই জাঁকের একটা গভীর অর্থ ছিল। এই ভাবের জন্যই বাঙ্গলা বারোভুঁইয়া বাঙ্গলা ছিল, আর বারোভুঁইয়া ভাঙ্গতে সম্রাটদের এত কষ্ট পেতে হয়েছিল। রাজনীতি এসে পড়ছে, আবার গল্পের রাজ্যে আশ্রয় নিই। একটা রীতি সেকালে ছিল যে গ্রামের মাঝখান দিয়ে কেউ পালকী বা ঘোড়ায় চড়ে যেত না, গেলে গ্রামের বাবুর অসম্মান করা হত। একদিন আমার মাতামহ বৈঠকখানা বাড়ীতে পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে আছেন। একটা সামাজিক ব্যাপারের বিচার চলেছে। পাইক জন-কয়েক নীচে বসে আছে। এমন সময় দূরে পালকীবেহারার অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ব্যাপার কি দেখতে পাইক দুজন ছুটে গেল। তারা এসে জানালে যে পুলিসের একজন ছোকরা সাহেব পালকী করে যাচ্ছেন। কর্ত্তা তখন তাঁর এক মুসলমান সরদারকে বললেন,

"যা ত একবার, এ কি মগের মুল্লুক না কি!" সরদার একটু পরে ছোকরা সাহেবকে নিয়ে উপস্থিত হল। দাদামহাশয় সাহেবকে গ্রামের রেওয়াজ কি, তা জানালেন। সাহেবের মোটা বুদ্ধি, সে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে না চেষ্টা করে জোর ইংরেজীতে কি কি চীৎকার করে বললে। দাদামহাশয় ইংরেজী বুঝতেন না, বেতমিজ, গোস্তাগী ইত্যাদি কয়েকটা ফারসী শব্দ প্রয়োগ করে হুকুম দিলেন যে সাহেবকে গ্রামের বাহির দিয়ে চলিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। সরদার হুকুম পালন করলে, কিন্তু শোনা যায় যে তুচার ঘা পাতুকা প্রহারও করেছিল। তুদিন বাদ ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব দাদামহাশয়কে ডেকে পাঠিয়ে বললেন যে তিনি হীরালালবাবুকে আশরাফ আদমী বলে জানতেন, কিন্তু বাবু যখন সাহেবের ইজ্জৎ রাখতে জানেন না তখন তিনিও আর বাবুর ইজ্জৎ রাখবেন না। দাদামহাশয় নিতান্ত ভালমানুষ সেজে জিজ্ঞাসা করলেন যে কি হয়েছে। যা শুনলেন তাতে বুঝলেন যে ছোকরা সাহেব জুতো মারার কথাটা প্রকাশ করে নেই। তখন তিনি বললেন, "সাহেব, তোমরা ত কেউ কোনও দিন আমার গ্রামের পথে পালকী চড়ে যাও না। এ সাহেব নাদান, না জেনে গিয়েছিল, তাই আমার লোক তাকে গ্রামের বাহিরের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল। সেজন্য আমি মাফ চাইছি। তাঁকে ডাকাও, তিনি যদি বলেন যে আমার আর কিছু কসুর হয়েছে, তাহলে আমাকে সাজা দিও।" ছোকরা সাহেবটা এলেন কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলেন না যে জুতো খেয়েছেন। তখন দাদামহাশয় তার কাছে মাফ চেয়ে বললেন,

"সাহেব তুমি নূতন হাকীম, এখনও সব বোঝ না, কিন্তু এটা মনে রেখো যে তোমরা আমাদের মান না রাখলে আমরাই বা তোমাদের মান কি করে রাখব?" বড় সাহেবও এই মর্ম্মে দুচার কথা বলার পর শান্তি স্থাপন হয়ে গেল, দাদামহাশয় রোকশত নিলেন।

গল্পগুলো শুনে হয় ত অনেকে চিন্তাকুল হবেন, ভাববেন যে এই সব আধা ফিউডল্ জমীদারের ঘরে বর্ত্তমান যুগের ভাবপ্রবণ কাব্যশাস্ত্রবিনোদী তরুণের দল কি করে জন্মাল? কিন্তু কবিভাব বাঙ্গালীর মজ্জাগত। জয়দেব ঠাকুর যে দিন গেয়েছিলেন "দেহি পদপল্লবমুদারং", সেদিন হতে আজ পর্য্যন্ত এই ভাবের ধারা শুকায় নেই। লাঠিবাজী ও ললিতকলা মোগল যুগে কি রকম পাশাপাশি চলেছিল, তার আভাস ত রবিবাবু বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে দিয়েছেন। আমার দাদামহাশয়ের আমলে ত বাঙ্গলা দেশে সনেট আসে নেই, তখন যাত্রা, পাঁচালী, কীর্ত্তন, হাপাকড়াইয়ের দিন। তিনি এ সবেই সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। দিবারাত্র ছড়া কাটতেন, গজল আওড়াতেন, কখনও আবার যাত্রার পালা পর্য্যন্ত বেঁধে দিতেন। কিন্তু এই ব্যাপারেও জমীদারী চাল ছিল। একটা গল্প বলি। গ্রামে এক ভিখারী বৈষ্ণব গোপীযন্ত্র বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়াত। একবার সে কোথা হতে এক নূতন গান শিখে এসে মহা ধুম লাগিয়ে দিলে। গানটা ছিল "নদীয়ায় অবতরি ইত্যাদি।" গোসাঁই কিন্তু জোর করে গাইত, "নদীয়ায় রব তরী"। দাদা-মহাশয় সব বিষয়ে যেমন গ্রামের একচ্ছত্রী রেফারী ছিলেন, সাহিত্যেও তাই। তিনি গোসাঁইকে ডেকে অনেকবার

সাবধান করে দিলেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী! সে আবার একদিন বৈঠকখানার সামনে এসে খুব সুর করে "রব তরী" গাইতে লাগল। তখন আমার কবি-দাদামহাশয় হতাশ হয়ে জমীদার দাদামহাশয়ের শরণাপন্ন হলেন। হুকুম হল, "বোষ্টম ব্যাটাকে কয়েদ করে রাখ, যতক্ষণ না অবতরি বলতে শেখে।" কয়েক ঘণ্টা অবরোধে থেকে বৈষ্ণব শেষটা বুঝলে যে গোরাচাঁদ নদীয়ায় "অবতরণ" করেছিলেন, "রব-তরী" করেন নেই। এসব জমীদারের দল বাঙ্গলা দেশ থেকে আজ অন্তর্দ্ধান হয়েছেন। হয়ত ভালই হয়েছে! কিন্তু তাঁদের প্রভাব বোধ করি আজও পূরোদস্তুর বলবৎ রয়েছে। নইলে 'অটোক্রাট' বিহনে বাঙ্গলা দেশে কোনও কাজ চলে না কেন?

আর দেশের কথা বলব না। ক্রমশঃ প্যাক্স্ ব্রিটানিকা ও ম্যালেরিয়া দেশে জমী নিয়ে বসল। আমার বাবা গ্রাম ছেড়ে ইংরেজী শিক্ষা ও চাকরীর পথে বাহির হয়ে পড়লেন। আমারও দেশে জন্ম নেওয়া হল না। কোথায় বা দামোদর অজয়, কোথায় বা সেই কাঁকরে ভরা লাল মাটি, কোথায় বা ধানের ক্ষেতের সমুদ্রের মাঝে ছোট ছোট গ্রাম! জন্মালেম গিয়ে সুদূর উত্তরে হিমালয়ের কোলে এক স্বাধীন রাজ্যের মন্ত্রী-মহাশয়ের ঘরে। স্বাধীন রাজ্য শুনে কেউ হাসবেন না যেন! স্বাধীনতা জিনিসটা আপেক্ষিক। কোথায় যেন পড়েছিলাম, ভাণ্ড দুই মধুপানের পর মুনিবে গোলামে কোনও তফাৎ থাকে না, দুজনেই সমান স্বাধীন। যাক্, আমার এই জন্মস্থান খেলাঘরের স্বাধীন রাজ্য হলেও ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ

শালপ্রাংশু মহাভুজ আমাদের মহারাজকে দেখলে স্বতঃই মনে হত সেকালের কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, কোশলের রাজাদের কথা। ছেলেবেলাকার কল্পনা এঁকে নিয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত স্বপ্নই না দেখেছে! মহারাজ সাহেবদের সঙ্গে অনেক সময় কাটাতেন। এই নিয়ে নূতন রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্দীপ্ত দেশের লোক তাঁর নিন্দাবাদও অনেক করত। কিন্তু তাঁর নিজের জাতীয় গৌরব যে কত বেশী ছিল, তা যে তাঁকে কাছাকাছি দেখেছে, সেই জানে। দুই একটা গল্প এখানেই বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না, যদিও অনেক পরের কথা।

ইং ১৯০৩ সালে বৃটিশ বাদশাহীর ইজ্জৎ বাড়াবার জন্য লাট কার্জ্জন সাহেব দিল্লীতে দরবারের বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর কার্জ্জন বাহাদুরের নিজের গৌরব বৃদ্ধি যে একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তা সে সময়ের সবাই জানেন। বাদশাহের খুড়া মহাশয় এসেছিলেন বটে, কিন্তু সব বিষয়ে তাঁর হল দ্বিতীয় স্থান। জিনিসটা রাজাদের ভাল লাগে নেই, কিন্তু তাঁরা বৈতসীবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। দুই একজন, যথা বড়োদার মহারাজ গায়কোয়াড়, একটু মাথা খাড়া করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মোটের উপর মহামান্য কার্জ্জন লাটেরই জয় জয়কার হয়েছিল। যখন লাট সাহেব দিল্লী পৌঁছেন, আগে থেকেই রাজাদিকে (অন্ততঃ ছোট খাটো রাজাদিকে) প্লাটফর্ম্মের উপর সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। অনেক দেরী হওয়াতে কোমল-শরীর রাজবৃন্দ একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এক বেচারা ক্ষুদ্র কাঠিয়াবাড়ী রাজা কাসি পাওয়াতে সারি ছেড়ে যেই পেছনে গেছেন,

অমনি এক মহাকায় ইংরেজ সেনাপতি লাফিয়ে এসে তাঁর কাঁধ ধরে তাঁকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিলেন। রাজা মহাশয়ের কাসিই পেয়েছিল, কাশীপ্রাপ্তির কোনও ইচ্ছা ছিল না, তাই তিনি কোন প্রতিবাদ করলেন না। সেই রাজ-শ্রেণীতে শিখ, মরাঠা, রাজপুত, পাঠান সবাই ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভাবে এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, যে এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটা তাঁদের নজরেই পড়ল না। তখন আমাদের মহারাজ ধীরে ধীরে গজেন্দ্র-গমনে সারি ছেড়ে দুই একবার টহল দিলেন। দেওয়ার সময় খাপের ভেতর তলোয়ারটা একটু বোধ হয় ঝন্ ঝন্ করে থাকবে, কেন না ব্রিটিশ সেনানী সেবার চুপ করে গেলেন। গল্পটা ভাল হলেও সত্য।

এই গান্ধী-যুগের আগে আমাদের কেমন একটা অভ্যাস ছিল যে সাহেব দেখলেই মেরুদণ্ড অতি সহজে বেঁকে যেত, আর একটা অতি অমায়িক হাসি মুখখানাকে বিকৃত করে দিত। যাঁরা খুব বড় লোক, রাজা উজীর মানুষ, তাঁদেরও এ লক্ষণ দেখেছি, আমাদের মত সাধারণ লোকের ত কথাই নেই। আর একটা রোগ প্রবল ছিল, আমাদের খাওয়া পরা, ঘরদোর সম্বন্ধে আমরা সদাই জগতের কাছে বড় লজ্জিত থাকতাম। পরনের ধুতি, খাওয়ার অন্ন ব্যঞ্জন, অর্দ্ধনগ্ন আত্মীয় স্বজন, এ সব অতি সঙ্গোপনে সাহেব-চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখতাম। মহারাজের আর্য্যামি ছিল না, বরং ষোলো আনা সাহেবি ছিল, কিন্তু যে রোগের কথা উপরে বলেছি তার কবলে তিনি কখনও পড়েন নেই। বৎসরান্তে যে দরবারী ভোজ হত, তা সম্পূর্ণ বাঙ্গালী রীতিতে। মহারাজ নিজে ত

ধুতি পরতেনই, অনেক সময়ে তাঁর ইংরেজ কর্ম্মচারীরাও ধুতি পরে আসন-পীঁড়ি হয়ে দিব্য দু হাতে খেতেন।

একবার ভাদ্র মাসে মহারাজ তাঁর ফুটবল খেলোয়াড়দের কলকাতায় খেলিয়ে কুচবেহার ফিরছিলেন। সবাই ধুতি পরা, চটি পায়ে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে হঠাৎ ফ্রেজার লাট-সাহেব এসে উপস্থিত। তিনিও সেই গাড়ীরই যাত্রী। অর্দ্ধ নগ্ন হলেও রাজা ত বটে, কাজেই সাহেব পাশ দিয়ে যাবার সময় দাঁড়িয়ে দুদণ্ড সৌজন্য করে গেলেন। বোধ হয় সেই সৌজন্যের মধ্যে একটু প্রচ্ছন্ন Britannia rules the waves ভাব ছিল, হয়ত বা ছিল না। কিন্তু মহারাজ ঠিক করলেন সাহেবের সঙ্গে একটু বনেদী ধরণের সামাজিকতা করবেন। ট্রেন ছাড়ার পর বারাকপুরে একজন কর্ম্মচারী (A. D. C.) পাঠিয়ে লাট বাহাদুরকে খানায় নিমন্ত্রণ হল। লাট নিমন্ত্রণ কবুল করলেন। ট্রেন রাজপ্রতিনিধি পিঠে করে সদর্পে এগিয়ে চলল। ইতিমধ্যে মহারাজের পার্শ্বচরেরা শশব্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। স্বয়ং লাট খেতে আসবেন, অথচ মহারাজ কাপড় বদলানোর নামও করেন না! শেষে একজন প্রবীণ বয়স্য সাহস করে কথাটা পাড়লেন যে খানার পোষাক পরতে একটু সময় লাগবে, আর লাট এলেন বলে। মহারাজ হেসে বললেন, "লাট ত আর পোষাক খেতে আসছে না। তোর ইচ্ছা হয় এই গরমে জামা-জোড়া আঁটগে যা।" দুচার ষ্টেশন পরে লাট তলোয়ার বাঁধা কাপ্তান সঙ্গে করে এসে উপস্থিত হলেন। মহারাজ অতিথিকে আদব কায়দা মত অভ্যর্থনা করে খাবার কামরায় নিয়ে গেলেন ও বললেন,

"আমাদের আজ লুচী তরকারী খাওয়ার কথা, কিন্তু আপনার ইংরেজি খাদ্যও তৈরী আছে। যেমন আদেশ করবেন তেমনিই খাওয়া হবে।" জাতি গৌরবে, সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্‌সে, একটু ধাক্কা লাগল বোধ হয়, তবু সাহেব অমায়িক হাসি হেসে বললেন, "আজ আর সুরুয়া রোষ্ট নয়, আসুন আনন্দ করে সবাই লুচী খাওয়া যাক।" ষোড়শোপচারে লুচী সেবা হল। পানীয় কোন দেশের প্রথামত চলল, সে সম্বন্ধে আমি খোঁজ করি নেই।

মহারাজের একটা নিন্দার কথা এখানে না বলেও থাকতে পারছি না। তিনি আমাদের বাঙ্গলাদেশের জমীদার শ্রেণীর বড়লোকদের অনেক নোকসান করেছিলেন। এই ভদ্রলোকেরা প্রাণপণে কুচবেহারিয়ানা করতে যেতেন, কিন্তু ফল অনেক সময় বড় বিশ্রী হত। একটা উদাহরণ বলি। কুচবেহারের গাড়ীর উপর, চাকরের উর্দ্দির উপর, ও আসবাব পত্রে C. B. এই দুই অক্ষর ও একটা মুকুট আঁকা থাকত। সেই দেখা দেখি চারিদিকে B. B., P. P. ইত্যাদি ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠল। লোকে জানতে চাইলে না, যে বাগনান দুটো B কি করে হয়, পলাশীতেই বা দুটো P কোথা থেকে আসে! তার পর মুকুট, যে রাজার রাজ্য নেই, তার মুকুটই বা কোথায়? অথচ একটা কিছু তাজের মত অক্ষরের সঙ্গে ত দেওয়া চাই! আরও গোল হল যাঁরা নামেও রাজা নন তাঁদের। তাঁরা নিজের নামের অক্ষরটা বেঁকিয়ে দুবার লিখে, উপরে একটা গোলাকার ফুলের মালা দিয়ে দিলেন। আভিজাত্যের যদি কোনও দেবতা থাকেন ত তিনি এ সব

দেখে কি হাসিটাই না হেসেছেন! ক্রমশঃ বাঙ্গলার জমী-দারেরা স্বয়ং বিদেশে গিয়ে মন্ত্রদীক্ষা সংগ্রহ করে আনতে আরম্ভ করলেন। তখন আরও অদ্ভুত কত জিনিস ঘটতে লাগল। তবে মহারাজকে আর দায়ী করবার কারণ রইল না।

আর পরনিন্দা করে কাজ নেই। একটা গল্প আছে, নৃপেন্দ্র-কর্জ্জন-সংবাদ সেটা পরে যথাস্থানে বলব। এখন অনেকটা পথ পিছিয়ে কুচবেহারে যেতে হবে। আমার ছেলেবেলার দেখা জিনিস দুই একটা বলতে চাই। আমি ত একরকম বলেইছি যে আমার জন্ম, ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে, রূপোর ঝিনুক মুখে নিয়ে। শুধু তাই নয়, প্যারেড ময়দানে যে পেতলের তোপটা ছিল, সেটা সাতবার দাগা হয়েছিল। জ্যোতিষী-ঠাকুরের হুকুম ছিল যে তিন বৎসর বয়স হওয়া পর্য্যন্ত মাটিতে পা না পড়ে। তা পড়ে নেই, কোলে কোলেই ফিরতাম। অন্নপ্রাশনের দিন হাতী চড়ে মিছিল করে ঠাকুর প্রণাম করে এসেছিলাম। মহারাজ তাঁর অমাত্যকে সত্যি ভালবাসতেন।

একটু বড় হয়ে নিজের শৈশবের সব গল্প শুনতাম। রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্রের রূপকথাও কম শুনি নেই। এর ফলে আমার রূপকথার রাজ্যে জীবন কাটানোরই কথা। কিন্তু ক্রমশঃ ভারতের ভাগ্য-আকাশে এমন এক ধ্রুবতারা উঠল, যে গন্তব্য পথ সম্বন্ধে ভাবী ভারত-সন্তানের আর কোনও গোলযোগ রইল না। আমার জন্মের বিশ বৎসরের আগে দেশে যে তুফান উঠেছিল, তার জের রয়েই গেল। জগদীশ-

পুরের কুমারসিংহের অলৌকিক সাহস, গঙ্গামায়ীর তাঁর প্রতি অসাধারণ কৃপা, ইংরেজের মকরাক্ষনীতি, অর্থাৎ গরুর পালের আড়াল থেকে তাঁর উপর অগ্নিবাণ বর্ষণ, এই সব গল্প-কথা অহোরাত্র বাড়ীর হিন্দুস্থানী সিপাহী-বরকন্দাজদের কাছে শুনতাম। আমাদের বৈঠকখানায় একটা চীনা মাটির পুতুল থাকত, তার মাথায় একটা হাঁড়ির মত ফুলদানী ছিল। আমার গল্প-শিক্ষকেরা বলে দিয়েছিল, যে সেটা ঝাঁসীর রাণীর মূর্ত্তি, ঐ রকম হাঁড়ীতে আগুন ভরে তাঁর মাথায় চাপিয়ে তাঁকে কোম্পানী প্রাণে মারেন। কখনও বা শুনতাম, যে অশ্বত্থামা হনুমান প্রভৃতি পৌরাণিক বীরেরা এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদিকে কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগে অনেকবার দেখা গেছে, একদিন না একদিন নিশ্চয় হিন্দুর দুঃখে তাঁদের মন গলবে। সব কথাই বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করতাম। শৈশবের ইতিহাস শেখা এই রকমেই হয়েছিল। কুচবেহারে দুচার ঘর সাহেব ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল, খুব ছেলেবেলায় তাঁদের বাড়ী খেলাধূলো করতে অনেক যেতাম, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয় নেই, কারণ চারিদিকে লোকে কেবলই মনে করিয়ে দিত যে এরা আমাদের রাজার মাইনে-খাওয়া সাহেব, এ রকম সাহেব সাবেক কালেও অনেক ছিল। বাঙ্গলা পড়তে শেখার সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের আগেই "আনন্দ মঠ", "নীল দর্পণ" পড়ে চুকেছিলাম, বুঝি বা না বুঝি। আমাদের সচরাচর আবৃত্তির পদ্য ছিল, "বাজ্‌রে শিঙ্গা, বাজ্‌ এই রবে", "কত কাল পরে বল ভারত রে", "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়",

এই সব। ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ায় কিছুদিন পরেই সুরেনবাবুর জেল হল। আমরা সবাই কালো ফিতে পরলাম। সভা করে বক্তৃতা হল, সব বুঝলাম না, কিন্তু মনে একটা স্থির বিশ্বাস হল যে একটা কিছুর সূত্রপাত হচ্ছে। ইস্কুলে আমাদের ইতিহাসের বই ছিল হণ্টার সাহেবের ভারতবর্ষ। তার এক জায়গায় এই উল্লেখ ছিল, "His adopted son, Nana Sahib was the infamous leader of the Sepoy Mutiny"। মাষ্টার মহাশয় ক্লাসে এসেই শেষ কয়েকটা কথা কেটে দিয়ে লিখে নিতে বললেন, "The illustrious leader of the Great Sepoy war"। শিক্ষা এই ভাবেই চলল। স্বপ্ন যা দেখতে শিখলাম, তাও এই শিক্ষারই অনুগামী।

দেশ হতে তখনও পুরানো ব্যায়ামের অভ্যাস যায় নেই। খুব ছেলেবেলাতেই পিতৃ-আদেশে ভোরে আখড়ায় মাটি মাখতে হত। হয়ত কসরতের চেয়ে মাটি মাখা ও ছোলা খাওয়াটারই বহর বেশী ছিল, কিন্তু ছাড়ান ছিল না। সাঁতার ও ঘোড়ায় চড়াও নিত্যনৈমিত্তিকের মধ্যেই ছিল। কখনও কখনও ছুটির দিনে বাবা আমাদের দুচারজনকে মফঃস্বলে তাঁবুতে নিয়ে যেতেন। কদিন খুব ঘোড়ায় চড়ে নদীতে সাঁতার দিয়ে আনন্দ করে আসতাম। বড় ছেলেরা বন্দুক ছুড়তেও পেতেন। যথা সময় সে বিদ্যাও আয়ত্ত হল। তবে শিকারের দৌড় তখন পাখী পর্য্যন্তই ছিল, যদি চ বনের পশুরাও অপরিচিত ছিল না। বাঘ প্রায়ই আমাদের গোয়াল থেকে গরু নিতে আসত। ক্যাম্পে গেলে ত কথাই নেই, এক

একদিন তাঁবুর আশপাশেই ডাক শুনতে পেতাম। এই সব পাঁচ রকম কারণে Wholesome fear-টা (ভয়ডর) শিক্ষার অঙ্গীভূত হল না। পর-জীবনে এর জন্য ভুগতে হল অনেক।

২

ছেলেপিলের ভয়ডর না থাকাটা সেকালে যে একটা গুণের মধ্যে গণ্য হত, তা নয়। বরঞ্চ আমার বাবার আমলের ইংরেজীনবিশদের আদর্শ ছিল বিলেতের ভিক্টোরীয় যুগের Upper Ten-এর (অভিজাত মণ্ডলীর) অতিভব্যতা। সেই আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলতে তাঁরা একমনে সাধনা করে-ছিলেন, আর কবুল করতে হয় যে তাঁদের ঐ আন্তরিক সাধনা অনেকাংশে সফল হয়েছিল। লাঠিবাজী দেশ থেকে লোপ পেয়ে গেল। চিরদিনের ডানপিটে জমীদারের ছেলেরাও ক্রমশঃ শান্তশিষ্টভাবে পড়া মুখস্থ করতে লাগল। মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি লাঠিয়ালের হাত থেকে এটর্ণির হাতে গিয়ে পড়তে আরম্ভ হল। এতে সরকারের খুশী হওয়ারই কথা, কারণ শান্তিরক্ষার খরচ অনেক কমে গেল। কিন্তু ফলে তা হল না। সাহেবরাই আমাদের মোহ ভাঙ্গলেন। তাঁরা এই সুসভ্য চোস্ত ভালমানুষ নব্য বাঙ্গালী বাবুর কদর বুঝলেন না। কথায় কথায় কাবুলী বেলুচী গুর্খার সঙ্গে এঁদের তুলনা করে টিট্‌কারী দিতে লাগলেন। বাবুগুলো কি মানুষ, যাদের কেবল চোখ রাঙ্গিয়ে শাসন করা যায়—এ কি একটা দেশ, যেখানে সারা বছরে একটা বন্দুক ছুড়তে হয় না! টেবিলে

খেতে গিয়ে এরা ছুরী দেখে টেবিলের নীচে গিয়ে ভয়ে লুকোয়! এই রকম কত কথাই শুনতে হত! আমাদের তরফে উন্নতির কাজ জোরে চলল, ইজের কোর্ত্তা পরা হল, সমাজ সংস্কার আরম্ভ হল, ইংরেজী ধরণের রাজনীতি চর্চ্চারও গোড়া পত্তন হল, কিন্তু ইংরেজের অবজ্ঞার হাসি থামল না। অশন-বসন, ধরণ-ধারণ, সবেতেই দেশের লোককে পিছনে ফেলে ছুটতে লাগলাম। কিন্তু যার লাগি চুরী করি সেই বলে চোর, সাহেবের মন পেলাম না। তখন আস্তে আস্তে আবার হাওয়া ফিরল। নূতন slogan (মন্ত্র) এল, চুলোয় যাক উন্নতি, আগে ইজ্জৎ বাঁচাও। রাজনারায়ণবাবু, বঙ্কিমবাবু, এঁরা পাগলামির গতিরোধ করতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এখন নবীন যুগ-কবি সেই কাজে লেগে গেলেন। "বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান, পোষমানা প্রাণ" যে কি হাস্যাস্পদ জিনিস তা কবি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। "দিগন্তে বিলীন বিশাল মরুর" মাঝে ঘোড়সওয়ার আরব বেদুইনের ছবি এঁকে সামনে ধরে সবাইকে বললেন, কি সুন্দর এই ছবি, কি সুন্দর এই আরব, যার "বর্শা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ।" পৃথিবী জুড়ে বিষাণ বেজেছে, সবাই নিশান নিয়ে এসেছে, "কইরে বাঙ্গালী কই ?" বঙ্গমাতাকে প্রার্থনা করলেন তোমার ছেলেদের গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে দাও, এদের বাঙ্গালী করে রেখেছ, মানুষ করে দাও। কবির এই বজ্রকণ্ঠে ডাক, মার কাছে ব্যাকুল অনুযোগ, এই শুনতে শুনতে আমরা বড় হলাম। কিন্তু তখনও দেশের ঘুম-ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নেই। আমাদের মধ্যে মনে মনে দেশপ্রেমিক

অনেক তৈরী হলেন বটে, এমন ভাবুকও অনেক উঠলেন যাঁরা নিজেদের বীরত্বে আরব বেদুইন মনে করতেন, কিন্তু তাঁরা, ঘোড়ায় দূরে থাক, গাধায় চড়তেও শিখলেন না। কাজেই একপুরুষ আমরা দেশেরও কোন উপকার করলাম না, বিদেশী রাজারও কোন ক্ষতি করলাম না। এখন দেখি হাওয়া একেবারে ঘুরে গেছে। কবির বাঙ্গলা দেশে "শান্তিতে শয়ন" শেষ হয়ে আসছে। গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়ার দল বেড়েই চলেছে। বর্শা হাতে না থাকলেও ভরসা প্রাণে একরকম নিরুদ্দেশ হয়েছে। ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, তা এই যুগের রাজনৈতিকরা ঠিক করবেন। আমরা নির্দ্দোষ, কেননা নিষ্ক্রিয়। আমাদের দৌড় ছিল বড় জোর, "কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্"। গীতা আমাদের জন্য একটা বিশেষ রকমের জাহান্নামের ব্যবস্থা করে থাকলেও, আইনের চোখে আমরা বেকসুর খালাস।

এইবার একটু পুরানো গল্প বলে বাঙ্গালী ও সাহেবের মধ্যে সম্বন্ধটার আভাস দিতে চেষ্টা করি। ১৮৮৮ সালে বাবার সঙ্গে পূজার ছুটিতে দার্জ্জিলিঙ্গ গেছলাম। লোক সমাগম খুব হয়েছিল, তবে সাহেবই বেশী। বাঙ্গালীদের অধিকাংশই নব-প্রতিষ্ঠিত সানিটেরিয়মে জমা হয়েছিলেন। জজ চন্দ্রমাধববাবু, বর্দ্ধমানের উকীল নলিনাক্ষবাবু ও তারা-প্রসন্নবাবু, পাটনার গুরুপ্রসাদবাবু এই রকম অনেক গণ্যমান্য লোক সে-বছর এসেছিলেন। তা ছাড়া রাজদ্বারে প্রসাদপ্রার্থী বড়লোকের আনাগোনা ত ছিলই। কিন্তু এতগুলি বাঙ্গালী, এঁদের আমোদ-প্রমোদের কোন বন্দোবস্ত ছিল না।

রবিবার দিন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকেরা তবু সমাজে গিয়ে দুদণ্ড কাটাতেন। দার্জ্জিলিঙ্গের পুরানো বাসিন্দা মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী আমাদের বৈঠক ছিল। যখন তখন আমরা ছেলেরা সেখানে যেতাম, ও সে বাড়ীর রান্না পরীক্ষা করে আসতাম। বড়রা চৌরাস্তায় বসে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে জটলা করে খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতেন। সাহেবদের নাচ গান থিয়েটার কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁদের ক্লাবও সদা সরগরম। কিন্তু এক কুচবেহারের মহারাজ ছাড়া আর কাউকে তাঁরা ডাকতেন না।

হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়ীতে বহুজন সমাগম হল। আমি নিতান্ত ছোট ছিলাম, তাই দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আমার এক দাদা উকি মেরে সন্ধান নিয়ে এলেন যে, কর্ত্তারা মহা উত্তেজিত হয়েছেন, শুনেছেন যে, পরের দিন লাট বেলী সাহেব টাউন হলে এক বক্তৃতা করে বাঙ্গালীদের গালাগালি দেবেন। অবজ্ঞা করে দূরে ঠেলে রাখা এক কথা, আর প্রকাশ্যে গায়ে পড়ে গালাগাল আর এক কথা। ঠিক হল যে, নীরবে সহ্য করা হবে না, বর্দ্ধমানের তারাপ্রসন্নবাবু বাঙ্গালীদের তরফে চোখা চোখা কথায় জবাব দেবেন। আর আমাদের শক্ত তাকীদ দেওয়া হল যে, আমরা ছেলেরা টাউন হলে কোনও অসভ্যতা না করি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের মত হল। বেলী সাহেব বক্তৃতা করলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালীদের নিন্দাবাদ করলেন না। ভয়ে নয়, কারণ আমরা বালকবীরের দল সেখানে যাই নেই। যা

হোক, সকলেই এটা মনে করে আশ্বস্ত হলেন যে, সাহেবেরা বাঙ্গালীদের গায়ে পড়ে অপমান করতে চান না।

কিন্তু এ স্বস্তির ভাব বজায় রইল না। একদিন ম্যাল রাস্তার উপর গোরাদের ঘোড়া, বর্শা, তলোয়ার নিয়ে খেলার এক বিরাট আয়োজন হল। সার্ব্বজনিক রাস্তাটাকে ঘেরে বন্ধ করে দিলে। আমাদের বিশ্বাস হয়েছিল যে, সবাই খেলা দেখতে পাব। সাজ-গোজ করে কর্ত্তারা গেলেন, আমরাও গেলাম সঙ্গে। কিন্তু লালমুখো দৌবারিকের দল সাহেব ছাড়া কাউকে ভেতরে ছাড়লে না, দুই-একটা ঠাট্টা টিটকারীর কথাও বললে। বিরক্ত হয়ে কর্ত্তারা ঘরে ফিরে গেলেন। আমার দাদা ও আমি কিন্তু কৌশলে প্রবেশলাভ করে, একেবারে মেমসাহেবদের মধ্যস্থলে বসে, জাতীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখলাম। এমন সময় এক কাণ্ড হল। জরীর বক্কু পরা একজন পাহাড়ী জমীদার ঘোড়ায় চড়ে ফটক পর্য্যন্ত এসে, এক লাফে নেমে ভেতরে ঢুকতে গেলেন। যেই ঢুকতে গেছেন, চকিতের মত দুটো জিনিস হয়ে গেল। লালমুখো প্রহরীটা জমীদারের ঘাড়ে হাত দিলে, আর অমনি জমীদারের কুক্‌রীটা খাপ থেকে ফোঁস করে গোখরো সাপের ফণার মত বেরিয়ে পড়ল। ফণা দেখে প্রহরীর হাত কাঁধ থেকে খসে পড়ল। জমীদার গম্ভীর চালে ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমাদের কাছে তিনি আসতেই আমরা সসম্ভ্রমে তাঁকে স্থান করে দিলাম। নিজে মার না খেয়ে বীরত্বের মর্য্যাদা বজায় রাখার এমন সুযোগ কি আমরা ছাড়তে পারি! মনে একটু অব্যক্ত আনন্দের ভাব নিয়ে খেলাটা খুব উপভোগ করলাম। বাড়ী গিয়ে খুব

আহ্লাদ করে সব বর্ণনা করলাম। কিন্তু কর্ত্তাদের রাগ গেল না। পরদিন ফের বৈঠক বসল আমাদের বাড়ী। ফলে কয়েকদিন পরে মহা ধূমধাম করে সানিটেরিয়মে বিজয়া-সম্মিলনী হল। তিন ঘণ্টা ধরে নানা রকম আমোদ-প্রমোদ, দৌড়-ঝাঁপ ও খাওয়া-দাওয়া হল। সাহেব শেষ পর্য্যন্ত কাউকে নিমন্ত্রণ করা হল না, যদিও এ-বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। মনের আবেগে আমার দাদা ও আমি ইংরেজী বাঙ্গলা দুরকম জলখাবারই ভরপূর খেলাম। এই বিজয়া-সম্মিলনী সেই থেকে প্রতিবৎসরই হয়, কিন্তু এখন আর সে রকম উৎসাহ নেই। কাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আর উৎসব! সাহেবেরা ত পাহাড় একরকম আমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁদের বড় সাধের ক্লাবটিও কাল সাদা দাবার ছকের মত হয়ে গেছে। অনেক মনের দুঃখে সেদিন এক ইংরেজী কাগজে লিখেছিল যে, দার্জ্জিলিঙ্গ ক্রমশঃ নেটিব ও মশকের লীলাভূমি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, as bad as the plains (প্রায় নীচের মতনই)।

সাহেব ত চিরদিনই নানা রকমের হয়। বড় সাহেব, ছোট সাহেব, কটা সাহেব, মোটে সাহেব ও বাঙ্গালী সাহেব। যে সময়ের কথা বলছি তখন এই শেষোক্ত সাহেবদেরও উৎপাত কম ছিল না। তবে জাত-সাহেবদের হাতে এ বেচারাদের দুর্গতিও যথেষ্ট হত। ভালই হত, নইলে কংগ্রেসাদি ব্যাপারের বড় দেরী পড়ে যেত। একবার এক জজ সাহেব (ইনি ঠিক বাঙ্গালী ছিলেন না) পাহাড়ে গিয়ে সাহেবদের খুব বড় হোটেলে উঠেছিলেন। সচরাচর

সে হোটেলে বিশুদ্ধ শুভ্র ছাড়া অন্য বর্ণের সাহেব স্থান পেত না। এই রকম পাকা বিলেতী ব্যাপার বলে, সেখানে দু-চারজন মেমসাহেব ঝিও ছিল। আমাদের জজ বাহাদুরের শ্বশুড়বাড়ী বিলেতে হওয়ার দরুন তিনি কয়েকটা বিশিষ্ট অধিকার লাভ করেছিলেন। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে, এই রকম নির্ম্মল শুভ্র হোটেলে তিনি ঢুকতে পেতেন। হোটেলের কর্ম্মকর্ত্তা তাই এঁকে এবারও না বলতে পারেন নেই, কিন্তু কয়েকজন ছোকরা চা-বাগানের সাহেব ভয়ানক চটে গিয়েছিল। তারা স্থির করলে যে নিগারকে তাড়াতেই হবে। খুব গোপনে তারা ষড়যন্ত্র করলে হোটেলের এক মেম ঝির সঙ্গে। তার পরদিন সকালে চা-পানি খাওয়ার পর সবাই বারান্দায় বসে আছেন। সস্ত্রীক জজ সাহেবও রয়েছেন। এমন সময় চাকরাণীটা ময়লা জলে ভরা এক মুখ ধোবার গামলা এনে ঠক করে সেখানে নামিয়ে রেখে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে মেনেজারকে বললে, "স্যার, স্যার, কাঁচা রং, উঠে আসছে!" সমবেত সাহেব-মেমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে মুচকে হাসতে লাগলেন। জজ বাহাদুরের মুখ লজ্জায় বেগুনে হয়ে উঠল। তিনি সেই দিনই অন্যত্র উঠে গেলেন। এ অনেক দিনের কথা। আজকাল ত শুনতে পাই যে, শ্বশুর বাড়ী বাপের বাড়ী দুই ভারতবর্ষে এমন সাহেবও বড় বড় হোটেলে স্থান পান। কে বলে দেশের উন্নতি হয় নেই!

আগে কটা সাহেবে মেটে সাহেবেও ভয়ানক মন কষাকষি ছিল। এখন Loyalist সভা, Royalist সভা ইত্যাদি উপলক্ষে কংগ্রেসের মুণ্ডপাত করবার জন্য কতকটা সদ্ভাব

হয়েছে। রাজনৈতিক চাল চালাবার জন্য যে মৈত্রী, সেটা কত অদ্ভুত হতে পারে, তাত আমাদের এই কলকাতার নগর-পঞ্চায়তেই দেখা যায়। প্রায় ৪৫ বৎসর আগেকার একটা গল্প বলি। তখন সাহেবদের মধ্যে জাতিভেদ প্রবল। আমার এক জ্যাঠা মহাশয় সিমলা যাচ্ছিলেন। সহযাত্রী ছিলেন একজন মেটে সাহেব। প্রয়াগে লালমুখ প্রকাণ্ড দেহ এক পল্টনের সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে চাকর-বাকর, লোক-লস্কর, তলোয়ার-বন্দুক। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, যাকে বড় সাহেব বলে, এ সেই ব্যাপার। জ্যাঠামহাশয় ও মেটে সাহেব মহাশয় দুজনেই আগন্তুককে দেখে একটু সঙ্কুচিত হলেন। অর্থাৎ কেবল মনের সঙ্কোচ নয়, শরীরকেও যথেষ্ট সঙ্কুচিত করে বড় সাহেবের আরামে বসার জায়গা করে দিলেন। বড় সাহেব কিন্তু মেটে মহাশয়ের দিকে একবার তাকিয়েই, আমার জ্যাঠার পাশে এসে বসলেন। খুব আদব-কায়দা করে "Good Morning, Babu" বলে গল্প জুড়ে দিলেন। জ্যাঠামহাশয় ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি আশ্চর্য্য হলেন যে, সাহেব সাহেবের কাছে না বসে তাঁর কাছে এসে বসলেন। খানিকক্ষণ আলাপের পর কথাটা জিজ্ঞাসা করে ফেললেন। তাতে জঙ্গী সাহেব খুব চেঁচিয়েই বলেন, "ওদের সাহেব বোলো না, বাবু। ওরা অতি ছোট জাত। আগে জানতাম না। কি করে আমার শিক্ষা হল, বলি শোন।" বলে এক গল্প বললেন। কয়েক বছর আগে তিনি একবার রেলে সেকেণ্ড ক্লাসে যাচ্ছিলেন। মাঝখানে বসেছিল দুই মেটে সাহেব।

অপর দিকে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী বাবু ও তাঁর এক অল্প বয়স্কা মেয়ে। বাবুটি খবরের কাগজ পড়ছিলেন। খানিকক্ষণ বাদে হঠাৎ সাহেবের সেদিকে নজর পড়াতে দেখলেন যে, মেয়েটির মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে, আর নিতান্ত জড়সড় হয়ে ক্রমাগত একবার এদিক একবার ওদিক সরে সরে যাচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখলেন যে, ফিরিঙ্গী দুটো পা দিয়ে মেয়েটির পা ঠেলছে। তার অভিভাবক তখনও কাগজ পড়ছেন, আর, দেখতে পাচ্ছেন না নয়, দেখেও দেখছেন না। দুর্ব্বলের উপর এই অত্যাচার দেখতে দেখতে রাগে সাহেবের রক্ত মাথায় চড়ে গেল। একলাফে উঠে, কোনও কথা না বলে, সেই দুই ফিরিঙ্গী-নন্দনের ঘাড় ধরে তাদিকে নীচে ফেললেন, আর পরের ষ্টেশনে বার করে দিলেন। তারা নেমে যাওয়ার পর, বৃদ্ধ বাবুটি ছোটো-খাটো এক বক্তৃতা করে সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। গল্পটা বলে সাহেব জোর গলায় জ্যাঠামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ফিরিঙ্গী বন্ধুর সঙ্গে কেন বসলাম না, বুঝতে পারলে বাবু?" এ গল্প শুনেছি শৈশবে। তার পর অনেক ফিরিঙ্গীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে বন্ধু বলেও মেনে নিয়েছে। সুতরাং এ জাতের নিন্দা করায় আমার কোন আনন্দ নেই। এরা আমাদেরই আপনার লোক, সাহেবদের নয়। আর সত্যি বড় দুর্ভাগ্য জাত। আপনার বলতে কেউ নেই। বড়লোকে মিষ্টি কথা বলে গরীব আত্মীয়দের দিয়ে ঘরের ছোট কাজগুলো করিয়ে নেয়, তালুক-মুলুক কিনে দেয় না। এই সহজ সত্যটাও এরা বোঝে না, এমনই

নির্ব্বোধ। নির্ব্বোধ আমরাও ত বড় কম নয়। আপনার লোককে পর করে দেওয়াতে আমরা সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছি।

সাহেব বাঙ্গালীর কথা বলতে বলতে অনেক দূর এসে পড়েছি। পাঠককে আবার কুচবেহারে ফিরে যেতে হবে। একটা কথা বোঝাতে চাই যে, আমাদের কুচবেহারের আবহাওয়া অন্য শহরের আবহাওয়ার থেকে একটু আলাদা রকমের ছিল। একে ত দেশী রাজ্য, তায় একেবারে সীমান্তের উপর। প্রথম থেকেই কতকগুলো জিনিস আমরা দেখতাম, যা অন্য জেলার বাঙ্গালী ছেলেদের নজরে আসত না। রাজ্যটী এখন ছোট বটে, কিন্তু গৌরবে এ রাজবংশ কারও কাছে খাটো ছিল না। রাজপুতানার বাহিরে খুব কম রাজ্যই আছে, যাদের জন্ম কুচবেহারের আগে। আকবরের সময় এ রাজ্য যে বেশ বড় ছিল, আইন-ই-আকবরী দেখলেই জানা যায়। প্রথম রাজা বিশ্বনাথ হতে ধারাবাহিকভাবে এই নারায়ণী বংশের রাজারা হনুমান-দণ্ডের নীচে বসে উত্তর বঙ্গ শাসন করে আসছেন। ইতিহাসের চোখে কুচবেহার প্রাচীন কামরূপ রাজ্যেরই রূপান্তর। আর কামরূপ যে কত পুরানো, তা ইতিহাস পড়েও বোঝবার জো নাই। কুচবেহারের কিংবদন্তীর দিক থেকে দেখতে গেলে, প্রথম মহারাজ স্বয়ং মহাদেবের বংশসম্ভূত, ভুটানের দেবরাজের আত্মীয়। পুরাকালে দেবাদিদেব একবার তরাইয়ের বনে বেড়াতে এসে, হীরা ও জীরা বলে দুই বোনের ঘরে অতিথি হয়েছিলেন। দুই বোনের গর্ভে যে দুই সন্তান হয়, তারাই ভুটান ও বেহারের আদিপুরুষ। দুই রাজবংশই এই

পুরানো আত্মীয়তা মেনে নিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় কতবার দেখেছি ভুটানের দূত নানা উপহার নিয়ে এল। তারা উপহার পাঠাত কত রকমের পাহাড়ের তৈরী জিনিস ও ভুটীয়া ঘোড়া। আমাদের এ দিক থেকে যেত ঘড়ী, কলের বাজনা, বিলেতী বনাত, Sheffield-এর ছোরা ছুরী, ইংরেজী ধরণের ঘোড়ার সাজ, ইত্যাদি। আগে আগে ভুটীয়ারা দল বেঁধে শীতকালে ব্যবসা করতেও আসত। তাদের পণ্য প্রধানতঃ ছিল ঘোড়া ও কম্বল। আশ-পাশের সরকারী জেলার লোকও এই উপলক্ষে অনেক এসে জমা হত। সেকালে কুচবেহার ছিল উত্তর-বঙ্গের একটা কেন্দ্রস্থান। এই রাজ্য এক সময় পদ্মানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রঙ্গপুর জলপাইগুড়ীর জমীদাররা কুচবেহারকে কর দিতেন। ভুটানের কথা ত বলেছি। নেপালের সঙ্গেও এঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কুচবেহারের এক রাজকুমারী নেপালের রাণী হয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব বাদশাহের সময়, মোগল সাম্রাজ্যে ঘুণ ধরার আগে, সেনাপতি মীর জুমলা এই প্রদেশ জয় করতে আসেন। কুচবেহারকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে দক্ষিণ সীমান্তে ফৌজ রেখে তিনি আসামের দিকে দিগ্বিজয়ে চলে যান। যেই তিনি বেরিয়ে গেলেন, প্রজারা দল বেঁধে রাজার কাছে গিয়ে বললে, এইবার মোগলদের মেরে তাড়িয়ে দেওয়া যাক। ভীরু-স্বভাব রাজা (বোধ হয় লক্ষ্মীনারায়ণ) রাজী হলেন না। তখন প্রজারা তাঁকে কয়েদ করে রেখে নিজেরা দিল্লীর ফৌজ তাড়িয়ে দিয়ে এল। এর পরিণাম কত ভয়ানক হতে পারত, তা এই মূর্খগুলো একবারও ভাবল না! কিন্তু সত্যি

ব্যাপারটা গুরুতর দাঁড়াল না, কেন না মীর জুমলা সাহেব আসামেই মারা গেলেন, আর তাঁর যোদ্ধারা কালাজ্বর ইত্যাদির সঙ্গে যুঝতে না পেরে অন্য পথে বাড়ী ফিরলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস লাটের সময় কোম্পানীর সঙ্গে কুচবেহারের সন্ধি হয়। তার পরেও অনেকদিন এ রাজ্যের কতকটা কদর ছিল, কারণ শেষ ভুটান যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত রীতিমত যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম এঁরা রাখতে পেতেন। সেটা আমার সময়ের আগে। আমি যে পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য দেখেছিলাম, সে নিতান্তই খেলাঘরের ফৌজের মতন। যে সব কথা ইতিহাসের ছলে আমি বলে যাচ্ছি, এগুলো কেউ যেন যথাযথ বলে না নেন। এ সব আমার মনের বিশ্বাস, আমার কাছে সত্য হলেও অন্যের পক্ষে গল্পমাত্র। মোট কথা, এখানে আমাদের রূপকথার মশলা জোগাবার জিনিস অনেক ছিল। যেখানে ভুটান নেপাল, পাহাড় জঙ্গল, নিয়ে কারবার, সেখানে ইংরেজের সঙ্গে বন্ধনটা আমাদের চোখে খুব মুগুর-মারা গোছের সত্য বলে লাগত না। মহারাজ বিলেত গেলে মনে দুঃখও হত, আবার বিলেতের বাদশাহী বংশের কাছে তাঁর মান আদরের কথা শুনে গর্ব্বও হত।

ভুটীয়াদের সম্বন্ধে একটা শোনা গল্প বলি। উত্তরে পাহাড়ের কোলে একজায়গায় তিন সীমান্ত একত্র মিলেছিল, ভুটানের, ব্রিটিশ বক্সাদুয়ারের ও কুচবেহারের। একবার আমার বাবা ভুটানের রাজার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেলেন, সীমান্তে গিয়ে তাঁদের এক রাজপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে। জাঁকজমক করে, চোপদার ঘোড়সওয়ার নিয়ে গেলেন।

তখন রেল ছিল না। যেতে একটু কষ্টই হল। সীমার কাছাকাছি পৌঁছেছেন,তখন ইংরেজদের কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। তিনিও দেবরাজের নিমন্ত্রণ পেয়ে আসছিলেন। দুজনেই মনে করলেন একটা খুব বড় রকমের উৎসবে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন যে, উত্তর দিকে পাহাড়ের উপর একটা বাড়ীতে আগুন লেগেছে। ঠিক সেই সময় একজন ভুটীয়া এক ছোট্ট টাট্টু চড়ে এসে দুজনকে দুই চিঠি দিয়েই উর্দ্ধশ্বাসে পালাল। চিঠিতে লেখা ছিল যে, "ইংরেজ সরকার আমাদের ভুটানের সীমার মধ্যে বিনা হুকুমে এক বাঙ্গলা বাঁধিয়াছেন, দেবরাজের হুকুমে তাহা জ্বালাইয়া দেওয়া হইতেছে, তোমরা সাক্ষী রহিলে।" দুজনকেই আতসবাজী দেখে ফিরে যেতে হল। দুজনেই জানতেন যে, এই সামান্য বিষয় নিয়ে ইংরেজ সরকার কিছু যুদ্ধ করবেন না!

আমাদের চাপরাসী বরকন্দাজদের মধ্যে কেউ কেউ ভুটান যুদ্ধে সেপাই ছিল। তাদের কাছে ছেলেবেলায় ভুটানের অসীম বলের কথা কত কি শুনতাম! দেশ দুর্গম, পাহাড়ীরা পাহাড়ের আড়াল থেকে কি রকম পা দিয়ে ধনুক ধরে একসঙ্গে দশ-দশটা তীর ছোঁড়ে, বড় বড় পাথর গড়িয়ে ফেলে দিয়ে সেপাইদের ব্যূহ নষ্ট করে দেয়, বেছে বেছে গোলন্দাজদের তীর মারে, এই সব নানা গল্প শুনতাম। হয়ত তার অর্দ্ধেক গাঁজাখুরী, কিন্তু আমরা ঠিক সত্যি মনে করতাম। ভূগোল পড়তে যখন আরম্ভ করলাম, দেখলাম যে ভুটানের পেছনে তিব্বত আর তিব্বতের পেছনে চীন, সব বৌদ্ধ, কাজেই ধরে নিলাম যে, চীনকে না হারিয়ে সাহেবরা কোন দিন ভুটান

দখল করতে পারবে না। এই নিয়ে ছেলে বুড়ো, চাকর মনিব, সবাই একটু আনন্দ পেতাম। কিন্তু এ আনন্দ কেন তা বোঝা শক্ত, কারণ ভুটীয়াদের সঙ্গে আমাদের জাত ধর্ম্ম ভাষা কিছুরই মিল ছিল না। বর্ম্মার রাজ্য গেল যখন, তখন আমরা বালক হলেও এটুকু জানতাম যে, বর্ম্মা ভারত-বর্ষের বাহিরের দেশ। তবু আমরা সত্যি বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। সে বছর ভয়ানক উল্কাপাত হয়েছিল। লোকে সহজেই এই ব্যাপারের সঙ্গে থিবো রাজার পতনের যোগ দেখতে পেল। দেশে কি ধীরে ধীরে সমগ্র এসিয়ার একত্বজ্ঞান আসছিল! যাই হোক, সরকার সীমান্ত সম্বন্ধে চিরদিন অতি সাবধান ছিলেন। একবার কুচবেহারে ভুটীয়া দূতদের সামান্য কিছু বারুদ ও ছররা জোগাড় করে দেওয়ার অভিযোগে একজন প্রাচীন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত ভদ্রলোক ছাড়া পেলেন, ও ওকালতী করবার অনুমতি পেয়ে উকীল হলেন বটে! কিন্তু তুচ্ছ কারণে তাঁকে কি জব্দই না হতে হয়েছিল।

প্রজারা অশিক্ষিত সরল প্রকৃতির লোক ছিল। তাদের একটা স্বতন্ত্র মত বা public opinion ছিল না। উকীল মোক্তার, হাকিম আমলা, বেশীর ভাগই পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার অধিবাসী ছিলেন। পূর্ব্ব-পশ্চিমের রেষারেষি ভাব ছিল না, কারণ দুদলই বাইরের লোক, গরজ একই। খাস কুচবেহারী বলতে বোঝাত, রাজবংশী ও ঐ দেশী মুসলমান। দেশের পুরানো বাসিন্দা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জমীদার

যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও কুচবেহারী বলে গণ্য হতেন। বাইরের বাঙ্গালীদের নাম ছিল ভাটিয়া। রাজগণেরা (কুমার সাহেবেরা) অধিকাংশই কিছু করতেন না। যে দু-চারজন হাকিমী করতেন তাঁরা যোগ্য সজ্জন ছিলেন। তাঁদের ভাটিয়া বিদ্বেষ মোটে ছিল না। রাজগণেরা বরাবরই বাবাকে নিজেদের প্রতিনিধি মনে করতেন, আর নিজেদের সকল সুখ দুঃখের সকল কথাই বলতে আসতেন। আমি বড় হওয়ার পর আমাকে কুচবেহারে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ তাঁদেরই বেশী ছিল। খাস কলিকাতার যে কয় ঘর ছিলেন, তাঁরা মহারাজের শ্বশুর বাড়ীর দেশের লোক বলে একটু আলাদা আলাদা থাকতেন বটে, কিন্তু সেটাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। মোটের উপর কুচবেহার শহরটা ছিল যেন একটা বৃহৎ পরিবার। সর্ব্বত্র আমাদের অবাধ গতি ছিল। সব বাড়ীতেই দৌরাত্ম্য আবদার চলত। কার্য্যতঃ জাতিভেদের বালাই বড় একটা ছিল না, তাই অনেক বয়স পর্য্যন্ত আমাদের জাতিভেদ সম্বন্ধে জ্ঞান খুব আবছায়া রকমেরই ছিল। অথচ এমন নয় যে, আমরা সবাই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ছিলাম। তন্তুবায়, পরামাণিক, সুবর্ণবণিক, শাহা প্রভৃতি সকল বর্ণই আমাদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে ছিল। কিছুদিন বুন্দেলা রাজপুত এক ভদ্রলোক চাকরী করতে এসেছিলেন, কখন কখন মুসলমান দুই-একজনও ছিলেন কিন্তু আমাদের খাওয়া-দাওয়াতে কোন দিন পংক্তিভেদ দেখি নেই। গোঁড়া হিন্দু দুই-একটী যা হাকিম মহলে ছিলেন, তাঁরাও একটা বেখাপ্পা কিছু করতেন না, কোন রকমে নিজের জাতটা

বজায় রাখতেন। কারও কারও আবার জাতিভেদ সন্ধ্যার পর থাকত না। সেই সময় আমাদের বাড়ীতে বৈঠক বসত, তাস-পাশা খেলা হত, জলযোগ নানা রকমের হত, তাতে বড় একটা কারও আপত্তি ছিল বলে মনে নেই। এ সব সন্ধ্যা-বৈঠক ছেড়ে দিলেও একটা বেশ সার্ব্বজনীন ভাব দেখা যেত, যা অন্যত্র দুর্লভ। হয়ত এটা ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা। ছোট-বড় অনেকেই ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। বাবা সাধারণ সমাজের সভাপতি বরাবরই ছিলেন, যদিও তিনি আচারঅনুষ্ঠানে পুরোপূরি ব্রাহ্ম কখনও হন নেই। খাগড়া-বাড়ীর পণ্ডিত-মণ্ডলী বা অন্য গোঁড়া ধরণের লোকেরা কিন্তু তাই বলে কোন দিন তাঁর বিরোধী ছিলেন না। মহারাজ সস্ত্রীক নববিধান সমাজভুক্ত ছিলেন। দুই সমাজের মধ্যে কুচবেহারে বা অন্যত্র সদ্ভাব ছিল বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। কিন্তু মহারাজ সকল রাজগুণের অধিকারী ছিলেন, ধর্ম্মমতের জন্য বিরোধ তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। বহুকাল পরে, এক ক্লাব স্থাপনের চেষ্টায় গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রবাবু ও আমি মহারাজের কাছে গেছলাম। মহারাজ সব রকমে আমাদের সাহায্য করতে রাজী হলেন। বললেন যে নগদ টাকা দেবেন, সাজ-সরঞ্জাম দেবেন, শেখাবার জন্যে বিলেত থেকে খেলোয়াড় আনিয়ে দেবেন, কিন্তু বেশ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে ক্লাবে কোন রকম জাত কি সম্প্রদায় ভেদ থাকলে আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবেন না। রাজধানীতে গির্জ্জা, মসজিদ, ব্রাহ্ম মন্দির, হিন্দু মন্দির, সবই ছিল। সবাই রাজভাণ্ডার থেকে সাহায্য পেত।

রাজবংশের কুলদেবতা মদনমোহন। আগে ঠাকুরবাড়ী ছিল রাজবাড়ীর সামনেই। মহারাজ যখন নাবালক, তখন ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি হটন সাহেব ঠাকুরকে দূরে সরাবার মতলব করেন, কিন্তু হঠাৎ রাত্রে সাহেবের মুখ দিয়ে রক্ত ওঠায় তাঁকে সে মতলব ত্যাগ করতে হয়, এই রকম জনশ্রুতি। তবে, সাহেবের ভয় হওয়ার কথাটা বিশ্বাস করা রীতিবিরুদ্ধ। মহারাজ গদীনশীন হওয়ার পর, অনেক খরচ-পত্র করে সম্পূর্ণ ফরাসী ধরণের নূতন রাজবাড়ী উঠল। রাজবাড়ীর হাতাটা বিলেতের জমীদার বাড়ীর পার্কের মত তৈরী করা হল, অর্থাৎ আঁকা বাঁকা ঝিল আর চারিদিকে উঁচু নীচু ঢেউ-খেলানো ঘাসের জমী। পুরানো ঠাকুরবাড়ী আর সেখানটায় মোটেই খাপ খেত না। তাই দূরে শহরের মাঝখানে এক পুকুরের পাড় জুড়ে মদনমোহন দেবের নূতন আবাস বাঁধা হল। নূতন মন্দিরটী সুন্দর হলেও কেমন কেমন লাগত, কেন না বাঙ্গলা দেশের পঞ্চরত্ন নবরত্ন দেউল না করে, ফার্গুসনের কেতাব দেখে পশ্চিমের পুরানো হিন্দু মন্দিরের নকল করা হয়েছিল। কেন যে এ রকম করা হল, আমি জানি না। কেন যে এই গরীব বাঙ্গলা দেশের পঞ্চরত্ন নবরত্ন মন্দিরের শোভা আমাদের চোখে পড়ে না, কেন যে বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলার কোন গুণই আমরা দেখতে পাই না, কি বুদ্ধির বশবর্ত্তী হয়ে আজ আমরা মাথায় সাদা টুপী পরে, হিন্দী বলতে বলতে, দেশ উদ্ধার করতে সকলের পেছনে চলেছি, তা বোঝা ভারী শক্ত। আমাদের কুচবেহারের মহারাজ গৌরব করে বলতেন, "আমি কোচ, আমি অনার্য্য, আমার

আর্য্য বলে গণ্য হবার কোন সাধই নাই।” আমিও সেই রকম বলছি, “ভাই বাঙ্গালী, তুমি আর্য্য নও, তুমি অনার্য্য, তোমার দেশে এলে আর্য্যদের জাত যেত। তুমি কুরু-পাণ্ডবদের বংশধর বলে নিজেকে জাহির করে লোক হাসিও না। তোমার পূর্ব্বপুরুষ নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত, যারা সমুদ্রগর্ভ হতে দক্ষিণবঙ্গ উদ্ধার করে তোমার দেশের শস্যশ্যামলা নাম সার্থক করেছে। তোমার পূর্ব্বজ গারো, কোচ, মেচ, যারা গভীর জঙ্গল কেটে উত্তরবঙ্গ মানুষের বাসের উপযোগী করেছে। তোমার ডিঙ্গা, তোমার ময়ূরপঙ্খী নাও, নিয়ে যে সব মাল্লারা সাতসমুদ্রে পাড়ি দিত তারা তোমার পূর্ব্বপুরুষ, ভীম অর্জ্জুন নয়। সত্যি বলতে কি, তোমার অতীতের দিকে চাওয়া বিড়ম্বনা, তোমার ইতিহাস বর্ত্তমানে ও সম্মুখে। রাজা রামমোহনের শতাব্দীতে তুমি দেখিয়েছ তোমার কদর। এই শতাব্দী আরও তোমার কত কীর্ত্তি দেখবে। ভয় নেই। পাঁজী পুঁথিগুলো ছিঁড়ে ফেলে কেবল এগিয়ে চল।

এক মন্দিরের কথা নিয়ে কি বক্তৃতাই না করলাম! পাঠকের কাছে মাপ চাইছি। নূতন মন্দির তৈরী হলে, এক শুভদিনে, হাতী ঘোড়া, সৈন্য সামন্ত, রসনচৌকী, ইংরেজী ব্যাণ্ড ইত্যাদি নিয়ে প্রকাণ্ড মিছিল করে, মদনমোহন গৃহ-প্রবেশ করলেন। সঙ্গে রাজ্যের সব কর্ম্মচারী, সাহেব পর্য্যন্ত। মহারাজ পাটহাতীতে চড়ে মিছিলের আগে আগে গেলেন, যদিও তিনি ব্রাহ্ম আচার্য্যের জামাতা। রাজা তিনি, রাজ-ধর্ম্ম যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের চেয়ে অনেক বড়, তা তিনি বুঝতেন। নূতন মন্দিরের জন্য কাশী থেকে অনেক খরচপত্র

করে নহবৎ এল, দেবতুষ্টির জন্য আরও কত রকম ব্যবস্থা হল! মোটের উপর, মদনমোহন বোধ হয় খুশী হয়েই বাড়ী বদল করলেন, কারণ এবার আর কারও মুখ দিয়ে রক্ত উঠল না। ক্ষুদ্র বৈরাগীদীঘির শোভা বৃদ্ধি হল।

কুচবেহার শহরটি ছোট হলেও ভারী সুন্দর। একেবারে নূতন। রাস্তাগুলি সব শহরের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সোজা চলে গেছে। লাল লাল রাস্তা, দুধারে সবুজ ঘাস। মাটি এত রসাল যে ঘাস কখনও শুকোয় না। সব জিনিসটা যেন রুলার গজকাঠি দিয়ে মেপে তৈরী। আমাদের বাড়ী ছিল সাগরদীঘির পশ্চিম পাড়ে এক টিলার উপর। উত্তর দিকে তাকালেই হিমালয়ের নীলরেখা দেখা যেত। ভোরের আলোয় সেই নীলরেখার উপর কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া পর্ব্বতরাজের মাথায় শুভ্র কিরীটের মত দেখাত। ছেলেবেলা থেকে এই ছবির মতন পাহাড়ের দৃশ্য দেখা অভ্যাস, কাজেই যখন বারো বছর বয়সে প্রথম পাহাড়ে গিয়ে তার এবড়ো খেবড়ো গড়ন ও এলোমেলো রং দেখলাম, তখন নিতান্তই নিরাশ হলাম। তার পর ত কত পাহাড়ই দেখেছি, কিন্তু কাছের পাহাড় আজও ভাল লাগল না। অনেক দূরের ঘন নীল পাহাড়ের চূড়ার শোভাই সব চেয়ে চমৎকার মনে হয়। তার পরেই লাগে ভাল অন্ধকার অস্পষ্ট গভীর খদের তলা। অর্থাৎ দুটোই দূরের জিনিস, আর দূরের বলেই idealised। এই যে সাবেক কালের কথাগুলো বলতে নিজেরই এত আনন্দ হচ্ছে, এ কেবল সে কালটা এত দূরে বলে। বিংশ শতাব্দীর হিন্দু আমরা, কত পালিশ করা আমাদের ভাব-

ভঙ্গী, অথচ আমাদের কেন এত ভাল লাগে বৈদিক যুগের আদিম অপরিণত সভ্যতার কথা! সুদূর বলেই ত? উপরে বলেছি যে কুচবেহার শহরটি খুব আধুনিক ও ভারী সুন্দর। ছেলেবেলায় কিন্তু তার চেয়ে আমাদের অনেক ভাল লাগত সাবেক রাজধানী কমতাপুরের ধ্বংসাবশেষ। বাড়ীগুলো ছিল সব পাথরের, শহরের চারিদিকে কেল্লা ও গড়, দেখলে মনে হত,—হাঁ, কুচবেহার পুরানো রাজ্য বটে! নূতন মদনমোহন বাড়ীর চেয়ে অনেক ভাল লাগত কমতাপুরের নিকটস্থ প্রাচীন দেবীমন্দির। এই মন্দিরের নাম গোসানীমারীর মন্দির। জাগ্রত দেবতা। এখানকার কচি পাঁঠার মাংসের প্রসাদ লোভনীয় জিনিস ছিল। একটা কথা জানানো দরকার, যে আমাদের সেকালের ভাষায় মায়ের প্রসাদের নাম ছিল চরু। আমাদের বাড়ী যে প্রসাদ কালীবাড়ী থেকে নিত্য বরাদ্দ ছিল সেটা একটা পাঁঠার পা (leg)। কৃত্তিবাসী রামায়ণে যখন পড়লাম যে দশরথের নিঃসন্তান রাণীদের চরুভক্ষণ করানো হল, তখন ভাবলাম যে তাঁদিকে পাঁঠার চরণ খাওয়ান হল। বড় হয়ে অমরকোষ ইত্যাদি পড়ে তবে ভুল ভাঙ্গল। গোসানীমারীর যে মন্দিরের কথা বলছিলাম সেটা একটা পীঠস্থান, নাম রত্নপীঠ, প্রমাণ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা। ঐ মন্দিরে কুচবেহারের রাজারা কখনও যান না। দেবীর অভিশাপ আছে। এ সম্বন্ধে গল্পটা এই, যে বৎসরের কোন এক অমাবস্যার রাত্রে এই মন্দিরের মধ্যে দেবী দিগম্বরীবেশে নৃত্য করেন। নৃত্যকালে মন্দিরের সমস্ত দরওয়াজা জানালা বন্ধ থাকে। আগেকার এক মহারাজ পুরোহিতদের উপর জোর

জুলুম করে সেই নাচের সময় ভেতরে উকি মারেন, আর ফলে দেবীর শাপে তৎক্ষণাৎ মরে যান। সেই থেকে কোন রাজা গোসানীমারীর মন্দিরে যান না।

রাজধানীর উত্তরে আর এক পুরানো মন্দির আছে, বাণেশ্বরদেবের। এ মন্দির যে পুরানো তাতে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ দেবতাদের খাদ্যাখাদ্য বিধি স্থির হওয়ার পূর্ব্বে এর প্রতিষ্ঠান। আমিও আগে এতটা জানতাম না। বড় হওয়ার পরে, অর্থাৎ বন্দুক চালাবার অনুমতি পাওয়ার পরে, একবার শিবরাত্রির দিন আমরা শিকার করে সেই পথে ফিরছিলাম। প্রায় জনা ছয়েক ছিলাম, আর সকলের কাঁধে কাঠিতে বাঁধা মরা হাঁস। বেলা বারোটা। এমন সময় দেখি যে মন্দিরের একজন ছোকরা পুরোহিত সেই দিকে দৌড়তে দৌড়তে আসছেন। আমার ভয় হল, যে আমরা একটা কিছু অব্রহ্মণ্য কাজ করে ফেলেছি। এ সব ঋষি-কুমারদের শিকারী-নিগ্রহের বিষয়ে উৎসাহ ত সেই মহা-ভারতের যুগ থেকে! ব্রাহ্মণকুমারকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই ঠাকুর? আর একটু হলেই জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলাম আর কি, "আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? রাক্ষসাদির কোন উপদ্রব নাই ত? নীবার ধান্যের অবস্থা ভাল ত?" হঠাৎ স্মরণ হল, এ কলি যুগ, মৃগয়ারত হলেও আমরা ক্ষত্রিয় নই, যবনবেশী শূদ্রমাত্র, আর ঋষিকুমারটী একজন শাস্ত্রবিষয়ে একান্ত বিগতস্পৃহ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ। পুরোহিত আশীর্ব্বাদ করে বললেন, "জয়োহস্তু! আপনাদের আজ মন্দিরে প্রসাদ পেয়ে যেতে হবে। বাবা বিশেষ করে

বলেছেন।” একে শিব মন্দির, তায় শিবরাত্রি, প্রসাদ পেয়ে প্রসন্ন হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই মনে করে বললাম, যে আমাদের রক্তমাখা কাপড় চোপড়, গায়ে বারুদের গন্ধ, এ অবস্থায় মন্দিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ব্রাহ্মণকুমার ছাড়লেন না, টেনে হিঁচড়েই একরকম আমাদিকে নিয়ে গেলেন। ভাগ্‌গিস্ জিদ করে বাড়ী চলে যাই নেই! সেখানে গিয়ে দেখি, প্রসাদ মানে খাসির মাংসের কালিয়া ও কবুতরের চচ্চড়ি। ক্ষুধা নিবৃত্তির পর, গাছপান ও সুপারি খাওয়ার সময় একটু প্রত্নতত্ত্ব চর্চ্চা নিয়ে পড়লাম। বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কৈলাসপতির কাছে বলিদান কি করে হল। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, বলিদান মোটেই হয় নেই, খাসিটা ঠেঙ্গিয়ে মারা হয়েছিল, আর পায়রাগুলোর গলা টেপা হয়েছিল, এক ফোঁটাও রক্ত পড়ে নেই।

সমস্যার সমাধান হল। যাক্, এখানে ত রক্তপাত হল না, কিন্তু দার্জ্জিলিঙ্গে মহাকাল বাবার সামনে বলির জীব ঠেঙ্গিয়ে মারার কোন ব্যবস্থাই নাই,সেখানে ত সনাতন নিয়মে গলা কাটা হয়! এরা সবাই হিন্দু, পণ্ডিতজী স্বীকার করুন, আর নাই করুন। বাঙ্গলা দেশে দশভূজার সামনে অনেক বাড়ীতে পাঁঠা বলি দেওয়া হয় না, কুমড়ো খাঁড়া দিয়ে কেটে তাইতে সিঁদুর দিয়ে খানিকটা নকল রক্ত তৈরী করে নিয়ে পূজা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করা হয়। এ সিঁদুর যেন আমাদের একেলে নিরামিষ ভোজের মোচার চপ ও ইঁচড়ের কাটলেট। আমার কেমন মনে হয়, যে এই সব ব্যাপারগুলো খুব স্পষ্ট-ভাবেই দেখিয়ে দেয় যে বাঙ্গালীর সভ্যতা বা অ-সভ্যতা নানা

স্থান থেকে কুড়ানো, শুধু প্রাচীন ঋষিদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নয়। ধর্ম্মপূজা ও শূন্যপুরাণের কথাও বলতে পারতাম, যদি সে বিষয়ে বিদ্যার একান্ত অভাব না হত। গম্ভীরা নাচ, মনসার ভাসান, কুচবেহারের বিষহরির গান ও মদনকামের পূজা, এ সব শ্রুতিজাত মনে করার কারণ আছে কি ?

আর একটা ছোট গল্প এই সম্পর্কে বলি। কুচবেহারের মদনমোহনদেব সোনার বংশীধারী মূর্ত্তি, তাঁর মন্দিরের দুধারে কালী ও তারাদেবীর মন্দির। তিন মন্দিরই এক ইমারতের মধ্যে। দেবীদের সামনে রোজ পাঁঠা বলি হয়। পরোক্ষে এই বলির মাংস খাওয়ার অপরাধে বছরে এক বার করে মদনমোহন ঠাকুরের বিচার হত। বাণেশ্বর পাল্কী চেপে এসে বিচার করে একটাকা জরিমানা নিয়ে যেতেন। এ ব্যাপারের সঙ্গে শ্রুতিস্মৃতির সম্বন্ধ আমি ত ঠিক করতে পারি নেই। পাঠক চেষ্টা করবেন, নয়ত আজকালকার হিন্দুসভাকে জিজ্ঞাসা করবেন !

ঠাকুরমন্দিরের কথা একটু বেশী হয়ে গেল। তবু আর একটা ছোট্ট গল্প বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। গল্পটা হাল্কা রকমের,তবু ভাবুক পাঠক এর ভেতরেও তত্ত্ব কথা পাবেন। তা ছাড়া, রচয়িতা একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হওয়ায় গল্পটা অশাস্ত্রীয় বলা যেতে পারে না। গল্পের স্থান, এক নির্জ্জন প্রান্তরে ভাঙ্গা শিবালয়। সময়, শ্রাবণ মাস, সন্ধ্যাবেলা। আকাশজোড়া মেঘ, আর ঝুপঝুপ বৃষ্টি, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পথশ্রান্ত এক ফকীর সেই পথে

যাচ্ছিলেন। ঝড়বৃষ্টিতে হায়রান হয়ে, তিনি মন্দিরে আশ্রয় নিলেন। ফকীর বিধর্ম্মী, হিন্দুদের ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁর, বোধ হয়, কিছু জানা ছিল না। শুকনো জায়গা পেয়ে শিবলিঙ্গের মাথার উপরেই বসে পড়লেন। বেশ করে বসে, তাঁর ঢিলে জামার ভেতর থেকে কাঠি-কাবাব বের করে তিনি জঠরাগ্নির পূজা আরম্ভ করলেন। ঘন ঘন বিদ্যুতের আলোয়, শিবলিঙ্গে অধিরূঢ় সাদাদাড়ী ফকীরবাবাকে নিশ্চয়ই অপরূপ দেখাচ্ছিল! ঝড় উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। এমন সময়, এক হিন্দু চাষা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে মন্দিরে ঢুকে পড়ল। তার পা-ময় কাদা, সর্ব্বাঙ্গে জল ঝরছে। মন্দিরে নূতন দেবতা অধিষ্ঠিত দেখে বেচারা ভয়ে অভিভূত হয়ে গেল। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে কোন মতে নিজেকে ঝড়ের ঝাপটা হতে বাঁচাতে লাগল। ফকীর কিছু বললেন না বটে, কিন্তু দেবতার দয়া হল না। মূর্ত্তির ভেতর থেকে গম্ভীর আওয়াজ এল, "মোল্লা বাবা, একবার পা-টা সরাও ত, হিন্দু ব্যাটার ঘাড়টা মটকে দিই। ব্যাটা ছোটলোক! তুমি কাদা পায়ে, নোংরা কাপড়ে, মন্দিবে ঢোক!" তার পর কি হল, শুনি নেই।

৩

গল্পগুলো শুনে পাঠক বুঝতেই পারছেন যে ছেলেবেলায় আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা একটু বিশেষ গোলমেলে রকমের হয়েছিল। প্রথম ইংরেজী শিখে একেবারে রাতারাতি সুসভ্য হওয়ার যে উৎসাহ দেশে জেগে উঠেছিল, সেটা আমাদের

সময়ে অনেকটা মন্দা পড়ে গিয়েছিল। আগে যেটা হয়েছিল, সেটা বান ডাকার মত। আমাদের সময় যেটুকু ছিল, সেটা যেন নিত্যকার জোয়ার ভাঁটা। তার থেকে একটা উদ্দীপনা, মাদকতা সঞ্চয় করা বড় শক্ত কাজ। অথচ বাঙ্গালীর প্রাণ উদ্দাম আবেগের জন্য অপেক্ষা করেই আছে। যাক্, নিজের কি হয়েছিল বলি, তাহলেই অবস্থাটা সবাই বুঝতে পারবেন। বাড়ীতে ঘটা করে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান হত না। বাবা একেশ্বরবাদী ছিলেন, কিন্তু ভগবানকে কখন ডাকতেন, তা আমরা জানতেও পারতাম না। মা পূজা আহ্নিক করতেন, কিন্তু আমাদের অগোচরে। ঠাকুরঘর বলে পদার্থটা ত বাড়ীতে ছিলই না। আমাদিকে কেউ নিত্য উপাসনা করতে উপদেশ দেন নেই, বরং একথা বারবার শুনতাম যে নিয়মিত লেখাপড়া ও শরীর চর্চ্চা করাটাই বিদ্যার্থীর যথার্থ উপাসনা। এ অবস্থায় আমাদের একের নম্বর কালপাহাড় হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা ঠিক হল না। বিখ্যাত ব্রাহ্ম আচার্য্যেরা কুচবেহারে এলে বাড়ীতে উপাসনা হত, আর আমাদের সেখানে উপস্থিত থাকার স্পষ্ট আদেশ ছিল। খুব ছেলেবেলায় দুই-একবার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও উপাসনা করেছিলেন। এতদিনের কথা, কিন্তু তাঁর সেই সৌম্য সুন্দর চেহারা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি, একতারা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে তন্ময় ভাব, এখনও যেন চোখের সামনে রয়েছে। বড় বড় উৎসবের সময় বাবা সমাজে নিয়ে যেতেন। ভালই লাগত, যদিও কতকটা spectacular (ধূমধাম) হিসেবে। ভক্তি চর্চ্চার দিক থেকে যাত্রার ধ্রুব

প্রহ্লাদ ঢের বেশী মনে লাগত। যাত্রা যত ইচ্ছা শুনতে পেতাম, কিন্তু কীর্ত্তন শোনার বিষয়ে কোনও উৎসাহ কেউ দিতেন না। বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলার কথা ত একরকম taboo (নিষিদ্ধ) ছিল! একদিনকার কথা মনে আছে, কলকাতা থেকে এক সুগায়ক এসেছিলেন, মজলিস করে সবাই গান শুনতে বসেছিলেন, বড় ভাল লাগছিল। হঠাৎ তিনি গান ধরলেন, "এল কৃষ্ণ এল ঐ, বাজায়ে বাঁশরী।" আমি তৎক্ষণাৎ উঠে বেরিয়ে গেলাম। সংস্কার এই রকম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আরও দশ বছর আগে হলে হয়ত সুরুচি সম্বন্ধে একটা বক্তৃতাও করে ফেলতাম, কিন্তু আমাদের মনে অত জোর আগুন ছিল না। এই সব শিক্ষা সংস্কার সত্ত্বেও অকালে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কবলে কি করে পড়ে গেলাম, সেইটেই আশ্চর্য্য। কিন্তু আমাদের দোষ যে খুব বেশী ছিল, তা বলতে পারি না।

আগে জানিয়েছি যে, একটা অব্যক্ত রকমের জাতীয় গৌরব শিশুকাল থেকেই মনে জেগে উঠেছিল। সেটার জোর ছিল মুক্তি-পিপাসার চেয়ে অনেক বেশী। সেই সামান্য অস্পষ্ট আগুনের ফিনকি যে একদিন ভীষণ দাবানল হয়ে কৈলাসে বুড়ো শিবের জটা গলিয়ে দেশের সপ্তসিন্ধুকে বানে ভাসাবে, তা তখন কে জানত! একটা বিষয়ে আমাদের মনে বড় ধোঁকা লেগেছিল। এই ঋষিতুল্য কেশবচন্দ্র, যিনি একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে সবাইকে কাঁদিয়ে দেন, তাঁর সমাজ-মন্দির খৃষ্টানী গির্জ্জের মত কেন গড়া হল, ভেতরের পূজা-পদ্ধতি বা মোটামুটি খৃষ্টানি চালের কেন

করা হল? মহর্ষির "খৃষ্ট বিভীষিকার" কথা তখন জানতাম না, কিন্তু জিনিসটা ঠিক হজম হত না। কেশববাবুর Band of Hope (মদ্যপান নিবারণী সভা) নিয়ে কিছুদিন খুব খেটেছিলাম। আমাদের খাটা ত হুজুগ বিশেষ, তার কিছু মূল্য হয়ত ছিল না। তবে বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমরা টাকা ও প্রতিজ্ঞাপত্রে সই জোগাড় করেছিলাম। কিন্তু শেষে দেখলাম সব মিছে, সব ভুয়ো। আমাদের সভার যিনি অধ্যক্ষ, যাঁরা আমাদের সহায়, তাঁদেরই অভ্যাস দোষ সব চেয়ে বেশী। এ অবস্থায় আমাদের ছেলে-ছোকরার উৎসাহই বা থাকে কি করে! ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যদের কেউ কেউ আমাদের বড় ভালবাসতেন। তার মধ্যে নববিধানের মহাজ্ঞানী গৌরগোবিন্দবাবু ও সাধারণ সমাজের ভক্ত নবদ্বীপ দাস মহাশয় দুজনের নাম করব। এঁদের দুজনের কাছে শিখেছিলামও অনেক। কিন্তু কই, এঁরা ত এঁদের সমাজের অনাচারী সাহেবদের কিছু বলতেন না! এই সব পাঁচ রকমে মন বড় বিগড়ে গিয়েছিল। একজন ভক্ত কর্ম্মীর কথা কিন্তু মনে আছে, যিনি তখন আমাদের মন একেবারে কিনে নিয়েছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের পণ্ডিত রামকুমার। কুচবেহারে এসেছিলেন গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীর বেশে। আসামের চা-বাগানে তখনকার দিনে কুলিদের উপর ভয়ানক অত্যাচার হত। পণ্ডিত মহাশয় বাগানে বাগানে ঘুরে সব খবর জেনে কুলিকাহিনী বলে এক গল্পের বই লিখেছিলেন। সেই বই থেকেই বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণ এই অত্যাচারের কথা

ভাল করে জানতে পারলে। পূজনীয় পণ্ডিত যত দিন কুচবেহারে ছিলেন, আমরা দল বেঁধে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে খুব ঘুরতাম, আর কত গল্পই তাঁর কাছে শুনতাম! শুনে মনে ইংরেজ জাতের উপর শ্রদ্ধা ভালবাসা বাড়ে নেই, সেটা নিশ্চিত।

কয়েক বছর পরে যখন বিলেত যাই, তখন আমার ক্যাবিন-সঙ্গীদের মধ্যে Adam বলে একজন চা-বাগানের সাহেব ছিল। আমি একে নেটিব তায় বালক, এক কামরায় থাকা সত্ত্বেও সে আমার দিকে চেয়ে দেখত না। কিন্তু একদিন লোকটা গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এল। আমি ছিলাম নিতান্ত ভালমানুষ, খুব রাগ না হলে গায়ের muscle-গুলো শক্তও হত না। সকাল বেলা চা খাচ্ছি, আমাকে দড়াম করে জিজ্ঞাসা করে বসল, "তুমি না কি সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ? কি দরকার এত কষ্ট করার, তোমরা ত মাসিক দুশো টাকা হলেই রাজার হালে থাকতে পার।" আমি ছেলে মানুষ কি বা জবাব দেব, কিন্তু মা সরস্বতী জিবের ডগায় এসে উত্তর দিলেন, "দেখি চেষ্টা করে, যদি ইংরেজ একটারও ভারতে আসা বন্ধ করতে পারি, ত কষ্ট সার্থক হবে।" সাহেবটা একবার দুবার "ঘোঁক্" করে উঠে গেল! তার পর আর সারা পথ আমাকে জ্বালায় নেই। কিন্তু এই ঘটনার এক মজার ফল হল। আমার আর এক ক্যাবিন-সঙ্গী ছিল, তার নাম Stewart, সে সওয়ার পলটনের কাপ্তান। পয়সার অভাব, তাই স্ত্রী ছেলেকে উপর কেলাসে দিয়ে নিজে সেকেণ্ড কেলাসে যাচ্ছিল। সেও কোন দিন

আমার দিকে ফিরে চায় নেই, কিন্তু যখন Adam ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে উঠে গেল, তখন সে হেসে আমার কাছে এসে বসল, আর "গুড মর্ণিং" বলে গল্প জুড়ে দিলে। শেষে বললে, আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করে বড় খুশী হয়েছি, you are a boy of the right sort (তুমি ছেলের মত ছেলে)।" আমি একটু কাঁচুমাচু হয়ে তাকে বললাম, "আমি নিরীহ ছেলে, সাত চড়ে রা বেরোয় না, কিন্তু চা-বাগানের সাহেব আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আসামের কোলের কাছে মানুষ হয়েছি, সেখানকার জুলুম অত্যাচারের কথা কোন দিন ভুলতে পারি নেই।" কুলিকাহিনীর এক-আধটা গল্পও বললাম, কিন্তু কাপ্তান বিশ্বাস করলে না, বললে "না না, এ হতেই পারে না, তোমায় কেউ বোকা বুঝিয়েছে !" বাকী যে কদিন জাহাজে ছিলাম, এই সাহেব আমায় অনেক যত্ন করেছিল, তার স্ত্রী বিলেতে তাঁদের বাড়ীতে যেতে নিমন্ত্রণও করেছিলেন। আমি সে নিমন্ত্রণ নানা কারণে রক্ষা করতে পারি নেই। কিন্তু এই ব্যাপারে মোটামুটি বুঝে নিলাম যে ইংরেজ জাতের কাছে সোজা কথার খুব কদর। পরে ইংরেজের সঙ্গে অনেক কারবার করেছি, কিন্তু এ বিষয়ে আমার প্রথম ধারণাই কায়েম আছে।

চা-বাগানের সম্বন্ধে আমায় কেউ যে বোকা বোঝায় নেই সেটা পরে ভাল করেই জানতে পেরেছিলাম। বিলেতে আমি অধিকাংশ সময় ঘর ভাড়া করে থাকতাম। আর আমার অভ্যাসদোষে আমার ঘরে আড্ডাও জমত খুব। এই ধরণের আড্ডাতে সচরাচর যে রকম তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে

আমার ঘরেও সেই রকম হত। শুধু একটা কথা উল্লেখ-যোগ্য। আমার তর্কের বিষয় ছিল সব সময়েই এক, রাষ্ট্র-নীতি ও ভারতের ভবিষ্যৎ। কাজেই আমরা খুব গরম হয়ে উঠতাম। একদিন জোর গলায় এই গবেষণা চলেছে, এমন সময় বাড়ীর ঝিটা এক চিঠি নিয়ে এল, তাতে লেখা আছে, "আমার স্ত্রীর বড় কঠিন অসুখ, মরণাপন্ন অবস্থা, আপনারা যদি একটু আস্তে কথাবার্ত্তা চালান ত বড় উপকৃত হই।" নীচে একটা ইংরেজের সই। সই দেখে আমাদের বীর রক্ত ধমনীতে নেচে উঠল, একজন প্রস্তাব করলেন, "লিখে দে, আমাদের বয়ে গেল।" শেষ পর্য্যন্ত কত দূর বাঁদরামি করে তুলতাম জানি না, কিন্তু এক সাহেব সশরীরে এসে ঘরে উপস্থিত হল। কথায় বোঝা গেল, ওই চিঠি দিয়েছিল। সাহেব বললে, "আধ-ঘণ্টার মধ্যে আমার স্ত্রীকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবে। আপনাদের কথাবার্ত্তার ব্যাঘাত করলাম, কিছু মনে করবেন না।" আমাদের রাগ পড়ে গেল। ভদ্রলোক বসে একটু গল্পস্বল্প করে বেরিয়ে গেল। তার দু-চার কথাতেই মনের অবস্থা বুঝতে পারলাম। আমরা ভারতবাসী, এ কথা জেনে সে বললে, "আমি ভারতবর্ষে পনর বছর ছিলাম। যে অত্যাচার অনাচার করেছি, আজ তার ফল পাচ্ছি। আমাদের রাজত্ব এই পাপে ধ্বংস না হলে হয়!" লোকটী উপর-তলার ভাড়াটে ছিল। এই আলাপের পর, তার স্ত্রী ফিরে আসা পর্য্যন্ত কদিন প্রায়ই আমার ঘরে এসে গল্প করত। একটা কথা আমায় বিঁধে বিঁধে বার বার বলত, "তোমাদের দেশের লোক সহায় না হলে এত পাপ চলতে পারত না।" কথাটা

একশোবার ঠিক। পাপ আমাদের, ভোগ আমাদের, অন্য-লোক নিমিত্ত মাত্র।

ভদ্রলোক আসামে চা-বাগানের সাহেব ছিল। পনর বছর অশেষ অনাচার করে, হায়রান হয়ে, দেশে পালিয়ে এসে বিয়ে থা করে সবে বছর খানেক বাস করেছে। সদাই তার ভয়, যে তার পূর্ব্বজীবনের সঞ্চিত ভোগ কবে তার ঘাড়ে এসে চাপে, আর তার নূতন সংসার চূরমার করে দেয়। ভারতবর্ষে তার পরে পরে তিনটী স্ত্রী (?) ছিল। প্রথম ছুটীকে চা-বাগানেই বিনা আয়াসে সঞ্চয় করেছিল, আর তেমনি নির্ব্বিবাদে তালাক দিয়েছিল, ছু-চার মাস বাদে। শেষেরটী পাহাড়ের এক কনভেণ্ট ইস্কুল থেকে রপ্তানি। কিছু লেখা-পড়া আগেই জানত, সাহেব তাকে গড়ে-পিটে, শিখিয়ে বুঝিয়ে, সহধর্ম্মিণী না হোক, সহকর্ম্মিণী করে নিয়েছিলেন। মেয়েটী আমাদের বাঙ্গালী, পাঁচ বছর সে তাঁর বাটীতে গৃহিণীপনা করেছিল। তাকে সাহেব ভাল বাসতেন বলে দেশে ফেরবার সময় মাঠে ছেড়ে না দিয়ে নিজের খানসামার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে শেষ প্রশ্নের এক রকম সমাধান করে এসেছিলেন। এই মেয়েটী একবার সাহেবের প্রাণ কি করে বাঁচিয়েছিল সে গল্পও শুনলাম। বাগানে ছুটী কুলি-মেয়ে ছিল, তারা বাঁকুড়া জেলার চাষী-কন্যা। বড়টী দিন কয়েক সাহেবের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিল, কিন্তু ছোটটীকে সাহেব কোন মতেই দখল করতে পারেন নেই। তার দিদি তাকে সর্ব্বদা বাঘিনীর মত আগলে থাকত। দূত দূতী কেউ তার কুঁড়ের কাছে এগোতে সাহস পেত না।

সাহেব বললে, যে হয়ত এই ছোট বোনটীকে বাঁচাবার জন্যই দিদি অত সহজে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিল। এ কথা যদি সত্য হয় ত, মেয়েটী শিবি দধীচি দলের লোক। পাঠক তাকে মনে করে একটী অতি ছোট নমস্কারও করবেন। সাহেবের তখন জোয়ান বয়স, উদ্দাম প্রবৃত্তি, বাধা পেয়ে দুই বোনের সর্ব্বনাশ করবেন স্থির করলেন। কিন্তু জিনিসটা আপাততঃ চাপা পড়ল, কারণ অল্প দিন পরেই সাহেব দার্জ্জিলিঙ্গ বেড়াতে গিয়ে সেখানকার ইস্কুল থেকে তাঁর তৃতীয় পক্ষ সংসার সংগ্রহ করে আনলেন। কিছুদিন পুরানো প্রেম, প্রতিহিংসা, সবই ভুলে রইলেন নূতনের নেশায়। তার পর একদিন তাঁর বাড়ীতে এক ক্ষুদে হাকিম সাহেব এসে অতিথি হলেন। হাকিমরা তখনকার দিনে চা-কর সাহেবদের কুঠীতেই ডেরা নিতেন। চা বাগানে অতিথিসৎকারের একটা নিয়ম ছিল। অন্যত্র যে, একেবারে ছিল না, তাও আমি বলতে প্রস্তুত নই। সেই নিয়মমত অতিথি এলে তাঁর সে-রাত্রের জন্য একটা গান্ধর্ব্ব কি আসুর বিবাহ দিতে হত। সাহেবের প্রতিহিংসার সুযোগ মিলল। বাগানের ডাক্তার-বাবুকে ডেকে বললেন, "ডাক্তার, জমাদারকে নিয়ে যাও, যেমন করে হোক আজ খানার পর সেই কুলি-মেয়েটাকে আনাই চাই।" সাহেবের হুকুম তামিল্ হল। সকালবেলা সর্ব্বদেবময় অতিথিকে বিদায় দিয়ে ম্যানেজার সাহেব বাগান তদারক করতে বের হলেন। দেখলেন যে, হাওয়ায় কেমন একটা থমথমে ভাব। কুলিরা যে যার কাজ করছে, কিন্তু কারও মুখে হাসিঠাট্টা, কথাবার্ত্তা, কিছু নেই। সেই বোন

দুটী এক জায়গায় কোদাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেরই চোখ লাল, যেন গাঁজা খেয়েছে। সাহেব পাশ দিয়ে যাবার সময় বড়টীকে রসিকতা করে বললেন, "কি রে, বোন কি বলে?" মেয়েটীর পা কোদালের ফালের উপরই ছিল। এক টানে হাতলটা বের করে নিয়ে মারলে সাহেবের রগের উপর এক ঘা। সাহেব অজ্ঞান হয়ে ভূঁইয়ে পড়ে গেলেন। যখন জ্ঞান হল, দেখলেন যে কুঠীর বারান্দায় পড়ে আছেন, আর চারিদিকে দু-তিনশো কুলি গর্জ্জন করছে আর ইঁট ছুড়ছে। বাগানের জমাদার সাহেব বারান্দার এক কোণে জড়সড় হয়ে পড়ে রয়েছে। ডাক্তারবাবু চেঁচিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছেন। আর, তাঁর স্ত্রী তাঁর দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে তাঁকে আগলে, একটা দোনলা বন্দুক মেরে মেরে কুলিদের তফাতে রাখছে। ডাক্তারের কাছে শুনলেন, যে এই সব বেয়াড়া হারামজাদাদের এসে সাজা দেবার জন্য পাশের বাগানের সাহেবকে খবর দেওয়া হয়েছে। বিকেল নাগাদ অন্য বাগানের সাহেবটী তার তিনশো কুলি নিয়ে এসে সব ঠাণ্ডা করে দিয়ে গেলেন। আমার সাহেব গল্প বলতে বলতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ ঘটনার moral (নীতি) কি, বুঝতে পারছ ত?" যাক, শান্তি স্থাপন হল, বড় মেয়েটীকে পুলিশ ও হাকিম মারফৎ জেলে দাখিল করা হল, আর আমাদের ডাক্তারবাবু বকশিশ-স্বরূপ ছোটো মেয়েটীকে পেলেন। আর বেশী গল্প বলার দরকার, বোধ হয়, নেই। সেকালের চা-বাগানের অবস্থা পাঠক নিশ্চয়ই কতকটা বুঝতে পেরেছেন। আজ কি অবস্থা, ঠিক জানি না। তবে কটন

সাহেবের আন্তরিক চেষ্টার ফল না হয়ে যায় নেই। পণ্ডিত রামকুমারের কথা হতে এত কথা এসে পড়ল। আর একটু বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

আমার এক বাল্যবন্ধু ছিল, কুচবেহারে আমাদের বাড়ীতে থাকত। অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার, কিন্তু অধ্যবসায়ের একান্ত অভাব। ছেলেবেলায় সাঁওতালদের মাঝে মানুষ হয়েছিল। লাঠি খেলতে বেশ ভাল জানত, আর ধনুকে তীর দিয়ে কি বাঁটুল দিয়ে অব্যর্থ নিশানা ছিল। মহারাজের চাবুক সওয়ারদের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে ঘোড়াশালের যত দুর্দ্দান্ত ঘোড়া চুরী করে চড়ে বেড়াত। আমার একটী মোটা ভুটিয়া টাট্টু ছিল, সেটা নিয়ে একবার ঘোড়দৌড়ের বাজি জিতে এল। একদিন এক খোড়ো বাড়ীতে আগুন লেগেছিল, হাতের কাছে মই না থাকায় নেবাবার কোনো চেষ্টা হচ্ছিল না। অগ্নিকাণ্ড বেড়েই চলেছিল, এমন সময় আমার বন্ধুটী গিয়ে উপস্থিত হল, আর চট করে চালের উপর একটা চেরা বাঁশ ঠেকিয়ে তাই দিয়ে চড়ে গিয়ে জল তুলে ঢালতে লেগে গেল। এ রকম ছেলের কি আর ভাল মানুষটীর মত পড়ে-শুনে কেরাণীগিরি করা পোষায়! অনুকূল হাওয়ায় পড়লে এরা অনেকদূর গিয়ে পৌঁছায়। নইলে বানচাল। বন্ধুর অদৃষ্টে শেষটাই হল। কিন্তু যে জন্যে এর উল্লেখ করলাম, সেটা হচ্ছে এই। চা-বাগানের কুলিদের দুর্দ্দশায় যখন আমরা হা হুতাশ করছি, এ একদিন কাউকে কিছু না বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল। বাবার নামে চিঠি রেখে গেল, "অপরাধ নেবেন না, অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে যাচ্ছি। লেখাপড়া করে আপনাকে

খুশী করতে পারলাম না, ইত্যাদি।” আমায় কিন্তু বলে গিয়েছিল যে, চা-বাগানে কুলি হতে যাচ্ছে, একবার সাহেব-গুলোকে দেখে নেবে। পারলে না কিছু করতে, কারণ বয়স বড় কম ছিল। বছরখানেক কি বছর দুই পরে ফিরে এল, তার পর কয়েক বছর ধরে নানা জিনিস চেষ্টা করে, শেষ বহু দূরে অজানার সন্ধানে চলে গেল। তখন আমি বিদেশে।

এর কথা বলতে বলতে আর একজনের কথা মনে হচ্ছে। একদিন আমরা তিন বন্ধু প্যারিসে বেড়াতে বেড়াতে সেন নদীর একটা পুলের উপর দিয়ে যাচ্ছি। পুলেতে মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য পাথরের বেঞ্চ। যেতে যেতে দেখি এক বেঞ্চে বসে একটী কৃষ্ণকায় যুবক আপেল খাচ্ছে। সে কোন দেশের লোক এই বিষয় জল্পনা করতে করতে আমরা চলে যাচ্ছি, এমন সময় সে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাঙ্গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনারা আমায় কিছু কি বলছিলেন?” আমরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। তাঁর পরণে ময়লা আধছেঁড়া লম্বা কোর্ত্তা, মাথায় খড়ের টুপী, হাতে আধ-খাওয়া আপেল। খানিকক্ষণ সকলে একসঙ্গে বসে গল্পগুজব হল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু পরিচয় তিনি দিলেন না। কেবল এইটুকু জানালেন, যে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার জন্য এদেশে এসেছেন, কিছুতেই কোথাও আমল পাচ্ছেন না। অর্থসঙ্গতির কথায় বললেন,“চলে যাচ্ছে”। আমি বললাম, “দাদা, চলুন একসঙ্গে কোথাও চারটি খাওয়া যাক।” জবাব দিলেন, “সে হয় না, ভাই, আমার ত নিজের কিছু সঙ্গতি নেই, আর ভিক্ষাও করি না।” শেষ বললেন, “তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে, কথা কয়ে

বড় আনন্দ হল। যদি কিছু করে উঠতে পারি, ত আবার একদিন দেখা হবে।” আর দেখা হয় নেই। ব্রেজিলের সুরেশ বিশ্বাস মহাশয়ের জাতের লোক। ভারতের যদি দিন ফেরে, ত এ-রকম কত দেখা যাবে!

আর ডানপিটে ছেলেদের গল্প এখন থাক। নিজের এক-ঘেয়ে জীবনের কথা বলি। ছেলেবেলায় ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম শিক্ষার প্রভাবের কথা বলেছি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাব একরকম ছিল না বললেই হয়। বাবার সঙ্গে উৎসবাদিতে যেমন সমাজে যেতাম, মার সঙ্গে তেমনি পূজা পার্ব্বণে মন্দিরে যেতাম। মন্দির সম্বন্ধে কোনও উৎসাহ ছিল না, আর মা-ও কোনদিন কোন পূজায় আমাদের বিশেষভাবে যোগ দিতে বলেন নেই। আজকাল যেমন হিন্দুত্ব সম্বন্ধে একটা hysteria বা বায়ুর প্রকোপ হিন্দুর ঘরে ঘরে ঢুকেছে, তখন তা ছিল না। মায়ের সব রকমে হিন্দুধর্ম্মে আস্থা ছিল, কিন্তু তাই নিয়ে একটা fuss বা হৈচৈ কখনও দেখি নেই। মা ইংরেজ মেয়েদের সঙ্গে কালে ভদ্রে দেখা হলে শেকহ্যাণ্ডও করতেন, আবার তারা চলে গেলে কখন নিঃশব্দে স্নান করে কাপড় ছেড়ে আসতেন কেউ জানতেও পারত না। বাবা খুব চেষ্টা করতেন যে আমাদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোনো রকমের গোড়ামি না হয়। তাই যেমন রামায়ণ মহাভারত পড়তে হয়েছিল, তেমনি মাষ্টার মহাশয়ের কাছে বাইবেলও খানিক খানিক পড়েছিলাম। মুসলমান বাল্যবন্ধুও অনেক ছিল। তাদের কাছে পয়গম্বরের জীবন, মেহদীর কথা, শয়তান ও ফেরেস্তাদের গল্প অনেক শুনে শিখেছিলাম। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও ইস্কুল-জীবনের শেষের

দিকে মূর্ত্তিপূজা, জাত-বিচার, টিকি, টিকটিকি, হাঁচি ইত্যাদি অনেক জিনিসে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলাম। অন্ততঃ বিশ্বাস করি এই কথা জোরে জাহির করতে লাগলাম। কি করে এ রকম হল, তা ভাববার বিষয়। কিন্তু এটা ঠিক যে, এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাব খুব স্পষ্ট আর প্রবল হয়ে এল।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক আমাদের এই সময়কার নেতা। আর বঙ্গবাসী ছিল আমাদের এই সময়ের Oracle (দৈববাণী)। এই অবস্থায় কলকাতায় পড়তে গেলাম। কপাল মন্দ যে সেই বছরেই Consent Bill (যাকে তখন সম্মতি আইন বলা হত) পেশ হল। নব হিন্দু ভাবের সঙ্গে এসে মিশল সরকার বিদ্বেষ। রাস্তায় মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে ঘোরা অভ্যাস হয়ে গেল। মুখে বুলি, "ধর্ম্ম গেল", "আইন চাই না"। যাঁরা সে আইনের পক্ষপাতী, সবাই হলেন আমাদের শত্রুপক্ষ। কোথায় গেল ভেসে ছেলে-বেলাকার কাগজ-পত্র, সঞ্জীবনী ও নব্যভারত, Liberal ও Indian Messenger, সমস্ত মনটা জুড়ে বসল বঙ্গবাসী ও জন্মভূমি। যে যবনান্নে চিরকাল এত লোভ ছিল, তা দেশের কল্যাণের জন্য ছেড়ে দিতে হল। এমন কি বিলেতী নুন চিনি পর্য্যন্ত গেল। ঘরে ঘরে ছেলেদের সাবান দেশলাই তৈরী হতে লাগল। কুচবেহারে থাকতে চুলের পাট করা আমাদের একটা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু বঙ্গবাসীর দলভুক্ত হয়ে সেদিকে সময় নষ্ট করা ছেড়ে দিলাম। রুক্ষ কেশ, পরণে মোটা ধুতি চাদর, হাতে বাঁশের লাঠি, তখন লোকে দেখে কি মনে

করত জানি না, এখন কিন্তু মনে পড়লেই হাসি পায়। টিকির বৈত্যুতিক শক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না, কিন্তু সত্যি টিকিটা রেখে উঠতে পারি নেই। ফোঁটা মাঝে মাঝে কাটতাম, কিন্তু সে অবস্থায় রাস্তায় বের হতে সাহস কুলোয় নেই। মন্দিরে যাওয়া আসা করার খুব ইচ্ছে হত, কিন্তু হয়ে উঠত না। তাই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত তারকেশ্বর কালীঘাট দর্শন হয় নেই। ব্রাহ্ম আবেষ্টনে জন্ম, তাই গোঁড়ামি যখন এল খুব জোরেই এল। কথায় বলে, "হিঁদুর ছেলে যবন হলে, গরু খাওয়ার যম", কিন্তু পেটে সয় না যে! আমার ত আর্য্যামি করতে গিয়ে অজীর্ণ রোগ হয়ে পড়েছিল। তবে সেটা স্বীকার করতাম না, দাপটে চালিয়ে নিতাম। সনাতন ধর্ম্মে আস্থা দু তিন বছরেই কেটে গেল, কিন্তু বঙ্গবাসীর অন্য দীক্ষাটা রয়ে গেল। সনাতনী কীর্ত্তি অনেক করেছিলাম, তার দুই একটা গল্প বলে এ পর্ব্ব শেষ করব।

যখন ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ি তখন কলকাতায় খুব জোরে ৺শীতলার কৃপা হয়। ছেলেবেলায় কতবারই টিকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বঙ্গবাসীর অনুমত নয় বলে এবার নিলাম না। উপরন্তু, কয়েকটি প্রবাসী ছাত্রের বসন্ত হয়েছিল, আমরা তাঁদের সেবার ভার নিলাম। আমার ভার নেওয়া মানে কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধনের মত, কিন্তু রোগীর কাছে বসে থাকতাম। মা নিরুপায় হয়ে ৺শীতলার ফুল সঙ্গে দিতেন, সেটা কোমরে গোঁজা থাকত। এইখানে উল্লেখ করা উচিত যে, সে সময় বিপদে আপদে আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর প্রধান সহায় ছিলেন নীলরতন বাবু। তাঁর ডাক্তারী ও আমার সিনিয়র-(বয়ো-

জ্যেষ্ঠ) দের সেবায় আমাদের সব কটী রোগী বেঁচে গেল। কিন্তু আমার সনাতনী চালের জন্য বাবার কাছে ভয়ানক বকুনি খেলাম, বিশেষ যখন দেখা গেল যে মাকে বসন্তের ছোঁয়াচ এনে দিয়েছি।

খাদ্যাখাদ্য বিচার হিন্দুর প্রধান কীর্ত্তি বলেই জানতাম। কিন্তু যত দিন পারি, আমার অখাদ্যবর্জ্জন বাবার ভয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম। শেষে ধরা পড়ল। গরমির ছুটিতে আমরা তিন ভাই কুচবেহারে যাচ্ছিলাম। যেখানে রেলপথের শেষ সেইখানে বাবা আমাদের নিতে এসেছিলেন। চিরপ্রথামত ডাকবাংলায় ষোড়শোপচারে ভোজন ঠিক করে রেখেছিলেন। সেখানকার খানসামা তের-চৌদ্দবার বিলেত ঘুরে এসেছিল, খুব লায়েক আদমী বলেই নিজেকে জানত, আর কাজেও সেটা দেখাতে চেষ্টা করত। আমাদের খিদের ধার বাড়াবার জন্যেই, বোধ হয়, বাবা, menu-টা কি তাই বর্ণনা করছিলেন। এমন সময় আমার ছোট্ট ভাইটী রস ভঙ্গ করলে, বলে উঠল, "বাবা, বড়দা ত ওসব খাবে না। সকালবেলা তিস্তায় মোছলমানে ছোঁয়া বলে চা টোষ্টও খেলে না।" বাবা গম্ভীরভাবে তাঁর চোপদার মিশির ঠাকুরকে ডেকে বললেন, "মিশির, বড়বাবু তোমাদের কাছে খাবেন, নিয়ে যাও।" আমি এত সহজে martyr (শহীদ) হতে পারব আশা করি নেই। মাথা উঁচু করে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলাম। আশা করি খুব সঙের মত দেখায় নেই। কলকাতায় ফিরে শুনলাম যে, বাবা আমাদের আতোরক কাকাকে চিঠি লিখেছেন, "আমার ছেলে যে এত বড় গাধা হতে পারে, ধারণা ছিল না।

এ ত হল ঘরের কথা। একবার খুব বড় আসরে হিন্দুত্ব জাহির করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় মারা গেলেন। তিনি আমাদের বড় স্নেহ করতেন। দশ দিন আমরা অশৌচ পালন করেছিলাম। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রাখতে গেলাম আমি। যাওয়া মাত্র নারায়ণবাবু ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। সেখানে আট-দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বসেছিলেন। একটু কথাবার্ত্তার পর জলখাবার এল। দেখলাম খাবার সব এত পরিষ্কার যে, নিশ্চয় বিলেতী নুন চিনির তৈরী। আমি বিনয় করে বুঝিয়ে বললাম যে, আমি এ সব খাই না। পণ্ডিত মহাশয়েরা হেসে উঠলেন, ও বললেন, "এই কথা! এতে আর কি হয়েছে! ওরে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জলখাবার একখানা নিয়ে আয় ত।" তখন অপেক্ষাকৃত মলিন জলখাবার এল। আমার বুকটা দশ হাত হয়ে উঠল। পণ্ডিতদের দেখালাম যে Young Bengal (নব্যবঙ্গ) সবাই অনাচারী নয়!

৪

এবার আমার ইচ্ছা, একটু শিকার সম্বন্ধে পুরানো কথা বলব। আমার প্রধান ভয় সত্যিকার শিকারীদিকে, তাঁরা এই হাতুড়ের অনধিকার চর্চ্চা কৃপা-চক্ষে দেখবেন কি না। মোটের উপর মনে হয় তাঁরা এটা না পড়লেই ভাল। সাহিত্যামোদী-দের কাছেও অভয় চাইছি, কারণ কিরাতের প্রলাপ তাঁদের কানে হয়ত নিতান্ত বেসুরো বাজবে। প্রলাপ বললাম বটে,

কিন্তু বোধ হয় বিলাপই বলা উচিত, কারণ আমার নিজের মৃগয়ার ধারা "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" তবে একদিকে যেমন আমার নিষ্কাম কর্ম্মের কথা আছে, তেমনি অন্য দিকে বন্ধুবান্ধবের সকাম সাধনার কথাও ত আছে! সেগুলো বলতে আমার বরং বেশী গৌরব বোধ হয়। আর পাঠকের কি এসে যায়, আমার কথা কি আমার বন্ধুর কথা?

শিকার বলতে অনেক জিনিস বোঝায়, ধাঙ্গড়দের ইঁদুর মারা থেকে পাঠানদের দুশমন মারা পর্য্যন্ত। এমন কি রসিকজনের সুন্দরী সন্ধানও এই ব্যাপারের অন্তর্গত। তবে আমার অধিকার জীবজন্তু অনুধাবন পর্য্যন্ত। সেই কথাই বলব। মৃগয়া ব্যসনবিশেষ। কথাটা সংস্কৃত ভাষায় লেখা থাকলেও আপ্তবাক্য বলে আমার আত্মীয়-স্বজন গ্রহণ করেন নেই। কারণ বাড়ীতে যে দোনলা গাদা বন্দুকটা ছিল, সেটা অল্প বয়সেই ছুঁড়তে শিখি। প্রথমবার আওয়াজ করার সময় চোখ দুটো বুজে এসেছিল, আর বন্দুকের ধাক্কায় উল্টে পড়ে গিয়েছিলাম। হয়ত সকলেরই এই হয়। অর্থাৎ সাধারণ লোকের। একজনের হয় নেই, জানি। বহুকালের কথা, অরবিন্দ একদিন আমার ঠাণার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। সেদিন ভয়ানক বৃষ্টি হচ্ছে, বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। আমরা একটা ছোট রাইফেল নিয়ে বারান্দায় আমোদ করছিলাম। অরবিন্দকে কেউ বললেন, "আসুন ঘোষ সাহেব, আপনিও মারুন।" তিনি প্রথমে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না, কখনও বন্দুক হাতে করি নেই ইত্যাদি নানা ওজর দেখাচ্ছিলেন। আমরাও নাছোড়বান্দা। শেষ

বন্দুক ধরলেন। সামান্য একটু দেখিয়ে দিতে হল কি করে নিশানা করতে হয়। তার পরে বারবার লক্ষ্যভেদ করতে লাগলেন। লক্ষ্য কি পাঠককে বলে দিই, দেশলাই কাঠির ছোট্ট মাথাটা। ওরকম লোকের যোগসিদ্ধি হবে না ত কি তোমার আমার হবে!

আমার প্রথম শিকার এক প্রকাণ্ড কঁুদো শেয়াল। যখন পড়ল তখন কি আনন্দ! আত্মহারা হয়ে মাংসটা রেঁধে খাই নেই, এই আশ্চর্য্য। একটা সাফাই গেয়ে রাখি। এ শেয়ালটা মেরেছিলাম মায়ের হুকুমে, অন্দর বাড়ীতে বড় উপদ্রব করত। লাটিনে এক কথা আছে, নরকে নেমে যাওয়ার পথ বড় সুগম। এই শেয়াল থেকেই আমার অধঃপতন সুরু। পরে ঝাঁকে ঝাঁকে যখন নিরীহ পাখী মেরেছি, সে ত আর কর্ত্তৃপক্ষের হুকুমে নয়! তবে একটু কৈফিয়ৎ দিতে হয়, কেন এ দুষ্কর্ম্মে লোক প্রবৃত্ত হয়। বন বাদাড়ে ঘুরে বেড়াবার উৎসাহে, বন্দুক মারার আনন্দে, রক্তপাতের নেশায়, আর কতকটা খাদ্য-লোভে। আমি কিন্তু পাখীর মাংস যা খেয়েছি, তার চেয়ে গালাগাল খেয়েছি ঢের বেশী। আর সে গালাগাল খুব জোরে দিয়েছেন তাঁরাই, যাঁরা সে মাংস আমার চেয়েও তৃপ্তিপূর্ব্বক খেয়েছেন। কিন্তু গাল খেয়েও আমি স্বধর্ম্ম ছাড়ি-নেই। শুধু তাই নয়। যখন যেখানে সুবিধা পেয়েছি ছেলেপিলেদের বন্দুক ধরতে শিখিয়ে আমার গুরুঋণ পরি-শোধ করেছি। শাস্ত্র শিখলেই শেখাতে হয়, এই সনাতন বিধি, তা সে যজুর্ব্বেদই হোক বা ধনুর্ব্বেদই হোক। বিরুদ্ধপক্ষ হয়ত ধনুর্ব্বেদকে চৌর্য্যশাস্ত্রের দলে ফেলবেন। তা ফেললেই

বা, চুরী যদি করতেই হয় ত আনাড়ীর মত করা কিছু নয়! মানুষের শত্রু বাঘ ভালুক মারতে যে দোষ নেই, সেপাই হতেও যে দোষ নেই, এ কথা যোগী ঋষি ছাড়া সবাই কবুল করেন। কিন্তু এই দুই কাজেই সিদ্ধির জন্য রীতিমত সাধনার দরকার। কেবল চাঁদমারিতে নিশানা করতে শিখে বাঘ-শত্রু কি মানুষ-শত্রুর সামনে গেলে আত্মঘাতেরই বেশী সম্ভাবনা। আত্মঘাত করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, ত দুপয়সার সেঁকো খেলে সস্তাও পড়ে, কষ্টও কম। কিন্তু শত্রুনাশ করতে হলে অব্যর্থ লক্ষ্য থাকা চাই,আর শরীরটাও রীতিমত রোদ-জল-সহা হওয়া চাই। বনে পাহাড়ে নদীর চরে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করাই এর সোজা উপায়। এই আমার গীতোক্ত অভ্যাসযোগ। এই ঈশোপনিষদের অবিদ্যার উপাসনা, যা নইলে অমৃতাশনের কোনও আশা নেই। ছেলে বখানোর কৈফিয়ৎ যথাসাধ্য দিলাম। একটা কথা বলি, আমার দুচারজন কাক-শালিক-মারা শিষ্য এখন রীতি-মত শের-আফগান হয়েছেন।

শিকার করলে শুধু শরীর শক্ত হয় তা নয়, নানারকমের শিক্ষাও যথেষ্ট পাওয়া যায়। রক্ত দেখলে গা ছমছম করা বন্ধ হয়ে যায়। দেশের গরীব চাষী, কাঠুরে প্রভৃতির সঙ্গে ভাল করে চেনাশুনো হয়। এই সমস্ত লোক, যারা আমলা-মাত্রকেই ভয় করে, ভদ্রলোককে দূরে ঠেলে রাখে, তারা শিকারীদের সঙ্গে এত অসঙ্কোচে মেশে, যে আশ্চর্য্য! আনাড়ীর মতন নিশানা চুকলে সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দেয়, বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করে না। এই সম্বন্ধে দুই-একটি মজার গল্প বলি। একবার গোবরডাঙ্গার জ্ঞানদাবাবু দুই হাকিম

সাহেবকে নিয়ে স্নাইপ (কাদাখোঁচা) মারতে গেছলেন। স্নাইপ খুব জোরে ওড়ে, মারা ভয়ানক কঠিন কাজ। সাহেব দুটী নিতান্ত green, অর্থাৎ কাঁচা শিকারী, ছিলেন। তবু, সাহেব ত, খুব কেতা করে দড়াম দড়াম করে টোটা ওড়াতে লাগলেন। চিন্তা নেই, টাকা গৌরী সেনের ! প্রায় পনের মিনিট পরে যখন পাখী একটাও পড়ল না জ্ঞানদাবাবুর বুড়ো শিকারী ভয়ানক চটে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবু, এগুলাকে ঘুঘু মারতি নিয়া যান"। সাহেবদের অর্থ-বোধ হল, কারণ বাঙ্গলায় Higher standard পরীক্ষা পাস করেছিলেন। মেজিষ্ট্রটকে এ রকম বলা এক গান্ধীজী বলতে পারেন, আমাদের কর্ম্ম নয়। আমার অদৃষ্টে একবার এই রকম স্তুতি-বাদ মিলেছিল। এক প্রকাণ্ড বিলে হাঁস মারতে গেছি। গাদা গাদা শর কেটে এক সঙ্গে বেঁধে ভেলা তৈরী হয়েছিল। তাইতে শিকারী-সরদারকে সঙ্গে নিয়ে বসেছি, আর গ্রামের লোক চারিদিকে ডিঙ্গীতে ঘুরে ফিরে হাঁস ওড়াচ্ছে। তার আগের হপ্তায় একদল সাহেব এসে অজস্র পাখী মেরে নিয়ে গেছলেন, তাই আমার পাখীগুলো খুব উঁচুতে আর ভীষণ বেগে উড়ছিল। আমি আন্দাজ পাচ্ছিলাম না। এক এক-বার গুলি যেই ফসকে যায়, শিকারীগুলো কোরাস গেয়ে ওঠে, "রাম রাম বলে চলে-এ-এ গেল।" একে নিজেরই যথেষ্ট বিরক্তি, তার উপর এই কোরাস গান, মনের অবস্থা কি হচ্ছিল বুঝতেই পারছেন। হঠাৎ দৈব সদয় হলেন। আন্দাজ পেয়ে গেলাম। পরে পরে গোটা কয়েক হাঁস ফেলার পরে শিকারী-দের কৃপা হল, সরদার বলে উঠল, "হ্যাঁ, আজ পাখীগুলো বড়

বেয়াড়া রকম উড়ছে বটে।" এই আশ্বাস পেয়ে আরও কয়েকটা পাখী ফেলে সেযাত্রা মান বাঁচালাম। আমি তখন ম্যাজিষ্ট্রেট, শিকার আমার এলাকার মধ্যেই হচ্ছিল, তবু এই ব্যাপার!

আর একবার এর চেয়েও বিভ্রাট ঘটেছিল। কারণ, নায়ক স্বয়ং পুলিস সাহেব। সেটা ছিল এক পাহাড়ে দেশ, কিন্তু জঙ্গল পাতলা, কাজেই জানোয়ারও খুব কম। কোন কোন জায়গায় দু-চারটে হরিণ মাত্র। নানারকম তোড়জোড় করে শিকার করতে হত। হয়ত একটা সমস্ত পাহাড় হাঁকা করে একটী হরিণ বের হবে। সেটী ফস্কালে সারা সকাল রৌদ্রে হাঁটাই সার। আমি দুই-একবার কপালজোরে একটু কারদানী দেখাতে পেরেছিলাম, তাই আমাকে গাঁয়ের লোকে খাতির করত। একদিন এই পুলিস সাহেবটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, আর পাটিলকে বিশেষ করে বলে দিলাম যে এঁকে একটা হরিণ দেওয়াই চাই। সুতরাং জঙ্গল ভাঙ্গবার সময় সব চেয়ে ভাল জায়গাটায় তাকে বসালে। কিন্তু বেচারার সেদিন নসীব খারাপ। দু-দুবার হরিণ এল একেবারে কাছে, সে আওয়াজও করলে, কিন্তু গুলি লাগল না। এতে সত্যি লজ্জার কিছু নেই! আর একটা হরিণ বের হলে হয়ত ঠিকই পেত। কিন্তু বেলা বারটা পর্য্যন্ত মানুষে কুকুরে সারা বনটা তোলপাড় করলে, আর কিছুই দেখা গেল না। শ্রান্ত হয়ে এক গাছতলায় সবাই বসে আছি, এমন সময় পাটিল বোধ হয় আশ্বাস দেবার অভিপ্রায়ে বললে,"আসছে বার, সাহেব, তোমার কাছে হরিণ বেঁধে এনে দেব।" সবাই হো হো করে হেসে উঠল। পাটিল আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি, বাবা, অত দূরে কেন বসলে?

আমাদের আজ মাংস একটু জুটল না।" সাহেবটী বিমর্ষভাবে বললে, "I didn't know I was such a rotten shot." (এত বড় আনাড়ী আমি, তা জানতাম না।) হয়ত এই পাটিলই গ্রামে কি শহরে হলে পাঁচ মিনিট অন্তর সাহেবের পায়ের ধূলো নিত। কিন্তু এ যে বন, এখানে সবাই সমান! বনের এই শিক্ষাটা আমাদের সকলের হওয়া ভাল নয় কি!

অকারণ নিষ্ঠুরতা সত্যি শিকারীর চোখেও নিন্দার জিনিস। যে শিকারী পাখী কি জানোয়ার জখম করে করে ছেড়ে দেয়, তার বড় দুর্নাম হয়। বাঘ জখম করে ছেড়ে আসা ত একটা গুরুতর অপরাধ! কারণ চোট-খাওয়া বাঘ দু-একদিনের ভেতর বনে এক-আধটা কাঠুরে মারবেই। যে বাঘ কখনও মানুষের সংস্রবে আসে নেই তার প্রথম চেষ্টা পলায়নের, কিন্তু যিনি গুলি খেয়েছেন কি মানুষের রক্ত আস্বাদন করেছেন, তিনি সদাই মানুষের পিছু ঘুরছেন। বাগ পেলেই ঘাড় মটকে দেবেন। শিকারের তাই একটা কড়া নিয়ম আছে যে, বাঘের উপর একবার গুলি ছুঁড়লে তাকে নিকেশ করে আসতেই হবে। আমার এক বাল্যবন্ধুর প্রথম বাঘ মারার গল্প বলি। তিনি উত্তরবঙ্গে কোনও মহকুমায় চাকরী করতেন। তাঁর শিকার প্রধানতঃ পদব্রজেই চলত। তবে কালেভদ্রে হাকিম মহাশয়ের সওয়ারীর হাতীটা পেতেন। দু-চারটে বনবরা' ও চিতাবাঘ মারার পর বন্ধুবরের সাধ হল এইবার একটা সত্যি গো-বাঘা মারবেন। একদিন খবর এল, এক দাড়ি-গোঁফওয়ালা প্রকাণ্ড বাঘ কাদের মহিষ মেরে এক হোগলা বনে নিয়ে ফেলেছে। আশে পাশে কোন বাঘমারা সাহেবলোক ছিলেন না, কাজেই

বন্ধুর সুযোগ মিলল। হাকিমবাবুর হাতী চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে এক মেচ-জাতীয় শিকারী। খুব ভোরে বনের বাইরে উপস্থিত হলেন। শিকারী নেমে দেখিয়ে দিলে কোন-খান দিয়ে বাঘ মহিষটাকে টেনে নিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে হাতী সেই পথে বনে ঢুকল। এ রকম ক্ষেত্রে হাতীর পায়ের শব্দে বাঘ সচরাচর পালায় না। বড় জোর একটু এদিক ওদিক সরে গিয়ে দেখে যে আগন্তুক কে! এবার কিন্তু তাও করলে না। হাতী একেবারে Kill-এর (মরা মহিষটার) সামনে বন্ধুবরকে উপস্থিত করলে। তিনি দেখলেন যে বাঘটা আধ শোওয়া অবস্থায় মহিষের ওপর তুই থাবা রেখে দিব্যি একমনে ছোট-হাজরী করছে। হাতীর পায়ের শব্দে তার প্রকাণ্ড চাকাপানা মুখখানা তুললে। বন্ধুবরের সঙ্গে চোখো-চোখি হল। এ সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখা খুবই শক্ত। তবে বন্ধু আজন্ম বনচারী, সহজে ঘেবড়ে যাবার পাত্র ছিলেন না। নিমেষের মধ্যে বাঘের তুই জ্বলন্ত চোখের মাঝে তাক করে লাগালেন গুলি। যেই না গুলি মারা, বাঘ ভীষণ গর্জ্জন করে দিলে এক লাফ। হাতীটা শিকারী হাতী ছিল না। গৌড়জনসুলভ প্রকৃতি। চক্ষের পলকে মুখ ফিরিয়ে উর্দ্ধপুচ্ছ হয়ে দৌড় দিলে। বন্ধু সতর্ক ছিলেন না, মাথায় একটা গাছের ডাল লেগে গড়িয়ে ভূঁইয়ে পড়ে গেলেন। চোট লেগে বেহোস হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে যখন জ্ঞান হল, দেখলেন যে হাত পা কিছু ভাঙ্গে নেই, কিন্তু বন্দুকটা তুখণ্ড হয়ে গেছে! সন্তর্পণে সরীসৃপ গতিতে বন থেকে বার হলেন। মহা সঙ্কট। জখম বাঘটাকে বনে ছেড়ে যেতেও পারেন না, অথচ ভাঙ্গা

বন্দুক নিয়ে করেনই বা কি! সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, আস্তে আস্তে সদরের পানে হেঁটে চললেন নূতন বন্দুক সংগ্রহ করে ফিরবেন বলে। তখন বেশ বেলা হয়েছে। হঠাৎ দেখলেন দূরে কে হাতী চড়ে যাচ্ছে। জোরে হাঁক ছাড়লেন। হাতী কাছে এলে দেখলেন এক পরিচিত গারো জমীদার। তাঁকে সব ঘটনা বলতেই তিনি তাঁর হাতী ও বন্দুক দিলেন। বন্ধু আবার বনে ঢুকলেন, এবার কিন্তু প্রাণ হাতে করে। জানতেন বাঘ সহজে ছাড়বে না। ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে হাতী যখন ভেতরে গেল, দেখলেন যে বাঘ মহিষের উপর শুয়ে আছে। একেবারে কাছে গেলেন, তবুও ওঠে না। তখন হাতী শুঁড় দিয়ে বাঘকে নাড়া দিলে। দেখা গেল, বাঘ মধ্যললাটে বিধিলিপি নিয়ে ব্যাঘ্রের প্রেতলোকে চলে গেছে। হাতীর উপর শব তুলে নিয়ে বন্ধু সেই গারো রাজার সঙ্গে মহাধূম করে নগর প্রবেশ করলেন। পকেটে যে রুটি ও গুড় ছিল, সেটা খাবার ফুরসৎ এতক্ষণে হল!

একটা ভালুক শিকারের গল্প বলি। Bad shot, অর্থাৎ বে-আন্দাজি গুলি মারা, কতটা লজ্জার কথা, পাঠক তা বুঝবেন। আমার পরিচিত এক সাহেব তাঁর দুই বন্ধু নিয়ে পশ্চিমে সুলেমান পর্ব্বতে ভালুক মারতে গেছলেন। তিন-জনেই পাকা শিকারী, কিন্তু সারা সকাল পাহাড়ে পাহাড়ে মহুয়া ও বাদাম গাছের তলায় ঘুরে একটাও ভালুক দেখতে পেলেন না। তখন কতকটা শ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে টিফিন বাক্স নিয়ে বসে পড়লেন পাহাড়ের গায়ে এক সরু তাকের উপর। সাহেবদের একটু ক্ষিদে বেশী, রসদের গোলযোগ হলে কাজ

পঙ্গু হয়ে যায়, এ কথা সবাই জানেন। আমার সাহেবরা যখন রুটি মাখন, নানারকম পশুপক্ষীর মাংস ও পানীয়ের বোতল নিয়ে বেশ জমে বসেছেন, খুব গল্প চলেছে, তখন হঠাৎ পাহাড়ের ফাটল থেকে এক বিশাল কালো ভালুক বেরিয়ে এল। যেই বেরোন, কি তিন সাহেবই চক্ষের নিমেষে বন্দুক তুলে দুম দাম দুম করে তার উপর তিন আওয়াজ! ঋক্ষরাজ তাক থেকে গড়িয়ে একেবারে খদে পড়ে গেলেন। তখন তিনজনে মহা তর্ক লেগে গেল। এ বলে আমার গুলি লেগেছে, ও বলে আমার গুলি। তিনজনের বন্দুকের ফাঁদল তিন মাপের, সুতরাং জানোয়ার দেখলেই ত বোঝা যাবে, কার গুলি লেগেছে। সমস্যা সমাধানের জন্য তিনজনেই খদে নেমে গেলেন! গিয়ে দেখলেন ভালুকটা মরে পড়ে রয়েছে বটে, কিন্তু তার গায়ে কোথাও গুলির দাগ নেই, পুচ্ছাগ্রে মাত্র একটা জখম। তখন তিনজনে আবার তর্ক। এ বলে ও তোমার গুলির দাগ, ও বলে ও তোমার। কেউই সে চমৎকার লক্ষ্যবেধের জন্যে দায়ী হতে চায় না। শেষে মিট-মাট হল। স্থির হল তিনজনেই নিশানা চুকেছেন, পড়বার সময়ে কোন কাঁটাগাছে লেগে ভালুকের ল্যাজের ডগা ছিঁড়ে গেছে।

আমি একবার বাঘের নাকে গুলি লাগিয়ে কি রকম লজ্জা পেয়েছিলাম, সে গল্পটাও করি। বাঘ শিকার অনেক রকমের হয়। এক রকম ত বলেছি, একটা হাতী নিয়ে, কি পায়ে হেঁটে, ধীরে ধীরে জঙ্গলে ঢুকে kill-এর উপর বাঘকে মারা। আর এক রকম হচ্ছে বড়লোকের শিকার, অনেক হাতী

নিয়ে। অধিকাংশ হাতী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সারবন্দী হয়ে জঙ্গল ভাঙ্গতে থাকে, আর যে দিকটায় বাঘ বেরিয়ে পালাবার সম্ভাবনা, সেই দিকে হাওদা-বাঁধা হাতীর উপর শিকারীরা ঘাটী আগলে বসেন। এই রকম শিকারে বাঘকে খুবই কাছে পাওয়া যায়। পেছনে তাড়া খেয়ে বাঘ বনের কিনারায় এসে মুখ তুলে একবার দেখে নেয়, সামনে কি আছে। সেই সময়ে মারবার খুব সুবিধা, যদি নিজের মাথা ঠিক থাকে। এই অবস্থায় আমি একদিন বাঘের অপেক্ষায় রয়েছি। আমার ছদিকে ছজন পাকা শিকারী। সামনের কেশেবনের উপরটা যে রকম ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছিল, তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে বাঘ সোজা আমার কাছে আসছে। হঠাৎ শেষ মুহূর্ত্তে একটু বেঁকে গিয়ে আমার ডানদিকের শিকারীর সামনে মাথা বাড়াল। তিনি আমাকে একটা সুযোগ দেবার ইচ্ছাতে চেঁচিয়ে বললেন, আপনি মারুন। আমার হাতীতে হাওদা ছিল না, pad-এর (গদীর) উপর পা ঝুলিয়ে বসেছিলাম, ঝট করে ঘুরে বসতে সাহস হল না। যদি হাতীটা হঠাৎ দৌড় মারে ত মুস্কিল! ডানদিকে নিশানা করতে বাধ বাধ ঠেকল। ফলে গুলি লাগল না। বাঘ ফিরে জঙ্গলে ঢুকল, কিন্তু বেশী দূর যেতে পারলে না, কেন না হাতীর লাইন অনেকটা এগিয়ে এসেছিল। ভয় পেয়ে বাঘ তিন লাফে আমার বাঁদিকের শিকারীর পাশ দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে বেরোল। তিনি মারলেন এক গুলি। বাঘ কিন্তু পড়ল না। আমরা তিনজনেই হাতী ফিরিয়ে তার পিছু নিলাম। খানিক দূরে দেখি এক কুল ঝোপের ভিতর বসে বাঘটা ভীষণ গর্জ্জাচ্ছে।

আমি এক ঘা মারতেই উল্‌টে পড়ল। আমি আনাড়ী শিকারী, মনে মহা আনন্দ হল, বাঘ মেরেছি। কিন্তু হাতীগুলো যখন তাকে টেনে বের করলে, দেখা গেল যে আমি গুলি না মারলেও বিশেষ কিছু এসে যেত না, কারণ আমার বাঁদিকের বন্ধু গোটা চারেক Buck shot ছররা তার বুকের ভিতর চালিয়ে দিয়েছিলেন। শিকারের নিয়ম অনুসারে বাঘ তাঁর, আমার নয়। হঠাৎ এক মাহুত বাঘের নাকের উপর এক জখম দেখিয়ে বললে, "হুজুরই প্রথম গুলি লাগিয়ে ছিলেন।" আমি সবেগে ঘাড় নেড়ে জানালাম যে, আমার গুলি মোটে লাগে নেই, ওটা ছররার দাগ।

আমার মৃগয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে এলেই হাস্যরসের অবতারণা হবে, সুতরাং সে আর কাজ নেই। এইবার একটা বড় দুঃখের গল্প বলি। পাঠক বুঝবেন, শিকারকাহিনীতে করুণ রসের অভাব নেই। একদিন এক ডাক্তারবাবু আমাদের বাড়ী এসেছিলেন বক্সা দুয়ারের এক চা বাগান থেকে। মস্ত বড় শিকারী বলে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল, তাই আমি তাঁকে বললাম, "আমায় নিয়ে একদিন বাঘ মারতে চলুন না।" তিনি বললেন "মশায়! আমি নাকে কানে খৎ দিয়ে বন্দুক ধরা ছেড়ে দিয়েছি।" কি হয়েছিল, বারবার জিজ্ঞেস করায় নিতান্ত অনিচ্ছায় এই গল্প বললেন। তাঁদের চা-বাগান প্রায় ৯০০ একার জমী। তার তিন ভাগের এক ভাগ পরিষ্কার করে বাগান হয়েছে, বাকী ৬০০ একার এখনও ভীষণ জঙ্গল, তার মধ্যে থাকে না হেন বুনো জানোয়ার নেই। সেই বনে পনের বছর ঘুরে ঘুরে আমাদের ডাক্তারবাবু অব্যর্থ লক্ষ্য ও

অগাধ সাহস সঞ্চয় করেছিলেন। এ ত আসামের বাগান নয় যে ডাক্তারকে নানা কাজে অকাজে ব্যস্ত থাকতে হয়! আর এখানকার কুলিরা পাহাড়ী, তাদের অত বেশী ঔষধপত্রও দরকার হয় না। তাই ডাক্তারের সময়ের অপ্রতুল ছিল না। তিন বছর আগের কথা। বিলেত হতে এক তাজা ছোট সাহেব এসেছেন। বড় সাহেব কাজে বড় ব্যস্ত, তাই ডাক্তারবাবুকে ডেকে বললেন, "ডাক্তার, ছোট সাহেবকে একটু শিকার করিয়ে নিয়ে এস।" এক পুরানো ওস্তাদ শিকারী হাতী ও মাহুত দিলেন। ছোট সাহেবের কিন্তু এ বন্দোবস্ত ভাল লাগল না। ডাক্তার একটা বাবু মাত্র, আর তার হাতে কি না বড় সাহেব ছেড়ে দিলেন শিকার শিখতে! বেচারার অদৃষ্ট, প্রথম থেকেই ডাক্তারের সঙ্গে খিটিমিটি আরম্ভ করলে, ডাক্তারকে জানিয়ে দিলে যে সে আপন দেশে অনেক শিকার করেছে, তার নূতন শেখবার কিছু নেই। হাতী ক্রমে গভীর বনে এসে উপস্থিত হল। সন্তর্পণে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। শিকারের কানুন অনুসারে মানুষ তিনটীই নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক। এমন সময় দূরে দেখা গেল এক প্রকাণ্ড বারশিঙ্গা হরিণ চরছে। সাহেবকে ডাক্তার বললেন, বেশ করে তাক করে একটা গুলি লাগাও। ছোকরাটী বন্দুক তুললে বটে, কিন্তু হাতীর শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য যতটা গা নড়ে তাতেই তার হাত কাঁপতে লাগল। সে নীচে নেমে মারতে চাইলে। ডাক্তার অনেক বারণ করলেন, প্রবীণ মাহুত জোড়হাত করলে, কিন্তু সেখানে বেশী কথা ত কওয়ার জো নেই, তাকে বন্ধ করা গেল না। হাতীর ল্যাজ বেয়ে নেমে পড়ল, আর

হরিণের উপর আওয়াজ করলে। হরিণ পালাল, কিন্তু এদিকে চক্ষের পলকে এক ভীষণ ব্যাপার হয়ে গেল। কাছের বেত ঝোপ থেকে বেরিয়ে এক প্রকাণ্ড বাঘ এক লাফে ছোকরার ঘাড়ে এসে পড়ল। দেখতে না দেখতে বাঘে মানুষে ধূলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। ডাক্তার ইতিমধ্যে নেমে পড়েছেন, কিন্তু প্রায় মিনিটখানেক ভরসা করে গুলি মারতে পারলেন না, যদি ছোকরাটীর গায়ে লাগে। যখন সুবিধে পেলেন, মারলেন বটে, বাঘও গুলি খেয়ে চীৎ হয়ে পড়ল, কিন্তু সাহেবটীর মাথা তার আগেই দু থাবার মাঝে পিশে গুঁড়ো করে দিয়েছিল। শব দুটো নিয়ে ডাক্তার বড় সাহেবের বাঙ্গলায় ফিরলেন। তিনি দেখামাত্র সব বুঝলেন, গম্ভীর স্বরে বললেন, "তুমি চলে যাও ডাক্তার, আর আমাকে কখনও মুখ দেখিও না।" ডাক্তার নীরবে মাথা হেঁট করে চলে গেলেন। পরের দিন খুব ভোরে সাহেব ডাক্তারের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। আসবাব পত্র প্যাক করা দেখে কাতরভাবে বললেন, "ডাক্তারবাবু, তুমি আমি পনের বছরের বন্ধু। কুঠির বন্ধু নয়, আফিসের বন্ধু নয়, বন জঙ্গলের বন্ধু, আমার একটা কথায় রাগ করে চলে যেও না। কিন্তু ছোকরা মায়ের এক ছেলে ছিল, বিশ্বাস করে তিনি আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাকে আমরা রক্ষা করতে পারলাম না, ডাক্তার!" ডাক্তার উঠে গিয়ে তাঁর সাধের বন্দুকটী নিয়ে এলেন, নলটা ধরে ভূঁয়ে আছাড় মেরে তিন টুকরো করে ফেললেন। সাহেব নিঃশব্দে টুকরোগুলো তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেই থেকে ডাক্তার আর বন্দুক ধরেন নেই।

ইংরেজিতে যাকে sport বলে, তাতে নীচতা বা বীরধর্ম্মের অবমাননা কিছু নেই। সাহেবরা বসা পাখী মারেন না। কেউ মারলে তাকে pot shot (হাঁড়ী ভরাবার জন্য শিকার) বলেন। হাতীর উপর থেকে বা মাচানের উপর থেকে বাঘ মারাতে শিকারীর বিপদের অন্ত নেই, তাই সেটাও sport বলেই গণ্য। কিন্তু কোথাও কোথাও রাজোয়াড়াতে কোঠা-বাড়ীর মধ্যে বসে যে বাঘ মারা হয়, সেটা খুন-খারাবীর সামিল। সেই রকম, মোটারে বসে ভীষণ ঝকঝকে আলো ফেলে জানোয়ারের চোখ অন্ধ করে দিয়ে তাকে গুলি মারা, সেও আমার মতে কসাইয়ের কাজ। সত্যি, স্বীকার না করে উপায় নেই যে যথার্থ মরদের মত বাঘ মারা পায়ে হেঁটেই হয়ে থাকে। ইতিহাসের শের আফগান সম্মুখযুদ্ধেই শের মেরেছিলেন। আমাদের একালে যতীন মুখুয্যেও মল্লযুদ্ধে বাঘ মেরে 'বাঘমারা যতীন' নাম পেয়েছিলেন। অবশ্য, বাঘকে ভগবান যেমন নখদন্ত দিয়েছেন তাতে শিকারীর হাতে অস্ত্র থাকায় পরাক্রমের লাঘব হয় না। একবার এক মস্ত জাঁদরেল ইন্দোরের শিবাজীরাও হোলকারের দরবারে উপস্থিত হয়ে শের মারা সম্বন্ধে নানা গল্পগুজব করছিলেন। হোলকার জিজ্ঞেস করলেন, "সাহেব, তুমি কি রকম করে শের মার?" বেচারা সেনানী জবাব দিলেন যে মাচানই তাঁর মতে প্রশস্ত উপায়। রাজা আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "তুমি না জাঁদরেল, গাছের উপর থেকে লুকিয়ে বাঘ শিকার কর!" সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ, আপনি তবে কি করে মারেন?" রাজা উত্তর করলেন, "শের কে সাথ শের কী লড়াই। চলিয়ে

স্মবোকো মেরে সাথ, বাতায়ঙ্গে।" সাহেব গেছলেন কি না, আমি শুনি নেই। এই হোলকার না কি পাগল ছিলেন। সিংহাসন ছাড়ার পর কিছুদিন মাথেরান পাহাড়ে থাকতেন। একদিন এক পারসী ছোকরা খুব জোর সাহেবী কাপড় পরে মহা কায়দায় তাঁর বাড়ীর সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল। ঘোড়াটা কিন্তু তার খোঁড়াচ্ছিল! হোলকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে ডাক দিলেন, "পারসী, এই পারসী! ইধার আও।" সে বেচারা প্রাণপণ চেষ্টায় তার সোলাটুপীর মর্য্যাদা রক্ষা করছিল, ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। রাজাও ছাড়বার পাত্র নয়, সেপাই পাঠিয়ে তাকে ঘোড়া-সুদ্ধ ধরিয়ে আনালেন। হিন্দীতে হুকুম করলেন, "উতর যাও, ঘোড়ে কা পায়ের দেখো।" দেখা গেল এক পায়ে ঘা, তাই ঘোড়াটা খোঁড়াচ্ছিল। রাজা চটে আগুন হয়ে গেলেন। চার জন লোক সঙ্গে দিয়ে পারসীটাকে বললেন, "ঘোড়ার মুখ ধরে আস্তে আস্তে আস্তাবলে নিয়ে যাও। পথে যদি ঘোড়ায় চড়তে চেষ্টা কর, ত আমার সেপাইরা তোমায় খদে ফেলে দেবে। আর ফের যদি কোন ঘোড়াকে কষ্ট দাও,ত তোমার ঠ্যাঙ্গ ভেঙ্গে দেব।" পাগল বই কি, নইলে বাঘের জন্য, ঘোড়ার জন্য, এত দরদ!

হরিণ শিকারে বড় আনন্দ পাওয়া যায়, যদিও তাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। পাঠক আমাকে হঠাৎ কাপুরুষ বলে বসবেন না যেন। হরিণগুলো যে রকম নির্ম্মমভাবে ক্ষেতের শস্য ধ্বংস করে, তা দেখলে বুঝবেন যে তাদের মেরে ফেলা অস্ত্রধারীর একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে। বরাহ

আর হরিণ কৃষকের এত বড় শত্রু বলেই মৃগ-মাংস ক্ষত্রিয়ের প্রশস্ত খাদ্য বলে নির্দ্ধারিত হয়েছিল। Sport-এর জন্য হরিণ শিকার পায়ে হেঁটেই হয়। দূর থেকে হরিণ নজর করে নিয়ে, আস্তে আস্তে কখনও ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে, কখনও বুকে হেঁটে, সন্তর্পণে, বন্দুকের পাল্লার মধ্যে গিয়ে পৌছান যে কত আনন্দ তো বর্ণনা করে বোঝান সম্ভব নয়। তার পরে ঠিক জায়গাটীতে গুলি না লাগাতে পারলে হরিণ হস্তগত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই, কারণ, সে এক ছুটে ক্রোশ-খানেক বেরিয়ে যাবে। ক্ষেতের শস্য নষ্ট করাতে কিন্তু সেরা হচ্ছে গণ্ডার। একা একটা গণ্ডার এক রাত্তিরের ভেতর বেশ আট-দশখানা ক্ষেত বিধ্বস্ত করে দিতে পারে। তাই উত্তর বঙ্গের হিন্দুরা গণ্ডারমাংসকে অতি পবিত্র মনে করে। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের সময় এই মাংস পেলে শ্রাদ্ধ না কি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়! আগে ঐ দেশে অজস্র গণ্ডার ছিল। ক্রমশঃ খুব কমে গেছে। শুনলাম সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার নাকি গণ্ডার বাঁচাবার জন্য আইন করেছেন। এই দরদটা সময়ে হলে, আজ অতিকায় megalosaurus ও dinosaurus পথে পথে ঘুরে বেড়াত। বাড়ী বাড়ী টিয়া পাখীর বদলে লোকে pterodactyl পুষত। তারা ত সব গেল, এখন গণ্ডারটা বাঁচলেই পৃথিবীর সৌন্দর্য্য কায়েম থাকবে। কি দয়ার শরীর মানুষের! পাখমারাদের কিন্তু দয়ামায়া নেই, তাদের মন্ত্র, "মারি ত গণ্ডার, লুটি ত ভাণ্ডার!" কিন্তু সকলের অদৃষ্টে ত গণ্ডারের দেখা মেলে না। আমার কপালক্রমে একবার মিলেছিল, পাঠককে সেই গল্পটা শোনাব। একদিন কুচবেহারে

দুই খবরিয়া আমার কাছে এসে বললে যে, এগার মাইল দূরে এক গণ্ডার এসেছে, আর গাঁয়ের লোকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তাকে কোন রকমে আটকে রেখেছে এক বাবলা বনে। তাদের ইচ্ছা, আমি গিয়ে মারি। সে সময় সারা রাজ্যে গোটা পাঁচ-সাত গণ্ডার বই ছিল না। তাদের সযতনে সরকারী জঙ্গলে পুরে রাখা হত, বংশ বৃদ্ধি হবে এই আশায়। আমি স্থির বুঝলাম যে, এ তারি একটা, আর একে আমি মারলে রাজদণ্ড, অন্ততঃ রাজরোষ, অবশ্যম্ভাবী। মেজ রাজকুমার তখন কুচবেহারে ছিলেন। তিনি স্থির করলেন, যে গণ্ডারের বিরুদ্ধে অভিযান অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে শিখিয়ে-পড়িয়ে এই গল্প রচনা করা গেল যে, জানোয়ারটা এ রাজ্যের নয়, রঙ্গপুর জেলা থেকে এসেছে। গাড়ী চেপে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হলাম। তিনটী হাতী সংগ্রহ করে পাঠান হয়েছিল। এক দল কলেজের ছাত্র গেঁড়া মারা দেখার জন্য জিদ করে সঙ্গে চলল। পৌঁছে দেখা গেল আট-দশ বিঘে এক বাবলা বন, তাই ঘেরে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অস্ত্র, কেরাসীনের টিন, ঢোলক ইত্যাদি। রাজ-কুমার একটা হাতী চড়ে দূরে বনের উল্টো পিঠে চলে গেলেন। স্থ—দ্বিতীয় হাতী নিয়ে ডাইনের দিকে গেলেন। বনের সামনে যে একটু খোলা ময়দান ছিল, তার এক দিকে কচুয়া সাহেব তৃতীয় হাতীর উপর রইলেন, অন্যদিকে আমি ছেলেদের নিয়ে ভুঁইয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাজকুমার আমার হাতে একটা খুব জোরালো Cordite বন্দুক দিয়েছিলেন কিন্তু আমার মতলব ছিল যে পারতপক্ষে বন্দুক ছুড়ব না। ছেলেদিকে আমার পিছনে সূচীব্যূহ করে দাঁড় করিয়েছিলাম। তাদের তালিম

দিয়ে রেখেছিলাম যে, গেঁড়া যদি আমাদের পানে তাড়া করে, ত সকলে দিক বিদিকে দৌড় দেবে, সোজা নয়, এঁকে বেঁকে। তাদের বাঁচাবার জন্যে দরকার হয় ত আমি বন্দুক ছুঁড়ব, নইলে নয়। সকলে আপন আপন ঘাটি নিলে পর একটা বাঁশী বাজল, আর চাষারা চারিদিকে মহা উৎসাহে ঢাক-ঢোল বাজাতে আরম্ভ করে দিলে। দেখা গেল যে, বনের ভেতর একটা বাচ্চা হাতীর মত জন্তু দৌড়াদৌড়ি করছে, একবার এদিক একবার ওদিক, যেন ভয় পেয়েছে। হঠাৎ দড়াম করে এক মোটা আওয়াজ হল, বোঝা গেল স্—তার প্রকাণ্ড সেকেলে ten bore রাইফেলটা ছুঁড়েছে। গেঁড়া বনের ভেতর ঢুকে পড়ল। স্,—চেঁচিয়ে বললে, "সাবধান জিৎ, লেগেছে", আবার বন্দুকের আওয়াজ হল, এবার পিং গোছের শব্দ, বুঝলাম রাজকুমার মারলেন। সোঁ করে একটা গুলি ছেলেদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। ভীষণ দুর্ঘটনা হতে হতে বেঁচে গেল। কিন্তু বিধাতা পুরুষকে ডাকবার আমার সময় ছিল না, কারণ তখনই সেই প্রকাণ্ড গণ্ড-মৃগ জঙ্গল ভেঙ্গে ময়দানে উপস্থিত হল। কোন দিকে যায়! দেখতে দেখতে কচুয়া সাহেবের হাতীর দিকে মাথা নীচু করে তেড়ে গেল। ভাগলো হাতী ল্যাজ তুলে। সাহেব দুবার বন্দুক চালালেন, লাগল না। গণ্ডারটা যে কি ভয়ানক দেখাচ্ছিল, কি বলব! স্—র গুলিটা গলার কাছে লেগে অনেকখানা মাংস বেরিয়ে পড়েছে, ঝর ঝর করে রক্ত বইছে, রাগে পাগল হয়ে প্রথমে হাতীটাকে তাড়া করলে, তার পর এক টাট্টু ঘোড়া চরছিল সেটাকে প্রায় খতম করলে। আমরা

কৃষ্ণনাম জপছিলাম, কিম্বা ওইরকম একটা কিছু করছিলাম। যাক্, ছেলেদের দিকে ফিরল না। বিশ-পঁচিশ হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। কি বিকট শব্দ হচ্ছিল, কি রকম থক্ থক্ থক্ করে কাসছিল, আর গায়ের ঢালগুলো খসখস আওয়াজ করছিল। আমার বেয়ারাটা ত ভয়ে আত্মহারা হয়ে কুকরি হাতে সেই জখম গেঁড়ার পিছু পিছু ছুটল। গেঁড়া পালাল, পিছু পিছু উড়ে বেয়ারা। কচুয়া সাহেবকে নিয়ে তাঁর হাতী অন্তর্দ্ধান। দুই-এক মিনিটে রাজকুমার ও সু—"কোথা গেল, কোথা গেল," করতে করতে এসে পড়লেন। আমি বলে দিলাম আমার বেয়ারার পাগড়ী লক্ষ্য করে সোজা চলে যাও, কিন্তু ও বেচারাকে মেরো না যেন! হাতী দুটো ছুটল, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম। একটু গিয়েই দেখি, অনেক দূরে গেঁড়াটা কুকুরের মতন ল্যাজের কুণ্ডলীর উপর বসে রয়েছে। বোধ হল আর দৌড়বার দম নেই। প্রায় তিনশো কদম দূর থেকে রাজকুমার গুলি লাগাতেই উল্‌টে পড়ল। তার পর দুদিন ধরে সেই পবিত্র মাংস বিতরণ হল। সে দিন বন্দুক না মেরে আমি বড় বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলাম। রাজকুমার নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ নিলেন, তাই মহারাজের রাগ হতে সু—বেঁচে গেল।

যদি পাঠকের মনে এ রকম কোনও কুসংস্কার থাকে যে জাতিবিশেষের শিকার বিষয়ে একটা জন্মগত অধিকার আছে, তা হলে আমি মিনতি করি যে সেটা বর্জ্জন করুন। কি লক্ষ্য-ভেদে কি সাহস পরাক্রমে অমুক দেশের লোকের প্রাক্তন সংস্কার আছে, তা বলা যায় না। সবটাই আবেষ্টনের কথা।

মৃগয়া অর্থ-সাপেক্ষ আমোদ। অজস্র টোটা না ওড়ালে সিদ্ধি-লাভ হয় না। তবে সিদ্ধি নানারকমের। রাজা-রাজড়াদের শিকারক্যাম্প কতকটা political (মৎলবী) ব্যাপার। তাই অতিথি এলে তাঁকে তুষ্ট করার রীতিমত বন্দোবস্ত রাজা-বাহাদুরদের থাকে। খুব মহামান্য অতিথির খাতিরে মাংসে আফিঙ্গ মিশিয়ে বনে রেখে দেওয়া হয় এ রকম নিন্দাবাদও শুনেছি। এটা বাড়াবাড়ি, হয়ত সত্যি কথা নয়। কিন্তু আর এক রকম ব্যবস্থার কথা অনেকেই জানেন। রাজা খুব হুঁসিয়ার দেখে বেছে একজন A. D. C.-কে অতিথির হাওদায় বসিয়ে দেন, আর খুব শক্ত তাকীদ দিয়ে রাখেন, "এঁকে আজকের বাঘটা দেওয়াই চাই, বুঝলি? ওঁর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক আওয়াজ করবি, আর বলবি যে তোর গুলি লাগে নেই।" ফলে অতিথির ব্যাঘ্র হনন নির্ব্বিবাদে সমাধা হয়। আরও যে কত রকম ফন্দী আছে বলা শক্ত। পাঠক হয়ত জানেন আমাদের দেশে দাড়ীওয়ালা সিংহ এখন আর নেই। কাঠিয়াবাড়ে গীর জঙ্গলে এক রকম নেড়া সিংহ আছে মাত্র। একবার এক রাজা কোনও মহাপুরুষকে খুসী করবার জন্য লুকিয়ে বারটা দাড়ীওয়ালা সিংহ আফ্রিকা থেকে আনিয়ে বনে ছেড়ে দিয়েছিলেন। হয়ত সে সময় তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল, কিন্তু পরে সব কথাটা জানাজানি হয়ে যায়। হলেই বা কি! জানেন ত, দুকানকাটা গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে যায়! এ সব কিন্তু sport নয়, sport-এর নামে ধাপ্পাবাজী। তবু জানা ভাল। কুচবেহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কর্জ্জন লাটের একবার বড় মন কষাকষি হয়েছিল। ব্যাপারটা

নিয়ে দেশময় ঢি ঢি পড়ে গেছল। মহারাজ লাট সাহেবকে এক রকম তুড়ি দিয়েই বাদশাহের হুকুম নিয়ে অভিষেক উৎসবে বিলেত চলে গেলেন। মেজাজী লাটসাহেব এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। শেষ, ঝগড়াটা যে মিটল, সে শিকারের সাহায্যে। এমন একটা সময় এল যখন ভূটান সংক্রান্ত কিছু কাজে কর্জ্জন সাহেবের মহারাজকে দরকার পড়ল। অন্য কেউ হলে দুচারটে সেলামীর তোপ বাড়িয়ে দিলেই কার্য্যোদ্ধার হত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে লাটসাহেব শিকারের চার ফেললেন। আসামে ধূম করে শিকার-ক্যাম্প ফেললেন, আর মহারাজকে অনুরোধ করলেন তার সম্পূর্ণ ভার নিতে। বহুদিনের মনোমালিন্য দূর হল। আসল কাজের কি হল তা আমার জানা নেই। তবে শিকারের পর আমাদের মহারাজ ভূটানের রাজপ্রতিনিধি থাম্পু জাম্পেনের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে গেছলেন, মনে আছে। এটাও মনে আছে যে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে বিনা আয়াসে কিছু টাকা ধার পাওয়া গেছল ঐ সময়ে। কর্জ্জন সাহেব রাজকার্য্যও সম্পন্ন করলেন, বাঘও মারলেন। শিকারের political aspect (রাজনৈতিক উপযোগ) দেখিয়ে এ পর্ব্ব শেষ করলাম।

৫

ইস্কুলের বিদ্যা শেষ করে ১৮৯০ সালে বাগ্‌দেবীর মন্দির -তোরণে ধরনা দিতে কলকাতায় এলাম। পাঠককে গোড়াতেই

বলে রাখা ভাল যে বিদ্যা বেশী সঞ্চয় হল না শেষ পর্য্যন্ত, কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল অনেক। যাহোক, আমার সুবুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধির জন্য বাণীমন্দিরকে দায়ী করলে অন্যায় হবে। মানুষের যে বিষয় সম্পত্তি থাকে, তার কতক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, আর কতক স্বোপার্জ্জিত। আমার কলকাতার কীর্ত্তি সম্পূর্ণ স্বোপার্জ্জিত। একটা কথা হয়ত আগে বলি নেই যে জন্মের সময় সনাতন প্রথামত এক জন্ম-পত্রিকা তৈয়ার হয়েছিল। তার ফলাফল সম্বন্ধে কখনও কুতূহল হয় নেই, কিন্তু শুনেছি যে মোটামুটি তার ডিক্রী এই রকম যে বুধ আর বৃহস্পতি আমাকে নিয়ে সারা জীবন টানা হেঁচড়া করবে। কলকাতায় যে এলাম তার কারণ বুধের চাঞ্চল্য না বৃহস্পতির জ্ঞানপিপাসা, তা আজও ঠিক করতে পারি নেই। যাহোক, ১৮৯০ সালে বাড়ী ছেড়ে এই আমার প্রথম পাড়ি। কলকাতার ছবছরের জীবনকে ওয়েসিসের সঙ্গে তুলনা করতে পারলাম না, কারণ আমার বাকী জীবনটা মোটেই মরুভূমি নয়। জীবনটাকে মোটামুটি রসময় বলেই পেয়েছি। রসময় বলতে তো নানা রস বোঝায়, আমার কলকাতার জীবন তারই একটা রকমারী!

খুব সঙ্গোপনে একটা কথা পাঠকের কাছে জানাচ্ছি, যে আমার এই সময়টা সম্বন্ধে নানা মিথ্যা কথা বলতে হবে। তার প্রথম কারণ যে বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই সাংসারিক হিসেবে এত উঁচু জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছেন যে তাঁদের বাল্যজীবনের কতকটা অলৌকিকত্ব না দেখাতে পারলে সাজন্ত হবে না; কাজেই দরকার হলে দুচারটে ঘটনা ঠাকুরমার ঝুলি থেকে বের

করব। দ্বিতীয় কারণ, ব্রহ্মচর্য্য স্থুরু করতে না করতেই আমার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ঘটল, অর্থাৎ কলেজে পড়তে পড়তেই কলকাতা আমার শ্বশুরবাড়ী হল। এখন আমি যদি বলি কলকাতায় বারমাস কোকিল ডাকে না, গঙ্গার জল উজান বয় না, ষ্টীমারের বাঁশী ছাড়া কোন বাঁশী বাজে না, তাহলে কি সেটা ভাল দেখাবে? এই সব পাঁচরকম কারণে আমার জীবনের এই অংশটায় একটু বেশী করে কল্পনার রঙ্গ চড়াতে আমি বাধ্য।

কলেজ খোলবার আগে লম্বা ছুটিটা এবার দেশে কাটিয়েছিলাম। আগে জানিয়েছি যে তখন মনে একটা বেশ বড় রকম টিকি গজিয়ে ছিল। সেই টিকির জন্যই এবার দেশে এই আড়াই মাস কাল এত ভাল লেগেছিল। সব ভাল লেগেছিল, এমন কি গ্রামের দলাদলি পর্য্যন্ত। গাঁয়ে এক ওলাইচণ্ডীতলা ছিল। সেখানে নানরকম কাণ্ড হত, যার আজ কোন অর্থই বুঝতে পারি না। তখন কিন্তু তার প্রত্যেক খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত জানতাম, আর তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতাম। পূর্ব্বপুরুষদের বসান ভগ্নপ্রায় মন্দিরগুলোর ক্রিয়াকর্ম্ম খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতাম। ভালও লাগত। কিন্তু এত সাত্ত্বিকভাব সত্ত্বেও বন্দুকের ঝোঁক ছাড়তে পারি নেই। একদিন আমরা দুতিনজন গোটাকয়েক কাঁদাখোঁচা মেরে কাছের এক গ্রামের ভেতর দিয়ে আসছি। দুই বৃদ্ধা জল নিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন, আর একজনকে জিজ্ঞেস করলেন "এরা কারা লো?" তিনি চুপি চুপি কি জবাব দিলেন। তখন প্রথম বৃদ্ধা বেশ চেঁচিয়ে বার দুই

বললেন, "দেখ-সে লো দেখ-সে, কালী রায়ের ছেলেগুনো পাখমারা হয়েছে!" আমরা পাখীগুলো সেইখানেই ফেলে দিয়ে মানে মানে চম্পট দিলাম। তামসিক আহারের হাত থেকে সেদিনের মত নিষ্কৃতি পেলাম। এই এক বার মাত্র ধরা পড়েছিলাম, তা নইলে রায়মহাশয়ের ছেলেদের বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে দেবদ্বিজে ভক্তির অপূর্ব্ব সংযোগ দেখে গ্রামের ভদ্রমণ্ডলী চমৎকৃত হয়েছিলেন। ছেলেরা এখন বললে বিশ্বাস করবে না যে পুরো আড়াই মাস সনাতন ধর্ম্মানুমোদিত খাদ্য খেয়েই কাটিয়েছিলাম। কিন্তু বৃথা প্রয়াস! দেশের অবনতি বন্ধ হল না। কয়েক বছর পরে আমার ভ্রাতা যখনই গ্রামে যেতেন তাঁর পাঁউরুটি কেক বাবত অনেক খরচ হত। হপ্তায় একদিন করে আমাদের গ্রামে হাট বসত। মহা উৎসাহে আমরা দরোয়ানের সঙ্গে তোলা আদায় করতে যেতাম। যতদূর মনে আছে আদায় বেশ জোরেই করতাম। আদায় ব্যাপারটা সনাতন ধর্ম্মসঙ্গত কি না, তাই আগ্রহের অভাব ছিল না।

একদিন রাজেন্দ্রবাবু নামে এক ভদ্রলোক এলেন। তিনি আমাদের দূর কুটুম্ব। পরে ফকীর রাজেন্দ্রনাথ ও ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী নামে খ্যাত হয়েছিলেন। গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপে তিনি এক বক্তৃতা দিলেন। দশভুজা মূর্ত্তি আর সন্ধি-পূজার বলি সম্বন্ধে এমন আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করলেন যে গাঁয়ের লোক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আমাদের কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল। সনাতন ধর্ম্মের আর বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অদ্ভুত সমন্বয়—জগাখিচুড়ী—বলে।

তর্কচূড়ামণির বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা আগেই শোনা অভ্যাস ছিল ত !

আষাঢ় মাস পড়তে না পড়তে ভীষণ বৃষ্টি নামল। দামোদরে বান এল। দেখতে দেখতে চারিদিক জলে জলময় হয়ে গেল। জল মরবার আগেই ছুটি শেষ হল। কিন্তু নিরুপায়, ভেলায় চড়ে ত আর সাগর পার হওয়া যায় না। সেজন্য মনে কিন্তু ক্ষোভ রইল না। আমার কোষ্ঠীর বৃহস্পতির ফলাফল দিন কয়েক মুলতুবী রইল মাত্র। ইতিমধ্যে বুধকে সহায় করে ডিঙ্গীতে আর ভেলাতে চেপে চতুর্দ্দিক তোলপাড় করতে লাগলাম। পাড়াগাঁয়ে ছেলে হলেও দিনে দশবার ঘোলা বেনো জলে ডুব দেওয়া ত অভ্যাস ছিল না ! বরদাস্ত হল না। কলকাতায় এসে দশদিন ডাক্তারবাবু কুইনিন হস্তে মেলেরিয়ার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করে কোনও রকমে খাড়া করলেন। কুইনিনের প্রভাবে মেঠো রঙ্গটা গেল। একটা কাঞ্চনবর্ণ আভা মুখে দেখা দিলে। তখন সাহস করে শহুরে কলেজে ঢুকতে পারলাম।

যে কেলাসে ঢুকলাম সেটার একমাত্র বর্ণনা হতে পারে —হরিঘোষের গোয়াল। লেকচার হত, কিন্তু শোনা যেত না। দুয়েকদিনেই বুঝতে পারলাম যে যদি কিছু বিদ্যা শিক্ষা করতে পারি ত সে ওখানে হবে না, অন্যত্র। কিছুদিন পরে কেলাসটা দুভাগ হয়ে গেল। মোটামুটি একটা ভাগে হেয়ার ইস্কুল হিন্দু ইস্কুলের মার্জ্জিতরুচি ছেলেরা গেল, আর অন্যটায় আমরা শ' খানেক জঙ্গলী অর্থাৎ বাঙ্গাল, রেঢ়ো, ও মুসলমান গেলাম। কিন্তু এই সেক্‌শান্ ভাগ হওয়ার আগের একটা ঘটনা বলি।

তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাঙ্গালী মাষ্টার খুব কমই ছিলেন। তাঁদেরই একজনের কেলাসে কার্ত্তিকপূজার দিন টেবিলের উপর ঠাকুর এনে রাখা স্থির হল। আমার অত্যন্ত লজ্জা হওয়া উচিত একথা স্বীকার করতে যে আমি ঐ ব্যাপারে সামিল ছিলাম, তবে চুনোপুঁটিস্বরূপ। ধুরন্ধর যাঁরা ছিলেন তাঁদের একজন আজ নেই, আর একজন এখন যোগাভ্যাস করেন। মাষ্টার মশায় টেবিলাধিষ্ঠিত দেবসেনানীকে দেখে প্রথমটা রেগে কথা কইতে পারলেন না। দুই এক মিনিট চুপ করে থেকে তার পর বজ্র-গম্ভীরস্বরে হাঁকলেন, "তোমাদের বলে দিচ্ছি যে আমি অপরাধীকে খুঁজে বের করবই, আর রাষ্টিকেট করাব।" এই না বলে, তিনি ঘুরে ঘুরে আমাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "তুমি কিছু জান?" আমাদের দিকের প্রায় সত্তর-আশীজন নির্ভীক বীরের মত বললাম, "না স্যার, আমরা কিছুই জানি না।" তখন মাষ্টারমশাই আমাদের দিকে পেছন করে অন্য দিকের ছেলেদের জিজ্ঞেস পড়া করতে লাগলেন। তাদেরও কয়েকজন "না" বলার পরে যার কাছে মাষ্টারমশায় পৌঁছলেন তিনি অপেক্ষাকৃত বয়স্থ, মুখে ছোট্ট ছাগল-দাড়ী, ঢাকা জেলায় বাড়ী, ধর্ম্মে ব্রাহ্ম। আমাদের সেকালের ব্রাহ্মরা মিথ্যা কথা কইতেন না। অতএব এই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে, একটু বুক ফুলিয়ে বললেন, "আমি জানি, স্যার।" বলে, বোধ হয়, নাম প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে একটা অঘটন ঘটল। আমাদের ষড়যন্ত্রের নেতা তাঁর কলমকাটা ছুরীর ফলাটা খুলে একটু নাটুকে ভাবে

সেটা ছোরার মত ভাঁজতে লাগলেন। দাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকটী ছুরী দেখবামাত্র মুখব্যাদন করে ধপ করে বসে পড়লেন। আর মুখে কথা সরল না। জগতে আবার সত্যের নিগ্রহ, মিথ্যার জয় হল! জলখাবার ঘরের উড়িয়া বেয়ারাটার এক টাকা জরিমানা হল। আমরা সেটা গোপনে দিয়ে দিলাম।

এ সব গল্পগুলো বলার একমাত্র উদ্দেশ্য এই দেখান যে ছেলেমানুষ চিরদিনই ছেলেমানুষ। একটা বে-পরোয়া ভাব, একটা চাঞ্চল্য, তার নিজস্ব। অনেক বৃদ্ধের মুখে শুনি যে সেকালে আমরা গোপালের মতন সুবোধ বালক ছিলাম, আর আজকালকার ছোকরারা হয়েছে কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত বর্ব্বর। এটা নিছক রূপকথা। গোপালের দল আজও বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিরাজমান। তবে তাদের হাতে বঙ্গমাতার দুঃখ কি ঘুচবে? আমার তাতে ঘোর সন্দেহ। মা পথ চেয়ে রয়েছেন লর্ড ক্লাইবের মতন সোনার চাঁদদের জন্য।

আমরা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকি, তখন আমাদের বড় সাহেব ছিলেন খ্যাতনামা মিষ্টার টনী। তাঁর ছাত্রেরা শিক্ষক হিসাবে তাঁর খুব তারীফ করতেন। আমার নিজের তাঁর কাছে পড়বার সৌভাগ্য হয় নেই। তবে বড় সাহেব বলে সংস্রবে আসতে হয়েছিল বই কি! তিনি আর পাঁচজন বড় সাহেবের মতই দুরধিগম্য ছিলেন। মোটের উপর কলেজটা বড় সাহেব, মেজ সাহেব, ছোট সাহেব, বড় বাবু, মেজ বাবু, ছোট বাবু অধিষ্ঠিত একটা প্রকাণ্ড সরকারী আপিসের মত ছিল। এঁদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ক কিছুই ছিল না। টনী মহাশয়কে বার দুই দেখে-

ছিলাম বলে মনে আছে। একবার যখন আমাদের কেলাস সুদ্ধ বিনা দোষে জরিমানা করতে আসেন, আর একবার যখন সেই জরিমানা প্রত্যাহার করাবার জন্য তাঁর খাস কামরায় যেতে হয়েছিল। এই সাহেবের শেষ বয়সের কীর্ত্তি যে তিনি বিলেতে প্রকাশ্য সভায় সমস্ত বাঙ্গালী জাতটাকে মিথ্যাবাদী—monumental liars—বলেছিলেন। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি!

ঢাকার ছেলেদের কাছে ঢাকা কলেজে শিক্ষক ছাত্রের এক-সঙ্গে খেলাধূলোর গল্প শুনে আমাদের বিশ্বাস করা শক্ত হত। কারণ, আমাদের খেলার ক্লাবে সাহেব বা বাঙ্গালী অধ্যাপক একদিনও কেউ খেলতে আসেন নেই। কলেজের বাঙ্গালী মাষ্টাররা সর্ব্বরকমে ইংরেজদের নকল করতেন। আমাদের সঙ্গে যদি কখনও বারান্দায় লাইব্রেরীতে কথা কইতে হত, তা ইংরেজীতেই কইতেন। ধূতি পরে কোন অধ্যাপকই আসতেন না—পণ্ডিত মশায়রাও নয়!

এই সূত্রে বেশভূষার কথা একটু বললে বোধ হয় অপ্রা-সঙ্গিক হবে না। ধূতির তখন বড় দুর্দ্দিন। সাহেবদের অবজ্ঞা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ত ছিলই। তা ছাড়া শহরের নানাস্থানে ধূতি পরে প্রবেশ নিষেধ ছিল। দুটো একটা জায়গার নাম করি। ইডেন গার্ডনের গঙ্গার দিকটায় অনেকখানা জায়গা পাতলুন -ওয়ালাদের জন্য দড়ি দিয়ে ঘেরা থাকত। ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়ো খেলতে গেলেও ধূতি-পরিহিত লোকের অনেক বাধা বিপত্তি ছিল। আপিস সভা সমিতির ত কথাই নেই! এই সবে আমাদের নিজেদের মনেও ধারণা জন্মে গেছল যে

কোনও সভ্যভব্য স্থানে যেতে হলে একটা ইজার চড়ানই চাই। বিদ্যাসাগর মশায় অবশ্য কখনও ইজার পরেন নেই। কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল, যিনি সর্ব্বত্র ধূতি পরে ঘুরতেন, তিনিও টাউন হলের সভায় যেতে হলে একটা চাপকান চোগা চড়িয়ে নিতেন। কলেজের ছেলেদের বেশভূষার কথাও একটু বলি। নানা ঢপের পিরান, পাঞ্জাবী ও মের্জ্জাই তখনও সৃষ্টি হয় নেই। আমরা গৃহস্থ ঘরের ছেলেরা ধূতির সঙ্গে হয় কামিজ পরতাম, নয় খাটো গলাবন্ধ কোর্ত্তা। তবে গায়ে একটা চাদর সর্ব্বদাই থাকত। পায়ে অধিকাংশ ছেলেই ফিতে বাঁধা কালো জুতো পরত। নাগরা হিন্দুস্থানীদের একচেটে ছিল। আর মাদ্রাজী চটী মাদ্রাজীদের। বড়লোকের মধ্যে বিদ্যা-সাগর মশায় পরতেন ঠনঠনের চটি, মহেন্দ্রবাবু পরতেন তালতলা। আমাদের চটী পরে নগর পরিভ্রমণ রেওয়াজ ছিল না। এই ত হল সাধারণ পোষাক। তবে ধনীলোকের ছেলেদের, কি সাহেববাড়ীর ছেলেদের, ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। তখন জাতিভেদ প্রবল, আজই না সব একাকার হয়ে গেছে!

কলেজে উঠে প্রথম বছরে বাবার হুকুমে জিনের ইজার ও গলাবন্ধ কোর্ত্তা পরে যেতে হত। অনেকেরই এই সাজ ছিল। তাই বিশেষ খারাপ লাগত না। কিন্তু একদিন এক বিভ্রাট হল। শিয়ালদহ ষ্টেশনে গেছি ঐ বেশে। গাড়ীর অপেক্ষায় প্লাটফর্মে বেড়াচ্ছি, এমন সময় এক সাহেব আমাকে টিকিটবাবু মনে করে ট্রেন সম্বন্ধে নানাপ্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। সাহেবকে ত কোন রকমে ভাগালাম, কিন্তু মনে

বড় দুঃখ হল! দূর হোক্‌গে, আর ইজার কোর্ত্তা পরব না! তার পরদিন থেকে ধুতি পরে কলেজে যেতে লাগলাম। মা এতে খুশী হলেন বলেই মনে হল। বাবার অনুমতি তিনিই আনিয়ে দিলেন। এইভাবে কিছুদিন চলল, কিন্তু যখন বি এ পাশ করলাম তখন দুতিন জোড়া কোট-প্যাণ্টুলুন সংগ্রহ করতে হল। বড় হয়েছি, পাঁচ রকম সভাসমিতি জলসায় যেতে হবে ত! সে কোট-প্যাণ্টুলুন সাজও ছিল অপরূপ! মাথায় গোল টুপী, গায়ে গলাবন্ধ পার্সীকলার খাটো কোর্ত্তা ও ফতুই। ভেতরে বিলেতী কামিজ, তার ছাতি তক্তার মতন শক্ত। ইজারটা পূরোপুরি ইংরেজী ফেশানের। আমার কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ! এত সাধের সভ্য কাপড় পরেও একদিন এমন বিপদে পড়লাম যে, বিলেত রওয়ানা হওয়া পর্য্যন্ত বাকী কটা দিন ধুতি পরেই কাটিয়ে দিতে হল। ব্যাপারটা বলি। মিসেস বেসাণ্টের তখন খুব নাম ডাক। তিনি কলকাতায় এলেন বক্তৃতা করতে। টাউন হলে প্রকাণ্ড সভা জমল। আমি আমার "মিটিংকা কাপড়া" পরে গিয়ে একেবারে সামনের সারে জাঁকিয়ে বসলাম। বক্তৃতা চলল। বক্তা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। টাউন হল্‌ ভরা জনতা একেবারে নিস্তব্ধ। এমন সময়, হঠাৎ মনে হল, বক্তা আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে খুব জোরে বলছেন, And you there in your English costume, let me tell you, that behind your starched shirt front there beats a Hindu heart।' "আর, তুমি বিলেতী সাজে সজ্জিত বাবু, তোমাকে আমি বলি যে তোমার ঐ বর্ম্মের মত কঠিন

কামিজের বুকের ভেতর যে হৃদয় লুকানো আছে, সেটা হিন্দুর হৃদয়।”

আশে পাশে সকলের নজর আমার উপর পড়ল। আমার Hindu heart (হিন্দু-হৃদয়) এমন হুড় হুড় করে উঠল, যে আমি চুপি চুপি হল্ থেকে বেরিয়ে একেবারে বাড়ী পালালাম। ইজার কোর্ত্তা পরা ঘুচল কিছুদিনের মত।

আবার কলেজের কথা বলি। আমাদের রসায়নের থিয়েটার ছিল একটা আলাদা একতলা বাড়ীতে। ঘণ্টা পড়লেই, সেই দিকে শখানেক ছেলে ঠেলাঠেলি করে উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়ান, আমাদের একটা নিত্যকর্ম্ম ছিল। ফার্ষ্ট ইয়ারে একদিন এই ঘোড়দৌড়ে আমি ফার্ষ্ট হয়ে কি গোল বাধিয়েছিলাম, শুনুন। থিয়েটারে উঠতে হত পেছনে সরু এক কাঠের গোল সিঁড়ি দিয়ে। আমি সেই সিঁড়ি বেয়ে হুড় হুড় করে যেই উপরে উঠেছি, দেখি যে তখনও সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস চলছে। ডাক্তার রায়, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, কেলাস নিচ্ছেন। আমায় দেখেই সেকেণ্ড ইয়ারের একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে খুব থিয়েটারী ঢঙ্গে হাত নেড়ে বলে উঠলেন, “ভগ্নদূত ! কহ শুনি লঙ্কার সমাচার।” চারিদিকে হাসির রোল উঠল। আমি হুড়মুড় করে আমার পিছনের ছেলেদের ঘাড়ে পড়লাম। এই ভদ্রলোক পরে একজন পেশাদার অভিনেতা হয়ে খুব নাম কিনেছিলেন। অনেক বছর বাদে একবার ‘চোখের বালি’ নাটক দেখতে গিয়ে তাঁকে হঠাৎ ‘বিহারীর’ ভূমিকায় দেখে এই পুরোনো গল্প মনে পড়ে গেছল। ফলে প্রায় দশ মিনিট হাসি থামাতে পারি নেই।

সঙ্গীদের অনেক করে বোঝাতে হয়েছিল যে রবিবাবুর 'বিহারী' চরিত্রে হাস্যাস্পদ কিছু নেই।

ডাক্তার রায়ের কথা বলতে বলতে মনে পড়ছে যে propagandist zeal (প্রচার কার্য্যে উৎসাহ) সেকালেও তাঁর বড় কম ছিল না। তবে তখনও তিনি দেশসুদ্ধ লোককে বৈশ্যধর্ম্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা আরম্ভ করেন নেই। উৎসাহ বেশী ছিল ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে। রসায়নের মধ্যেও তিনি মাঝে মাঝে সংস্কার-রস আবিষ্কার করতেন, আর আমাদের সেই রস বিতরণ করতেন। দুয়েকটা নমুনা দেব। অঙ্গার (carbon)সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার সময় আমাদের শেখালেন "অঙ্গার পরমাণুর চার হাত, তোমাদের বিষ্ণুর মত।" সাবান তৈরী করা দেখিয়ে আমাদের গ্যালারীর দিকে ফিরে হাসি-মুখে বললেন, "এরই নাম সাবান, সেই মহামূল্য জিনিস, যা মেথরকে ব্রাহ্মণ করতে পারে।" আশ্চর্য্য রূপক! তবে হিন্দু ছাত্রের কেলাসে ব্রাহ্ম অধ্যাপকের এমনতর কথা না বলাই বোধ হয় সুশোভন হত। আমাদের কেউ কেউ এ কথা তাঁর কাছে নিবেদনও করেছিলেন। আচার্য্যদেব পরম পূজনীয় ব্যক্তি। তাঁর সম্বন্ধে এ গল্প করা হয়ত অমার্জ্জনীয়। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য এই দেখান যে হিন্দু আজও যেমন, তখনও তেমন, "নিজ বাসভূমে পরবাসী।" নইলে, আচার্য্যদেব সেই অল্প বয়সেও দানশীল ও উন্নতমনা ছিলেন। কলেজের বাহিরে, ছাত্র সমাজের উপর তাঁর অসীম দয়া ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথা ছিল ছাত্রদের তৃণজ্ঞান করা। তিনিও

কলেজের চৌহদ্দির ভেতর তা ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নেই।

কিছুদিনের জন্য বুথ সাহেব বলে আমাদের এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক এসেছিলেন। তিনি বিশালকায় জোয়ান ছিলেন ও খুব ভাল ক্রিকেট খেলতেন। তবে আমাদের সঙ্গে কখন খেলেনও নেই, আমাদের কোনদিন খেলতে শেখানও নেই। তাঁর একটা গল্প মনে হচ্ছে, গল্পটার সঙ্গে টনী সাহেবের বাক্য —"monumental liars"-এর কিছু যোগ আছে। একদিন আমাদের কোন সহপাঠী গ্রন্থাগারে এক আলমারীর সামনে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের বই দেখছিলেন। হঠাৎ বুথ সাহেব সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। বন্ধু তাঁকে অভিবাদন করলেন, কিন্তু সরলেন না। সাহেব তাঁর পেছনে পা ফাঁক করে কলোসাসের মতন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পর রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ডাফ্টারী, ডাফ্টারী, নিকাল দেও।" দপ্তরী আমাদের নিয়মিত বখশীস-ভুক্ প্রাণী, সে শ্যাম রাখি কুল রাখি ভাবে বন্ধুকে সরে যেতে মিনতি করলে। বন্ধু সরে গেলেন, কিন্তু বাহিরে এসে তাঁর ভেতরকার সুপ্ত সিংহ জেগে উঠল। বড় সাহেবের কাছে দরখাস্ত করলেন যে তাঁর ইজ্জতে বিষম ঘা লেগেছে। তখন বড় সাহেব ছিলেন সর্ব্বজনপ্রিয় গ্রিফিথস সাহেব। তিনি বুথ সাহেবের কৈফিয়ৎ চাইলেন। সাহেব বললেন, তিনি বাবুকে কিছুই বলেন নেই, নিকলের (Nicoll) একখানা বই দপ্তরীর কাছে চেয়েছিলেন মাত্র। এ কৈফিয়তের টীকা অনাবশ্যক।

কিছুদিন টনী সাহেবের কথাগুলো লোকের মুখে মুখে ফিরত। একদিন রো সাহেবের কেলাসে কয়েকজন ছাত্র একসঙ্গে ডুমদাম করে বই বন্ধ করাতে সাহেব বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে করেছে?" কেউ যখন কবুল করলে না, তখন তিনি এক গাল হেসে বললেন "Oh! You monumental liars!" এমন মধুর হেসে কথাটা বললেন যে কেউ রাগ করলে না। আর ভেবে দেখলে, এ কথা বলতে মেকলে থেকে কার্জ্জন পর্য্যন্ত কোন সাহেবই বা কসুর করেছেন! এই রো সাহেব ব্যবহারে বড় অমায়িক ছিলেন। মাঝে মাঝে কেলাসে বাঙ্গলা কথারও বুকনি দিতেন। প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরী হলে সাক্ষীগোপাল, বিধুমুখী, ইত্যাদি নানা নাম ধরে ডাকতেন। কেলাসে যে সব হাসি-তামাশা করতেন, তা কখন কখন আদিরসাশ্রিত হয়ে পড়ত। এক আধটা উদাহরণ না দিলে হয়ত কেউ বিশ্বাস করবেন না। একদিন কেলাসে জিজ্ঞেস করলেন যে গ্রীক পুরাণের Graces কজন? উত্তর হল, চার জন। সাহেব হেসে বললেন, "চতুর্থ টীকে হাজির করতে পার হে? তাঁরা বেশ সাজ-গোজ করেন।" ব্যাপার হচ্ছে এই, যে এই গ্রীক দেবীরা তিন জন, এবং তাঁদের মূর্ত্তি দিগম্বরী। আর একদিন নানা রকম Knight-দের কথা বলতে বলতে হঠাৎ মেয়েদের Garter সম্বন্ধে যে রসাল টিপ্পনী কাটলেন, তা আমার পাঠিকাদের ভয়ে এখানে ব্যক্ত করতে পারলাম না। একদিন এই সাহেব হাসি ঠাট্টার মাত্রা একটু বেশী চড়িয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু অন্য রকমে। ফলে মুসলমানরা (আমরাও পিছনে ছিলাম)

তাঁকে মাপ চাইয়ে ছেড়েছিল। কিন্তু তিনি মাপ চেয়েছিলেন যে ভাষায়, সে অতি অপরূপ। "আমার কোন পোষা জন্তুকে আমি যা কিছু নাম দিতে পারি। তোমরা মূর্খ, ইংরেজী বোঝ না।"

রো সাহেবের নাম করলেই ওয়েব সাহেবের নাম মনে পড়ে। এই দুই সাহিত্যরথী, শুধু কলেজ কেন, সমগ্র বাঙ্গলাদেশকে ইংরেজী শেখাবার ভার মাথায় করে নিয়েছিলেন। গালাগালও খেয়েছিলেন অনেক। তাঁদের সে বই আজ ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীতে আশ্রয় নিয়েছে, অন্যত্র আর বড় দেখা যায় না। এ ছাড়া ওয়েব সাহেব নেটিবদিকে ইংরেজী আদব-কায়দা শেখাবার মতলবে আর এক বই লিখেছিলেন। এক সময় সরকারের সকল বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর টেবিলেই সে বই দেখা যেত। আমি ওয়েব সাহেবের কাছে কখনও পড়ি নেই কিন্তু তাঁর আদব কায়দা সম্বন্ধে জ্ঞান কি রকম ছিল, তার নমুনা পাঠককে একটা দেব। আমি বছর দুই Dr. Atkinson বলে এক সাহেবের কাছে পড়তে যেতাম। সাহেব এক বড় ইংরেজী কলেজের কর্ত্তা ছিলেন। আমার সঙ্গে তিনি এমন সুন্দর ব্যবহার করতেন যেন এটা ভারত নয়, যেন আমি বিলেতের ছাত্র। একদিন পড়ার সময় তিনি বললেন, "আজ আমাদের চা খাওয়া এখানে নয়, ওয়েব সাহেবের বাড়ীতে। তাঁকে চেন ত?" আমি জানালাম, "চিনি, যে রকম প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষক ছাত্রের পরিচয় হয়ে থাকে।" যথাসময় ওয়েব সাহেবের ওখানে দুজনে চা খেতে গেলাম। সাহেব আমাকে সমস্ত সময়টা Baboo,

Baboo, করে কথা কইতে লাগলেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে আমার ভাত ও নেটিব তরকারীর অভাবে চা খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে না ত! আমার তখন সব কথা বোঝবার হয়ত ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু Dr. Atkinson নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, কেন না তিনি বেরিয়ে যাবার সময় আমায় বললেন, "I am sorry I brought you here, lad" (তোমাকে এখানে না আনলেই ভাল হত)। নিজের কলেজের নিন্দা আর কত করব! এম এ কেলাসে অবস্থার অনেক উন্নতি হল। হতে পারে আমরা বড় হয়েছি বলে, হতে পারে আবহাওয়া বদলাচ্ছিল বলে! নিন্দা ত অনেক করলাম, কিন্তু তুজন অধ্যাপক, যাঁরা অন্ততঃ আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তাঁদেরও নাম করব, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও অধ্যাপক পেডলার। যত দূর মনে আছে, এই তুজনকে সকলেই ভালবাসত। প্রেসিডেন্সী কলেজের দমবন্ধ করা হাওয়াতে না থাকতে হলে এঁদের গুণ আরও ফুটে বেরোত।

প্রেসিডেন্সী কলেজের সভা সমিতি ও খেলার ক্লাবের কথা পরে বলব। আমাদের সময়েই এখনকার Institute, Higher Training Society নাম নিয়ে আরম্ভ হল। তার প্রধান পাণ্ডা ছিলেন আমাদের অধ্যাপক উইলসন। আমার নিজের ঘটনাচক্রে higher training (উচ্চশিক্ষা) হল না। সোসাইটীর ঘরে তাস খেলা সঙ্গত কি না এই নিয়ে সাহেবের সঙ্গে মতভেদ হওয়াতে আমাদিকে সোসাইটী ত্যাগ করে অন্যত্র তাসের আড্ডা জমাতে হল। এই তাসের আড্ডার মেম্বার কেউ কেউ এখন ভারতের ভাগ্যবিধাতার মধ্যে গণ্য। তাঁদের নাম করলে রসভঙ্গ হবে!

এই সময়েই কলেজের Speech Day (বাৎসরিক উৎসব) সুরু হল। প্রথম উৎসবে Julius Cœsar-এর হত্যাকাণ্ড ও Merchant of Venice-এর আদালতের দৃশ্য অভিনয় হল। অধ্যাপক উইলসন সাহেব ও Oxford Mission-এর ডগলাস সাহেব আমাদের শিক্ষক ছিলেন। অভিনয় ভালই হল, অন্ততঃ লাট সাহেব এলিয়ট তাই বলে গেলেন। একটা মজার কথা কেবল মনে হয়, যে সেদিন Cœsar-কে যাঁরা খুন করলেন, তাঁরা অনেকেই আজ নিজেরা উচ্চ মসনদে অধিষ্ঠিত। আর যিনি Portia হয়েছিলেন তিনি আদালতকে বহুদূরে ঠেলে রেখে আজ সরকারের আবকারী মালের হেপাজৎ করছেন। একমাত্র Antony তাঁর থিয়েটারের পার্ট কায়েম রেখেছেন। প্রিয়দর্শন Brutus-কে খুনে আসামী সেজে যা দেখিয়েছিল, জজ সেজে তার চেয়ে অনেক ভাল দেখায়।

এলিয়ট সাহেবের নাম করতে মনে পড়ে গেল যে তিনি এক সময় বাঙ্গলাদেশে ধূম ধড়াক্কা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রদেশে জুরীর বিচার তুলে দেওয়ার জন্য হঠাৎ কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। কিন্তু এমন বিষম হৈ চৈ বাধল, যে কিছু করে উঠতে পারলেন না। এই সিভিলিয়ান লাট সাহেব শুধু যে দেশী লোকদের উত্যক্ত করেছিলেন তা নয়, ইংরেজ বড় হাকিমদেরও প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। এক গল্প আছে যে একবার তিনি ষ্টীমারে সফরে বেরিয়ে, ষ্টীমার খুব দূরে নোঙ্গর করে ডিঙ্গী বেয়ে পাবনার সদরে উপস্থিত হলেন, আর সোজা স্থানীয় হাকীমদের কাছারীতে চলে গেলেন।

বড় হাকীম তখনও আসেন নেই, যদিও ১১টা বেজে গেছল। লাট সাহেব তাঁকে ডাকিয়ে এনে খুব ধমকে দিলেন, মাষ্টার যেমন ইস্কুলের ছেলেকে ধমকায়। কখন কাকে অপদস্থ হতে হবে এই ভয়ে কিছুদিন হাকীমবর্গ সন্ত্রস্ত থাকতেন।

একবার এলিয়ট সাহেব কুচবেহারে এসেছিলেন। দেশী রাজ্যে লাটেরা যান প্রধানতঃ শিকার ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপারের জন্য। কিন্তু এই সময়ে মহারাজের নিজের ও রাজ্যের অনেক খরচ বেড়ে গিয়েছিল বলে কিঞ্চিত ধমকে দেওয়াও বোধ হয় এলিয়ট সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল। এই সাহেবের বাঁধা বুলি ছিল, "আমি জঁাকজমক আড়ম্বর দেখতে পারি না, আমি চাই কাজ!" এঁর গুণাগুণ সম্বন্ধে বাবা সবই শুনেছিলেন আগে, প্রধানতঃ সেক্রেটারী মহল থেকেই। তাই তিনি মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে রেখে-ছিলেন যে দেখাবেন, কুচবেহারেও তাঁরা efficiency-র উপাসক—কাজের লোক। স্থির হল মহারাজ ষ্টেট-কর্ম্ম-চারীদের নিয়ে রাজবাড়ীতেই লাট সাহেবকে স্বাগত করবেন। আর বাবা তাঁকে অভ্যর্থনা করবেন ১২ কোশ দূরে, যেখানে সীমান্তে রেল থামে। যথা সময় ট্রেন এল। ষ্টেশনে বাবা একজন মাত্র চাপরাসী নিয়ে উপস্থিত। স্বয়ং খাকী চাপকান পরে বগলে এক সাদা ছাতা নিয়ে, আর চাপরাসী এক আধ-ময়লা পট্টুর কোট পরে ধূতির উপর পট্টী বেঁধে। লাট সাহেব অযথা জঁাকজমকের জন্য কাউকে না ধমকাতে পেয়ে বোধ হয় একটু নিরাশ হলেন। তখন প্রায় দশটা। বাহিরে দুই হাতী তৈয়ার ছিল। বাবা সাহেবকে অভি-

বাদনাদি করে বললেন যে তিনি যদি শ্রান্ত না হয়ে গিয়ে থাকেন ত ধরলা নদীর চর ঘুরিয়ে নিয়ে যাবেন, যেখানে যেখানে দুই রাজ্যের সীমানা সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলছে। সাহেব তাঁর অদম্য উৎসাহ নিয়ে সব চরগুলো দেখে বারোটার সময় ওপারে ডাকবাঙ্গলায় পৌঁছলেন। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন হল। আড়ম্বর কিছু ছিল না। একজন মাত্র খানসামা খাবার পরিবেশন করলে। তার পর বাবা একটুক্ষণ মধ্যাহ্ন বিশ্রামের কথা তোলাতে সাহেব বললেন, "না, ও সব কুঁড়েমি আমার নেই। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।" বাবা বললেন, "যদি আপত্তি না থাকে ত পথে আপনাকে চওড়াহাট বন্দর দেখিয়ে নিয়ে যাব, যেখানে রেলী, আপকার, এদের বড় বড় পাটের আড়ত আছে।" লাট সাহেব তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন।

চওড়াহাট ইত্যাদি দেখে যখন রাজধানীর প্রান্তে পৌঁছলেন তখন চারটে বেজে গেছে। সেখানে তোরসা নদীর পারঘাটে জঙ্গী ও পুলিস কর্ত্তারা সাহেব বাহাদুরকে সেলামী দিলেন। তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন বালক রাজকুমার ও একজন A.D.C. (মহারাজের পার্শ্বচর)। আবার দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর সোজা রাজবাড়ী যাবেন, না পথে সেপাইদের ও সওয়ারদের লাইন (Lines) দেখে যাবেন ? সাহেবের কর্ম্মপিপাসা তখনও নিবৃত্ত হয় নেই। বললেন যে পথে যা দ্রষ্টব্য আছে, সব দেখে যাবেন। কাজ শেষ করে পাঁচটায় রাজবাড়ী পৌঁছলেন। নেমেই মহারাজকে বললেন, "আপনার রাজ্যের চমৎকার বন্দোবস্ত। সর্ব্বত্র নিয়মিত কাজকর্ম্মের

হাওয়া।” মহারাজ জানতেন, একটু হাসলেন। যে দুতিন দিন এলিয়ট সাহেব কুচবেহারে রইলেন, এই একইভাবে এঁরা তাঁকে ঘোরালেন। ধূমধামও নিতান্ত মামুলী রকমের বেশী হল না। সাহেব এত আনন্দে সময় কাটালেন যে খরচ পত্রের জন্য টীকা টিপ্পনী কিছু আর করলেন না। ফেরবার আগে সাহেবের একজন কর্ম্মচারী মহারাজকে বলে এল, “আপনার দেওয়ানের এলিয়টের চেয়েও বেশী এলিয়টি চাল।” সেবার দার্জ্জিলিঙ্গে একাধিক সিবিলিয়ান মহারাজকে খুব তারীফ করেছিলেন এই বলে যে, “তোমরা দেশী রাজ্যে জান, কাকে কি রকমে জব্দ করতে হয়।” এলিয়ট সাহেব নিজে দার্জ্জিলিঙ্গে বাবাকে ডেকে বললেন যে নূতন বছরে তাঁকে রাজা খেতাব দেবেন। বাবা নিজের দারিদ্র্য উল্লেখ করে কোন রকমে পার পেলেন, বটে! কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের কুমার বাহাদুর হওয়াটা মিছেমিছি ফসকে গেল।

৬

এই এলিয়ট সাহেব গৌণভাবে আমার অদৃষ্টচক্রে ফিরিয়েছিলেন, তাই তাঁকে আমার এত ভাল করে মনে আছে। গল্পটা উল্লেখযোগ্য শুধু এই দেখাবার জন্য যে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। ছেলেবেলা থেকে আমার একটা আতঙ্ক ছিল যে আমাকে একদিন ভারত শাসনের ইস্পাতের ফ্রেমে আঁটা হবে। উঠতে বসতে এই কথা আমায়

শুনতে হত। কিন্তু কলেজে ঢোকার পর পাঁচরকম কারণে আশা হচ্ছিল যে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহতি পাব। ইতি-মধ্যে লাট-বাহাদুরের কুচবেহারে শুভাগমন হল, রাজ্যের কর্ত্তাদের কারদানির জন্য সাহেব তুষ্টও হলেন। পিতাঠাকুর পাকা রাজনীতিবিৎ ছিলেন। রাজ্য চালনার প্রধান নীতি হচ্ছে এই যে লেন-দেনের হিসাব ঠিক থাকবে, অর্থাৎ অপর পক্ষ ফাঁকি দিয়ে কিছু মেরে না নেয়, সেইটে দেখতে হবে। কুচবেহার কর্ত্তৃপক্ষের সেবার চেষ্টা হল যে এত কষ্ট ও খরচ যখন করা গেছে, তখন কিছু সুবিধা করে নিতে হবে। এই রাজ্যে একটা গোলমাল বহুদিন থেকে চলে আসছিল। অমাত্য দুই জন ছিলেন। একজন আমার বাবা, অন্যজন এক সাহেব। এই dyarchy-র দরুন ষ্টেটের অনর্থক অনেক-গুলো টাকা খরচ হয়ে যেত। যখন এলিয়ট সাহেব বাবাকে পুরস্কৃত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন বাবা ষ্টেটের এই দুঃখের কথা তুললেন, "কাজ দুজনের মত যখন নেই, তখন আমাদের একজনকে সরিয়ে দেবার অনুমতি করুন।" খানিক-ক্ষণ আলোচনার পর সাহেব বললেন—"নেটীব রাজ্যে একজন নেটীব দেওয়ান চাই। কাজেই তোমার যাওয়া হতে পারে না। তুমি যদি সিবিলিয়ান হতে, তা হলে না হয় সাহেবকে সরিয়ে নিয়ে তোমার একার উপর সব ভার দেওয়া যেত। কিন্তু তা যখন নয়, তখন হিন্দুস্থান সরকার কিছুতেই রাজী হবেন না।" তার পর খুব সৌজন্য করে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ছেলে সার্বিসে ঢুকছে, না ?" বাবা কলকাতায় এসে আমায় আদেশ করলেন যে সিবিলিয়ান

আমায় হতেই হবে। ফলে, ইস্পাতের ফ্রেমে একখণ্ড কর্কের ছিপি বসানর ব্যবস্থা হল। ফ্রেমের তুর্দ্দৈব!

ছিপিরও গ্রহের ফের। কোথায় ঘরের কোণে বোতলে আঁটা পড়ে থাকবে, তা না এক প্রকাণ্ড কারখানার ষ্টীল ফ্রেমের ওজন পড়ল তার ঘাড়ের উপর। কর্কের তৈরী বলেই পিষে গুঁড়ো হয়ে যায় নেই। বহুদিন থেকেই ফ্রেমের জন্য এদেশী পেরেক সংগ্রহ হচ্ছিল। ইস্পাত না হলেও কাঁচা লোহার পেরেক অনেক মিলছিল। কাজ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু যে লাটের নিরর্থক সৌজন্যের ফলে একটা কর্কের ছিপিকে সেই কাজে লাগান হল, তাঁকে আমি অভিনন্দন না করে থাকি কি করে? তাঁর বিদ্যার কথা জানি না, তবে তাঁর কীর্ত্তিকে অঘটনঘটনপটীয়সী বললে দোষ কি?

আমার ছেলেবেলার শিক্ষা-দীক্ষার কথা বলেছি। মন্ত্রীপুত্রের মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নই স্বাভাবিক। সে স্বপ্ন অনেক দেখতাম। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে হাকীম হওয়ার উচ্চাশা কখনও হয় নেই, যদি চ আমাকে ক্রমাগত লোভ দেখান হত যে নেটীব সিবিলিয়ান ত এইবার কমিশনার হয়েছে, আর তু-পাঁচ বছরে লাটও হবে। লাট হওয়ার লোভ কিছুতেই হত না। ভারতে ইংরেজ সরকারের প্রাধান্য তখন সবে একশ বছরের। তাই তার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দেওয়ার উৎসাহ ছিল না। বরং খুব ইচ্ছা হত যে একটা দেশী রাজ্য হাতে নিয়ে গড়ে তুলি। কে জানে, ভবিষ্যতে কি সুযোগ হবে! এদেশের পাঁচ হাজার বছরের বিচিত্র ইতিহাসে

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উত্থান ও পতন ত কত শত হয়ে গেছে! চাকরী সম্বন্ধে আমার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ দেখি নেই। প্রথম বয়সে মাত্র একজন বড় চাকরী নিয়েছিলেন। অধিকাংশের নজর সে দিকে ছিল না। আজ যে তাঁরা অনেকেই বর্ত্তমান ভারতের টোডরমল মানসিংহের পদে অধিষ্ঠিত সে কেবল দেশের হাওয়া বদলেছে বলে, সরকার দেশের লোককে শাসনকার্য্যে সহায় হতে ডেকেছেন বলে।

আমাদের এক Bohemian Society, ভবঘুরে সমিতি, ছিল। তার বৈঠক বসত প্রধানত বন্ধুবর প—র গোয়া-বাগানের বাসায়। সেখানে কর্ত্তৃপক্ষের উপদ্রব ছিল না। এক পণ্ডিত মশায় ছিলেন। তিনি চমৎকার লোক। আমা-দিকে সর্ব্বদা ভূরি ভোজনে তৃপ্ত রাখতেন। আমাদের সমিতির সাধারণ কার্য্যক্রম ছিল তাসখেলা ও জলযোগ। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে প্রোগ্রামও বিশিষ্ট রকমের হত। "গোড়ায় গলদ" পাঠ ও অভিনয় আমাদের খুব প্রিয় জিনিস ছিল। দুয়েকবার Variety Programme-এর মত হয়েছিল। কমিটি ঠিক করতেন কে কি অভিনয় করবে। অভিনেতাদের পারদর্শিতার দিকে কমিটির ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আদেশ অনুসারে কেউ বা বাঙ্গলা গান করতেন, কেউ ইংরেজী সঙ্গীত চর্চ্চা করতেন, কেউ বা তিব্বতী ভাষায় অভিনয় করতেন। সব কথা এখন মনে নেই, তবে ভূ— এমন সরসভাবে "আজি যে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে" আবৃত্তি করেছিলেন যে আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সকলেই তখন নববিবাহিত। বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা

আবৃত্তি অল্প বিস্তর সবাইকেই করতে হত। তবু এমনটী কখনও শুনি নেই। আমাদের ডাক্তার বন্ধু এক ইংরেজী গান করলেন। এ বিষয়ে সেই দিন তাঁর হাতে-খড়ি হল। পরে বিলেতে কতবার শুনেছি, স্নান করতে করতে তিনি খুব জোর ইংরেজী গান গাইছেন। আমার অদৃষ্টে পড়েছিল বাংলা প্রবন্ধ পাঠ। প্রবন্ধের প্রায় সবটাই কড়ি ও কোমল, মানসী, ও সোনার তরী হতে চুরী। কিন্তু বিষয়-মাহাত্ম্য এমনই জিনিস, যে মণ্ডলীর সকলেরই বেশ ভাল লেগেছিল, অর্থাৎ আমাকে কেউ বই বা দোয়াত ছুড়ে মারেন নেই।

আমাদের কলেজের কবছর রবীন্দ্রনাথ ছাত্রমহলে খুব দেখা দিতেন। তিনি নানাস্থানে প্রবন্ধপাঠ করতেন। আমরা দল বেঁধে যেতাম, আর পাঠ হয়ে গেলেই 'গান, গান' করে চীৎকার করতাম। এই সব সভাতেই "আমায় বোলোনা গাহিতে বোলোনা", "আমায় সত্য মিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও" ইত্যাদি গান প্রথম বের হয়। কবিবর তখন আমাদের রবিবাবু ছিলেন। কর্ত্তারা তাঁকে নেক নজরে দেখতেন না। অনেক বাড়ীতে তাঁরা বলতেন যে রবি ঠাকুর বড় মানুষের ছেলে, কাজ নেই কর্ম্ম নেই, বসে বসে ছেলে বখাচ্ছে। যখন এ সব ব্যাপারের হিসেব নিকেস হবে, তখন হয়ত দেখা যাবে যে, প্রথম বঙ্কিম, তার পর কবি, সত্যই তিনপুরুষ বখিয়েছেন। খুব ভালই করেছেন, কেন না সুবোধ বালকের দৌরাত্ম্য বড় বেশী হয়েছিল।

একটা বিষয়ে আমার কবিবরের বিরুদ্ধে নালিশ আছে। অত বড় লোককে যখন কাঠগড়ায় খাড়া করছি, তখন আমার

কেসটা খুলে বলা দরকার। বালিকাবধূর সঙ্গে প্রেমচর্চ্চাকে তিনি ঠাট্টা করেছিলেন, সেজন্য আমাদের কারও মনে ব্যথা লেগেছিল, এ আমি শুনি নেই! বরং কেউ কেউ সেই কবিতা থেকেই লাইন তুলে প্রেমপত্রে নিজের বলে চালিয়ে দিতেন। কিন্তু তখনকার দিনে ফিরিঙ্গীরা যে পথে ঘাটে দুর্ব্বল লোককে নির্য্যাতন করত সে বিষয়ে কবি কোন কথা লিখলেন না। কিন্তু কোথায় কোন জায়গায় একবার দুচার-জন কাপুরুষ ছেলে মুক্তিফৌজের সাহেবকে মেরেছিল তাই উপলক্ষ্য করে লম্বা কবিতা বের হল। এ জিনিসটা তখনও একচোখোপনা মনে হত, এখনও হয়!

ফিরিঙ্গীরা কিংবা গোরা সেপাইরা সেকালে লোকের সঙ্গে যে কি ব্যবহার করত, তা হয়ত একটু বয়স্থ লোক সকলেরই জানা আছে। আমাদের শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল সত্য, কিন্তু এতে যে রাজার গৌরব হানি হয়! তবু, কর্জ্জন সাহেবের আগে কোন লাট গোরাদের জুলুমের প্রতিবিধান করতে সাহস করেন নেই। আজ এ অত্যাচার খুব কমে গেছে। হয়ত লোকেও আর বরদাস্ত করবে না, সরকারও করবেন না। কিন্তু আমি যখন চল্লিশ বছর আগের কথা লিখতে বসেছি, তখন আমার এ সব অপ্রিয় কথা না লিখেও উপায় নেই। অপ্রিয়, কেন না নিজেদেরই বদনাম। অপমান হজম করাতে ত কোন গৌরবই নেই! আমি বড় বড় ব্যাপারের, অর্থাৎ খুন খারাবীর, কথা প্রত্যক্ষ কিছু জানি না। সে সম্বন্ধে কিছু বলছিও না। তবে আমাদের যে কারণে দলবদ্ধ হয়ে ময়দানে চলতে ফিরতে হত, সেটা

একালের ছেলেদের জানা ভাল। ছেলেবেলায় ইংরেজদের সম্বন্ধে শুনেছিলাম যে তারা ন্যায় যুদ্ধ ছাড়া অন্যায় যুদ্ধ জানে না। হয়ত ভদ্রবংশীয় ইংরেজ সম্বন্ধে এটা সত্যি, কিন্তু আমাদের আমলে গোরা সেপাই কি মেটে সাহেব যে ন্যায় যুদ্ধের উপাসক ছিল না, তার প্রমাণ খুব সুলভ।

একদিন আমরা জনাতিনেক ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল স্কোয়ারের ভেতর হাল্লা। দূর থেকে দেখি, তিন-চারজন ইংরেজী কাপড়-পরা লোক একটি বাঙ্গালীর ছেলেকে মারছে, লোক জমে গেছে প্রায় বিশ-পঁচিশ জন। আমরা নির্ব্বিরোধী লোক। শুধু দেখবার জন্য বেড়া ডিঙ্গিয়ে সেই দিকে দৌড়লাম। ততক্ষণে পেণ্টুলুন-পরা লোকগুলো গলিতে ঢুকে দৌড়ে পালাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি একটি বছর চৌদ্দর ছেলে জখম হয়ে ভূঁইয়ে পড়ে। আর পাশে একটা হোঁৎকা গোছের লোক দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, বর্ণনা করছে কি হয়েছিল। তার মাথায় খুব ঢেউ খেলান তেড়ী, গায়ে জালের গেঞ্জী, পরণে মালকোঁচা মারা ধুতি। বক্তৃতা শেষ করে সে খুব জোরে নিজের বুক চাপড়ে দুতিনবার বললে, "ধিক্! বাঙ্গালীর জীবনে ধিক্!" আগেই বলেছি আমরা ছিলাম নিরীহ লোক। মাথা হেঁট করে চলে গেলাম। সে লোকটাকেও পিটিয়ে দিতে পারলাম না। শত ধিক্!

আর একদিন গড়ের মাঠে খেলা ভাঙ্গবার পর আমরা কয়েকজন ফিরছি, এমন সময় দেখি যে এক বাঙ্গালী ছাত্রকে দুটো ফিরিঙ্গী দাঁড়িয়ে খুব ঘুষো লাথি মারছে। পাশে

আরও দুতিনজন ফিরিঙ্গী দাঁড়িয়ে স্বজাতিকে সাবাস দিচ্ছে। আমাদের দল নেহাৎ ছোট ছিল না। দুএকজনের হাতে বংশদণ্ডও ছিল। তৎক্ষণাৎ আমরা চারিদিকে দাঁড়িয়ে গেলাম আর ফিরিঙ্গীদের বললাম,"এ চলবে না হে! একজন একজন লড়াই কর।" তাই করতে হল। বাঙ্গালীটী বাহাদুর ছেলে ছিল। খুব ঠুকলে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে। শেষ তার বুকে বসে মাপ চাইয়ে ছাড়লে। এ পর্য্যন্ত নালিশ করবার মত কিছু ঘটে নেই। কিন্তু ফেরবার পথে মনুমেণ্টের কাছে আবার ছেলেটীকে কজন ফিরিঙ্গী ঘিরে দাঁড়াল। বোধ হল, সেই প্রথম দলই। ভাগ্যিস আমরা পিছনেই ছিলাম। আমরা হুঙ্কার ছাড়তেই তারা বেগতিক দেখে রণে ভঙ্গ দিলে।

আমার নিজের কখনও রণে ভঙ্গ দিতে হয় নেই! ধাক্কা ধুক্কি যা খেয়েছি এক-আধবার, সে অতি সামান্য ব্যাপার। তা সে ঋণও গায় রাখি নেই! তবে এক বার passive resistance করতে হয়েছিল। ঘটনাটা গল্প হিসাবে মন্দ নয়। আগেই বলেছি, মাঠে আমরা বড় একটা একা একা ঘুরতাম না। একদিন ডালহৌসির মাঠে খুব বড় খেলা ছিল। কথা ছিল আমরা সকলে ক্লাব থেকে যাব। কিন্তু আমি যখন পৌঁছলাম, তখন একটু দেরী হয়েছে। সকলে চলে গেছে। ইতস্ততঃ করছি এমন সময় রাস্তার ওপারের মাদ্রাসা ক্লাবের ছেলেরা বললে, "চল বাবু, ম্যাচ দেখতে যাবে না?" গেলাম তাদের সঙ্গে। তখনকার দিনে পয়সা দিয়ে ম্যাচ দেখবার রেওয়াজ বড় একটা ছিল না। মাঠের তিনদিক খোলা

থাকত। একটা জায়গা বেছে আমরা চারজন সামনে দাঁড়ালাম। খানিক পরে পেছনে বিজাতীয় আওয়াজে চীৎকার শোনা গেল, "Make room, হট্ যাও।" হঠাৎ আমার মাথার উপরে এক বেতের ঘা পড়ল। বেতটা হেঁচকা মেরে টেনে নিয়ে দূরে ফেলে দিলাম। ফিরে দেখি, Buff পলটনের জনা পঁচিশেক বীর যোদ্ধা বেগে লোক সরিয়ে দিচ্ছে। অবহেলে সরিয়ে দিলে! যতক্ষণে তারা দুই সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ততক্ষণ আমার মাদ্রাসার সঙ্গীরা অন্তর্দ্ধান হয়েছেন। আমি একা পড়লাম সেই সেপাইদলের লাইনের সামনে। অবস্থা সঙ্গীন। এক মুহূর্ত্ত ভাবলাম মার খাব, না সরে পড়ব! তার পর মনে হল, সরে ত পড়ছিই আজ কত শো বছর, না হয় আজ মারই খাই। কে জানে, হয়ত কুঁড়েমি ধরল, কে আবার সরে! ক্রমশঃ বুঝতে পারলাম যে আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলে ঠেলে মাঠের গণ্ডীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তখন আমিও, "একা কুম্ভ," পেছনে ঠেলতে আরম্ভ করলাম। গ্রাম্য ইংরেজীতে নানা রকম শ্লীল অশ্লীল ঠাট্টা তামাশা কানে আসতে লাগল। দুএকটা গাঁট্টাও মাথায় খেলাম। আমার পেছন দিকে ঠেলা কিন্তু বন্ধ হল না। ইতিমধ্যে একজন linesman "পিছে, পিছে, হট্ যাও" বলতে বলতে নিশান হাতে এসে পড়ল। সেও Buff সেপাই। হয়ত সাঙ্গাতদের সঙ্গে তার চোখে চোখে কিছু ইশারাও হয়ে থাকবে। যাই হোক, লোকটা যেই আমাকে "পিছে, বাবু," বলে ঠেলা মারলে, অমনি পশ্চাতের দুজন সেপাই ফাঁক হয়ে গেল। ফলে আমার দেহের উপরটা

পেছনে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু আমি আগে থেকেই গোড়ালি কাদায় গেড়ে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিলাম, তাই পড়ে গেলাম না। তখন সেই অবস্থায় আমাকে সেপাই তুটো টিপে ধরলে। আমি তুই কনুই দিয়ে তাদের পাঁজরার উপর passive resistance বার তুই চালাতেই তারা কোঁক করে আবার ফাঁক হয়ে পড়ল। সুবিধা পেয়ে আমি পিছিয়ে তাদের লাইনে দাঁড়িয়ে গেলুম। ততক্ষণে খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার খেলা দেখবার মতন অবস্থা ছিল না। পিছন থেকে লাথি, গাঁট্টা, ধাক্কা ক্রমাগত খাচ্ছিলাম। বিপদে পড়ে আমিও যে চাঁট তু-চারটে মারি নেই, তা বলতে পারি না। কিন্তু আমি জবাব দিচ্ছিলাম মোটামুটি তুধারের পাঁজরার উপরে। একটা কথা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে কোন পক্ষেই ক্রোধের উদ্রেক হয় নেই। তারা যা করছিল অভ্যাস দোষে, আমি যা করছিলাম ভয়ে। প্রায় পনেরো মিনিট এই রকম ধস্তাধস্তি চলল! আর বেশীক্ষণ চলে না। আমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা করছে। এমন সময় পিছন থেকে কে বললে, "Let him be, Jim" (ছেড়ে দে, জিম)। এতক্ষণ আমার মুখ দিয়ে ভাল মন্দ একটি কথাও বার হয় নেই। এখন ফিরে বললাম, "Thank you"। আমার ডান পাশের সেপাইটী আমার সামনে সিগারেট কেস খুলে ধরে বললে, "You are a plucky lad"। আমি তাকে জানালাম যে আমার প্রায় হয়ে এসেছে। সে আমায় ভূঁইয়ে বসবার জায়গা করে দিয়ে বললে, "আমার পাঁজরাগুলো তোমায় সহজে ভুলবে না।" আরাম করে ম্যাচ দেখে টলতে টলতে বাড়ী ফিরলাম।

কোন রকম জাতিবিদ্বেষ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। জাতিবিদ্বেষ সকল অবস্থাতেই ঘৃণ্য জিনিস। তা ছাড়া সেকালের যা সমস্যা ছিল, আজকের সমস্যা তা নয়। সুতরাং আমার গল্প থেকে আজকের দিনে প্রযোজ্য কোন নীতি কেউ টেনে বের করলে আমার উপর অবিচার হবে। যে কালের কথা আমি বলছি তখন ব্যায়াম চর্চ্চার দরকার ছেলেদের মনে খুব জেগে উঠেছে। ইতিপূর্ব্বেই শোভাবাজার ক্লাব ফুটবলে, আর টাউন ক্লাব ক্রিকেটে অনেকটা এগিয়ে গেছল। আমাদের সময়ে প্রথমে মোহনবাগান, পরে ন্যাশনাল ফুটবল খেলতে নামল। বুট পরে খেলা চলে গেল প্রধানতঃ ন্যাশনালের উদাহরণে। নন্দলাল শুধু-পায়ে shinguard-পরা দুচারটে পা ভাঙ্গার পর ভয়ও ভাঙ্গতে লাগল। ক্রমে বাঙ্গালীর একটা নিজস্ব খেলার ধারা তৈরী হয়ে উঠল। শোভাবাজারের right wing, বড়বাবু, অবশ্য চিরকালই শুধু-পায়ে খেলতেন। ক্রিকেটে বাঙ্গালী কখনও বিশেষ কিছু করতে পারলে না। তবু ঢাকার সুধন্বা, বাখড়ার খেলা যা ছিল, টাউন ক্লাবের কুলদারঞ্জন, শিবপুরের প্রমদারঞ্জন ও বিশপস্ কলেজের শ্রীশ দে তার চেয়ে অনেক উন্নতি করে গেলেন। যতীনবাবুর (বাখড়ার) বিখ্যাত সেকেলে underhand (তিনি বলতেন, ছেঁচড়া) bowling প্রমদারঞ্জনের scientific bowling-এর সঙ্গে তুলনাই হতে পারে না। ক্রিকেট খেলায় একটা নীরব সাধনার দরকার। হয়ত সেটা বাঙ্গালী প্রকৃতির সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। ফুটবলে কিন্তু যে গুণাবলীর প্রয়োজন সেগুলো, বোধ হয়, বাঙ্গলীর অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। উপরন্তু

ফুটবল-প্রীতির আর একটা কারণও দেখা যেত। আমাদের অত্যন্ত লোভনীয় জিনিস ছিল কেল্লার গোরাদের সঙ্গে দৈহিক সংঘর্ষ, বলপরীক্ষা। এই কেল্লার গোরা আমাদের চোখে ছিল মূর্ত্তিমান পশুবল। এদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি না হলে নিজেদের পশুবলের উৎকর্ষ সাধন কি করে হবে! এমনও দেখেছি যে ম্যাচের পর খেলোয়াড়রা বসে বসে হিসেব করছে কে কটা গোড়াকে আছাড় দিয়েছে। যেন সেটা গোল দেওয়ার চেয়েও দরকারী জিনিস! শোভাবাজারের ব্যাক কালী মুখুয্যে দর্শকের এত প্রিয়পাত্র ছিলেন প্রধানতঃ মানুষ ঘায়েল করতে পারতেন বলে। বাঙ্গালীর ঘুষো খেলা তখন সবে স্নুরু হয়েছে। তবু ওটা যে কলকাতার নিত্য জীবনে বড় প্রয়োজনীয় জিনিস, তা সকলেই বুঝত। শেখার সুযোগের অভাব ছিল। যারা খুব উৎসাহী তারা অনেক পয়সা গুজে কেল্লায় শিখে আসত। পাঠককে একটা বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া দরকার যে বর্ত্তমান লেখক সব খেলা খেললেও নিতান্তই হাতুড়ে, চিরদিন।

আমি যে বছর কলেজে ঢুকলাম, তখন পর্য্যন্ত কলেজ ক্লাব ছিল না। ক্রমশঃ সেটা গড়ে উঠল। কিন্তু আমাদের পৃষ্ঠপোষকের এত অভাব ছিল, যে আমরা অনেক চেষ্টা করেও ক্লাবটাকে জমকাল করতে পারি নেই। খেলা সম্বন্ধে প্রেরণা সংগ্রহ করে আনতে হত অন্য বড় বড় ক্লাব থেকে। যাই হোক, ক্রমশঃ আমাদের নিজস্ব খেলার দল খাড়া হল, দুচারটে ম্যাচও খেলা হতে লাগল। ফুটবলের রঙ্গীন জামা তৈরী হল। এখন দেখতে পাই আমাদের অত সাধের

গোলাপী ও নীল রঙের বদলে কলেজ টীম এখন একটা নিতান্ত prosaic নীল রঙের জামা পরেন। রঙীন জামা পরে প্রথম ম্যাচটা আমার বেশ মনে আছে। আমি ব্যাকে খেলছিলুম। হঠাৎ এক ষাঁড় দূর থেকে জামার ঝকঝকে গোলাপী রঙ দেখে আমাকে শিঙে চড়াবার মৎলব করে চড়াও হয়ে এল। আমার নজর ছিল বলের দিকে। গোলকীপার তাড়াতাড়ি গোলের ডাণ্ডাটা খুলে নিয়ে ষাঁড়কে মেরে আমায় রক্ষা করলেন। কাজটা নিতান্ত সহজ ছিল না। কথায় বলে, red rag to a bull!

আমাদের বড় সাহেব পয়সার বেশ সুবিধা করে দিয়েছিলেন। প্রথম কড়া নিয়ম জারী হল যে বিকেলে সবাইকে কসরতের আখড়ায় হাজিরা দিতেই হবে। তার পর হুকুম হল যারা ক্লাবে খেলবে, তাদের কসরৎ না করলেও চলবে। শতকরা আশী জনের অঙ্গ সঞ্চালন করার কোন ইচ্ছাই ছিল না, কি ক্লাবে, কি আখড়ায়! কিন্তু তাদের ক্লাবে ঢোকার পথ আমরা বেশ সুগম করে দিলাম। ফটকের কাছে খাতা হাতে ধরণা দেওয়া নিত্যকর্ম্ম হয়ে দাঁড়াল। এই রকম করে আমাদের যত টাকা সংগ্রহ হত, বড় সাহেব সরকার থেকে আবার তত টাকা মঞ্জুর করতেন। এত সুবিধা না করে দিলে ক্লাবটী আঁতুড়েই মারা যেত। গ্রিফিথস সাহেব আমাদের সুখ দুঃখ বুঝতেন বলেই তাঁকে আমরা ভক্তি শ্রদ্ধা করতাম। ছেলেপিলে ত একটু স্বার্থপর হয়েই থাকে।

এই ফুটবলের নেশা কিন্তু সবাই ভাল চোখে দেখতেন

না। একদল কর্ত্তা-ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা বলতেন হাডুডু, কপাটি গুলি-ডাণ্ডাই বাঙ্গালীর পক্ষে প্রশস্ত, বিদেশী খেলায় তার কিসের দরকার! আর একদল আবার এঁদের চেয়েও গোঁড়া। তাঁদের মতে আড্ডা মাত্রই ছাত্রদের পক্ষে খারাপ, তা সে তাসের আড্ডাই হোক, আর ব্যায়ামের আড্ডাই হোক। ওসব স্থানে গেলে ছেলেরা সিগারেট খেতে এবং শা—বলে গালাগাল দিতে শেখে! এই মর্ম্মে একবার একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এসব কুসংস্কার যাঁরা ভেঙ্গে দিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান আমার বন্ধুরা। ভূ—মালকোঁচা মেরে ফুটবলেও যেতেন, পরীক্ষাতেও ফার্ষ্ট হতেন। পরের জীবনে চাকরে মানুষের কাম্যলোকে উঠেও তার মোহনবাগান প্রীতি মন্দা হয় নেই। সুহৃদ ন--রও ঐ দশা। তাঁকে আদালত ছাড়া কোন ব্যাপারে পাওয়া কত কঠিন, তা সবাই জানেন। অথচ ক্রিকেট, ফুটবল, কি সাঁতারের স্থানে দরকার হলে এটর্ণি ফিরিয়ে দিয়েও তিনি সেখানে হাজির হন। আবার আমার মত মানুষও ছিল, যারা খেলার হুজুগে পরীক্ষা ভাসিয়ে দিলে, আর বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত খেলা খেলা করেই কাটিয়ে দিলে। মোটের উপর আমাদের মধ্যে দেহচর্চ্চার (দেহতত্ত্বের নয়) হাওয়াটা জোর বয়েছিল। তবে আমাদের হাত পা ছোঁড়াই সার হল, সাফল্য পেলে পরবর্ত্তী ছেলেরা।

কলেজে একটা Debating society ছিল যেখানে নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হত। আমাদের দলের কেউ সেখানে বিশেষ নাম করেছিলেন ব'লে মনে নেই। এটা আশ্চর্য্য, কেন

না আমাদের অনেকেই পরের জীবনে হাইকোর্টে বক্তৃতা করে যেমন জজকে তেমনি মক্কেলকে অক্লেশে ঘায়েল করেছেন। তবে স্বীকার করতে হয় যে এক প্র—ছাড়া রাজনৈতিক সভায় কেউ সুবিধা করতে পারেন নেই। আমাদের ঠিক আগের দলের সুরেন মল্লিক, নীরদ চাটুয্যে প্রভৃতি বেশ ভাল বক্তা ছিলেন। এই তর্ক-সভার কর্ত্তা ছিলেন উইলসন সাহেব। ভদ্রলোক প্রথম প্রথম আমাদের সঙ্গে খুব মিশতেন। আমাদেরও তাঁকে বেশ ভাল লাগত। কিন্তু কি হল কে জানে, আস্তে আস্তে ছেলেরা তাঁর উপর নারাজ হয়ে গেল। শেষ একদিন হল কি, তিনি হোষ্টেলে যে ঘরে ঢুকতে লাগলেন, ছেলেরা জাত যাবে বলে তাদের জলের কুঁজো ফেলে দিতে লাগল। এই নিয়ে একটু গোলযোগও হয়েছিল। একদিন আমাদের সভায় হিন্দুর বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল। আমি, হিন্দুর বিলেত গেলে জাত যায়, এই মর্ম্মে আমার সাধ্যমত একটা ছোট-খাটো বক্তৃতা করলাম। উইলসন সাহেব সভাপতি ছিলেন। সভার পরে তিনি বাইরে এসে মহা গরম হয়ে আমাকে বললেন, "তোমরা সবাই hypocrite, মনে এক, মুখে এক। তুমি নিজে বছরখানেক বাদে বিলেতে যাবে, অথচ আজ সভায় বললে, বিলেত যাওয়া উচিত নয়। সেদিন হোষ্টেলের ছেলেরা হঠাৎ এমনি হিন্দু হয়ে উঠল যে আমি ঘরে ঢুকতেই তাদের জল নষ্ট হয়ে গেল!" আমি নিবেদন করলাম, "স্যার, হোষ্টেলের কথা আমি জানি না, আমি সেখানে থাকি না। কিন্তু তর্ক-সভায় তর্কের খাতিরে মানুষ যা বলে, সেটা তার যথার্থ মত বলে ত কেউ ধরে না!"

তাতেও সাহেব ঠাণ্ডা হলেন না। সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন আমাদের অঙ্কের অধ্যাপক লিটল সাহেব। তাঁর বদ-মেজাজী বলে খ্যাতি ছিল, কিন্তু ভদ্রলোকের অন্তর বড় ভাল ছিল। তিনি উইলসনকে একটু চেঁচিয়েই বললেন, "এ তুমি কি রকম কথা কইছ? আমাদের কেম্‌ব্রিজ, অক্‌সফোর্ডে কি হয়? ইউনিয়ানের সভায় যার যেদিক ইচ্ছা তর্কের সময় ত সেইদিক নেয়।" তখন আমিও সুবিধা পেয়ে উইলসন সাহেবকে বললাম, "মশায়, আর এক কথা, আপনি জাত তুলে গালা-গাল দেন কেন? যা বলবেন আমাকে বলুন, তোমরা তোমরা করেন কিসের জন্য?" লিটল্ সাহেব হেসে বললেন, "খুব ঠিক কথা। সেদিন আমি এই ছোকরাকে দুষ্টুমি করার জন্য ধরেছিলাম। ওর বাঁদরামীর জন্য সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে বাঁদর বললে অবশ্য দোষ হবে।" আমাদের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ বা গবেষণার কোন বিশেষ সুবিধা ছিল না। আমরা এম এ ক্লাসে এক বৈজ্ঞানিক সমিতি স্থাপন করেছিলাম। সেখানে অনেক গণ্যমান্য অধ্যাপক বিজ্ঞান-বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা বিদ্বান, তাঁরাও নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়তেন।

আমি আগেই বলেছি যে ছেলেবেলায় আমি ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলাম। সেইজন্য বি এ পাস হওয়া পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গলা থিয়েটার দেখার অনুমতি পাই নেই। বাই নাচ দেখা ত ইহজীবনে হল না! কিন্তু দুবার বিলেত থেকে ইংরেজী কোম্পানী এসেছিল শেক্সপীয়ারের নাটক প্রয়োগ করে দেখাতে। একবার Milne, আর

একবার Potter-Bellew। সে অভিনয় আমরা অনেক-বারই দেখেছিলাম। বাড়ী ও কলেজ দু জায়গা থেকেই, শুধু অনুমতি নয়, আদেশ পেয়েছিলাম। এই সব কোম্পানীর অভিনেত্রীরা সাধুচরিত্র, এদের দেখলে দোষ নেই, এই বোধ-হয় অভিভাবকদের সংস্কার ছিল। এ সংস্কারটা যে নেহাৎ কুসংস্কার, তা অনেক পরে জানলাম। কিন্তু যেদিন আমরা হ্যামলেট দেখতে প্রথম যাচ্ছি, আমার মা জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যারে, তবে যে তোদের থিয়েটার দেখা বারণ!" আমি তখন উত্তর দিলাম, "সে বাঙ্গলা থিয়েটার, মা।" মা বললেন, "কে জানে, বাবু! বাঙ্গলা ইংরেজীতে কি এসে যায়?" মেয়েদের বুদ্ধি পুরুষদের চেয়ে অনেক logical, ন্যায়সঙ্গত, হয়ে থাকে। তখন, খুব বেশী দিন আগের কথা নয় এই ইংরেজী অভিনেত্রীদিকে বিলেতেই এত নীচ জাতি মনে করত, যে মরে গেলে গির্জ্জায় সাধারণ কবরস্থানে এদিকে মাটি দেবার হুকুম ছিল না। মোট কথা, আমাদের সময়ে কলকাতা সমাজে একটা শুচিবাই বেশ প্রবল ছিল।

রাজনৈতিক আবহাওয়ার কথা একটু বলি। কলকাতার সঙ্গে আমার পরিচয় ১৮৯০ সালে। লর্ড রিপনের রাজত্বের ও ইলবার্ট বিলের জের তখনও চলছে। ছোট জাতের সাহেবদের যে নেটীব বিদ্বেষের কথা বলেছি, সেটা এরই ফল। কারণ, সিপাহী-বিদ্রোহ তখন বহু পুরাতন ব্যাপার! বছর পাঁচ-ছয় আগে বড়লাটের শুভ আশীর্ব্বাদ নিয়ে কংগ্রেস মহাসভার বোধন হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর মত দুয়েকজন নামকাটা সেপাইএর দৌলতে উক্ত মহা-

সভা সরকারের চক্ষুঃশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিনা কারণে, কেন না কংগ্রেসের কর্ত্তারা নিরীহ জীব ছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল! ১৮৯০ সালে Consent Bill-এর দরুন যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল, সেটা কতকটা অন্য ধরণের। তার মূলে একটা দুর্দ্দম জাতিবিদ্বেষ ছিল। সরকারও সেটা বুঝতেন। তাই বঙ্গবাসীর দলকে ধরে রাজদ্রোহের জন্য সাজা দিলেন। আমার দুজন সহপাঠী কলকাতা কংগ্রেসে সেবক হয়েছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মে ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁরা কলেজে বেশ প্রকাশ্যভাবে বঙ্গবাসীওয়ালাদের নিগ্রহে আনন্দ প্রকাশ করতেন। কলকাতার বাঙ্গালী সমাজ তখন, বঙ্গবাসীর দল আর সঞ্জীবনীর দল, এই দুই দলে বিভক্ত ছিল। আর এঁদের পরস্পরের বিদ্বেষের দরুন কলকাতায় প্রায় সকল কাজই পণ্ড হত। এই ঝগড়ার বিষ কলেজে, মেসে, অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল। বেনেটোলার এক মেসে দোলের দিন মাথা ফাটাফাটি পর্য্যন্ত হয়ে গেল। ফ্রান্সে ষোড়শ শতাব্দীতে সনাতনী আর হিউগেনোদের অনেক কাটাকাটী হয়ে যাওয়ার পরে যেমন এক পলিতিক দল উঠে আস্তে আস্তে দুরকমেরই গোঁড়াদের হটিয়ে দিলে, আমাদের কলকাতাতেও তেমনি এক পলিতিক দল হিতবাদী কাগজ বের করলেন। তাঁরা অবতীর্ণ হলেন দুই গোঁড়া দলকেই "হিতং মনোহারিচ দুলর্ভং বচঃ" শোনাবার জন্যে। ক্রমে এই পলিতিক দলই বাঙ্গলার আকাশ ছেয়ে ফেললে। তাঁদের সামনে গোঁড়া ব্রাহ্ম ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ দুই রণে ভঙ্গ দিলেন। অবশ্য তাঁরা তখন আর হিতবাদীর দল

রইলেন না, কারণ হিতবাদীও প্রথম দুই একজন সম্পাদকের পরেই সনাতনীর ধ্বজা উড়ালেন। যাকে বিপ্লবপন্থী বলা যায়, এরকম কেউ আমাদের সময় ছিল না। যারা ইংরেজকে শত্রু ভাবত, তারাও বিক্টোরিয়াকে মহারাণী বলে মানত। এটা খুব স্পষ্ট বোঝা গেছল কয়েক বৎসর পরে। মহারাণীর মৃত্যু হলে গড়ের মাঠে যে অপরূপ দৃশ্য সে সময় এক দিন দেখা গেছল, তার একমাত্র মানে এই হতে পারে যে জনসাধারণ রাণী বিক্টোরিয়াকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। সেই দৃশ্য দেখেই ত লাট কার্জ্জন বলেছিলেন, "If it is real, what does it mean?" ১৮৯৫ সালে ইংলিসম্যান কাগজে এক উড়ো চিঠি, A Rampant Epistle, নামে ছাপা হয়। সে চিঠির লেখককে ধরলে দণ্ডবিধি আইনের ১৫৩ এ ধারা অনুসারে সাজা দেওয়া চলত। কিন্তু একটা ভাববার কথা হচ্ছে এই যে তাতে সম্পাদকের জাত ভাইদিকে বলা হয়েছিল, "তোমরা সরে পড়। আমরা মহারাণীর নামে এ দেশ শাসন করব।" অর্থাৎ এ শ্রেণীর পাগলাদের মনেও তখন ইংলণ্ডেশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করবার ভাব আসে নেই। চিঠিখানা নিতান্ত নগণ্য, তবে ইংলিংশম্যান তার খুব সদ্ব্যবহার বছরখানেক ধরে করেছিলেন। আর দেশী কাগজওয়ালারা সেটাকে ইংলিশম্যান আফিসের জাল বলে ধরে নিয়েছিলেন। কেন না ওরকম সংযত পাগলামীও তাঁদের কল্পনার বাহিরের জিনিস ছিল। চিঠিটা জাল নয়, কারণ তার খসড়া আমি দেখেছি। পাঠকের মনে একটা ধারণা করে দিতে চেষ্টা করলাম যে আমাদের ছাত্র-জীবনে

রাজনৈতিক হাওয়া মৃদুমন্দ গতিতেই বইত। বিক্টোরীয় যুগের ভব্যতার গণ্ডী ছাড়িয়ে যায় নেই। কে জানে, হয়ত সে হাওয়াকে সময় থাকতে গম ভাঙ্গার কি জল তোলবার কাজে জুড়ে দিলে, আজ ইউরোপের ঝঞ্ঝাবায়ু এসে এদেশকে বিধ্বস্ত করত না।

রাজনীতি চর্চ্চা আমার অধিকারের বহির্ভূত। মাঝে মাঝে লোভে পড়ে গণ্ডী পার হয়ে যাই, পরে পস্তাতে হয়। এই বেলা আর একটা গল্প জুড়ে দেওয়াই ভাল। আমরা কলেজে থাকতে বোডিসিয়া বলে এক রণতরী গঙ্গার ঘাটে এসে লাগল। পেছনে পেছনে এল একটি ছবির মতন সুন্দর টরপিডো বোট, নাম মারাথন। এই দুই জাহাজের মাল্লারা শহরের সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল। ধবধবে সাদা কাপড়, হাসিমুখ, হেলেদুলে চলন, দেখে আমি ত মুগ্ধ হয়ে যেতাম! মনে হত এই সব লোক নিয়েই, বোধ হয় বোডিসিয়া এক-দিন রোমানদের হায়রান করে তুলেছিলেন, এরাই হয়ত মারাথনে ইরানের দুর্দ্ধর্ষ বাদশাহকে হটিয়ে দিয়েছিল। একদিন এদের মাত্র দুজন আমাদের চুনাগলির পাড়ায় প্রায় পঞ্চাশ জন মেটে সাহেবকে মেরে ভূত ভাগিয়ে দিলে। আমাদের বাড়ীর পাশে এক চেলা কাঠের দোকান ছিল। সেইখান থেকে ক্ষেপনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করে শত্রুদের উপর বর্ষণ করতে লাগল। সে কি সুন্দর দৃশ্য! যুদ্ধজয়ের পর কাঠের দোকানে গিয়ে, আবার একটা দশ টাকার নোট খেসারত দিয়ে গেল। আমি স্থির করলাম এরা সাহেবের সেরা, এদের সঙ্গে আলাপ করতেই হবে। পর দিন দুজন

মারাথনের মাল্লাকে ধরলাম ইডেন গার্ডেনে। বসে বসে তারা আমাদের সঙ্গে কত গল্প করলে। তাদের মাল্লার জীবন কি সুন্দর, আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলে। আমরা ধরলাম, "চল, তোমাদের জাহাজ দেখাও। আমরা টরপিডো বোট কখনও দেখি নেই।" একজন বললে, "আজ নয়, কাল এসো। জাহাজে উঠে আমাদের ডাক দিও। আমার নাম বার্বার, ওর নাম উড। মনে থাকবে ত! Barber is one who shaves, and Wood is something you can't shave with."

পর দিন গেলাম। বড় জাহাজটা ত বেশ দেখা হল। কিন্তু মারাথনের সামনে যে গোরাটা পাহারা দিচ্ছিল, সে ঢুকতে দিলে না। অনেক কাকুতি মিনতি করলাম, কত ক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, লোকটা খোট ছাড়লে না, "No orders." ইতিমধ্যে খুব জরিঝব্বা পরা এক বড় সাহেব বোডিসিয়া থেকে বেরিয়ে এলেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি স্বয়ং নৌ-বহরের অধিনায়ক। তাঁর কাছে নালিশ করলাম। তিনি গোরাটার সঙ্গে কথা কয়ে এসে খুব ভদ্রভাবে বললেন, "তোমরা নেটীব কাপড় পরে এসেছ, তাই ঢুকতে দিচ্ছে না। ও কেল্লার গোরা, ওর ওপর আমার কোন অধিকার নেই। I am sorry, boys!" তবু দাঁড়িয়ে রইলাম জাহাজের দিকে হাঁ করে চেয়ে। সাহেবদের মজলিসে আমাদের কত হোমরা-চোমরা কর্ত্তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি তীর্থের কাকের মতন, আমাদের কিসের লজ্জা! আমরা পরে এসেছিলাম গরম ইজার, আর সার্জের গলাবন্ধ কোট,

অর্থাৎ আমাদের অফিসকা কাপড়া। তাকে বললে কি না নেটীব ড্রেস! হঠাৎ দেখি ছুই বন্ধু বেরিয়ে আসছেন মারাথন থেকে। তাঁদের আমাদেরই মতন পোষাক, শুধু মাথার উপর, আমরা যাকে monkey cap বলতাম, সেই জিনিস। তাড়াতাড়ি তাঁদের শিরস্ত্রাণ চেয়ে নিয়ে আমরা মাথায় দিলাম। গোরাটা হেসে বললে, "এই ত এইবার বেশ সাহেবী কাপড় হয়েছে, চলে যাও ভেতরে।" ভেতরে গিয়ে আমাদের সেই ছুই বন্ধুর সন্ধান করলাম। তারা এক গাল হেসে উঠে এল, ঘুরে ঘুরে সব আমাদের দেখালে। চা খাওয়ালে, সিগারেট দিলে পর্য্যন্ত। আসবার সময় আমার ভাই ছুটো টাকা তাদের দিতে গেল, কিন্তু তারা কিছুতেই নিলে না। বললে, We don't rob boys! পরের জীবনেও মানোয়ারী গোরাদের সঙ্গে যখনই আলাপ হয়েছে বড় আনন্দ পেয়েছি। একেবারে ছোট ছেলের মত প্রকৃতি। গল্পটা থেকে পোষাকের মাহাত্ম্য পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হল ত? আমার ত হয়েছিল। ঘটনাটা আমার স্মরণীয় কেন না জীবনে সেই প্রথম ইউরোপীয়ান ড্রেস পরা। একবার কাশী বেড়াতে গেছলাম। সেখানেও এই পোষাক-বিভ্রাট ঘটেছিল! ব্যাস-কাশীতে রামনগরে কাশী-নরেশের কেল্লা। সে কেল্লার অনেক স্তুতিবাদ শুনে দেখতে গেলাম। কিন্তু ফটকে সান্ত্রীরা আটকে দিলে। বললে, "নাঙ্গা শির অন্দর যানে কা হুকুম নেহি।" তাড়াতাড়ি মলমলের টুপী কিনে আনিয়ে মাথায় দিয়ে কেল্লা দেখা হল। বাঙ্গালীর মাথাকে এত ভয় কেন সকলের!

১৮৯৫ সালে রাজদরবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হল। মহারাজের হুকুম এল যে আমি বড় হয়েছি, এবার আমাকে যথারীতি তাঁর দরবারী হতে হবে। কুচবেহার গেলাম। আবার পোষাক-বিভ্রাট। আমার সেই বিখ্যাত সার্জের গলাবন্ধ কোর্ত্তা এখানে চলল না। চুড়িদার পায়জামা ও আঙ্গরাখা পরে, মাথায় মুরেঠা বেঁধে দরবারে হাঁটু গেড়ে বসলাম। যখন ডাক পড়ল, তিনবার কুর্ণিশ করে রাজ-সিংহাসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আতর-মাখা রুমালের উপর এক আশরফি রেখে মহারাজের সামনে ধরলাম। তিনি ঈষৎ হেসে আমার নজর স্পর্শ করলেন। আবার কুর্ণিশ করে পিছু হেঁটে নেমে এলাম। রোমান্টিক প্রকৃতি হওয়ার অনেক জ্বালা! নিজের আসনে বসে একটু ক্ষণ চোখ ঢেকে রইলাম। সব যেন বেঠিক হয়ে গেছে। কোথায় রয়েছি, এ কোন শতাব্দী, কে রাজা, কে আমি? চকিতের মত মনে হল যেন আমার জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে। তবে স্বপন আর কতক্ষণ থাকে!

কলকাতার অনেক কথাই আমার বলা হল না। প্রথম যখন আসি, তখন খুব কম লোকের সঙ্গেই পরিচয় ছিল। যে কজনকে চিনতাম তাঁরা আমাদের আত্মীয়, আমাদের জেলার লোক। তাঁদের মধ্যে প্রধান শ্রদ্ধাস্পদ গিরীশবাবু ও ক্ষুদিরামবাবু। দুজনেই অধ্যাপক ছিলেন, আর দুজনেই জানতেন যে ছেলেপিলের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, পুরো-মাত্রায় কি করে আদায় করতে হয়। সকলের হেনস্তার জিনিস ধূতিকে যাঁরা আজ সম্মানের পদবীতে তুলেছেন

গিরীশবাবু তাঁদের মধ্যে প্রধান। সেকালের বিলেত-ফেরত, কিন্তু ফিরে এসে অবধি একদিনও ইজার পরেন নেই। অথচ তাঁর অতি বড় শত্রুও তাঁকে কোনদিন নড়বড়ে ঢিলেঢালা মানুষ বলতে পারে না। ক্ষুদিরামবাবু নামে হিন্দু হলেও প্রকৃত ব্রাহ্ম ছিলেন। সেকালের ব্রাহ্ম, যাঁরা কখনও খোসা-মোদ করতেন না, মিথ্যা কথা, মিথ্যাচার, জানতেন না। এ দুজনের কাছে ছাত্রজীবনে অনেক আশীর্ব্বাদ, অনেক শিক্ষা পেয়েছি।

আমার বিবাহসূত্রে শহরের অনেক বনেদী ঘরের সঙ্গে কুটুম্বিতা হল। একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। সেকালের কলকাতার exquisites, সেকালের কাপ্তান, আজ আর নেই। একদিন তাঁদের কথা বলব। হয়ত এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলব। তাতে পাঠক যদি আমায় ধামাধরা বলেন, তাহলেও রাগ করব না।

আমার ছাত্রজীবনের যথার্থ গুরুর নাম এইবার করব। তাঁর কাছে অঙ্কশাস্ত্র শিখতে পেরেছিলাম বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু আরও অনেক জিনিস শিখেছিলাম, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যের বাইরে। তাঁর নাম বললে অনেকেই চিনবেন। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন বিলেতে পাশ করি তিনি লিখেছিলেন, "এত আমার গুরুদক্ষিণা হল না, বাবাজী! সেটা বাকী রইল, ভুলো না।"

আমার বিদ্যার্জ্জন-নামক প্রহসনের খুঁটি-নাটি চেপে যাওয়াই ভাল। কোন রকমে বি এ পরীক্ষার মোহনা পার

হয়ে গেলাম, কিন্তু Post-Graduate নদী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই নৌকা বানচাল! বন্ধুরা সকলেই বিজয়পতাকা উড়িয়ে, ডঙ্কা বাজিয়ে, জীবন সংগ্রামে যাত্রা করলেন। আমাকে নিয়ে আমার কর্ত্তৃপক্ষ একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেকালে যদি কোন ছোট ছেলের কোথাও লেখাপড়ায় মনোযোগ না হত, তাকে কটন ইস্কুলে পাঠান হত, যদি না সে নিজের বুদ্ধির জোরে সরকারী reformatory-তে ঢুকে পড়তে পারত। তেমনি একটু বয়স্থ ছেলেদের চালিয়ে দেওয়া হত বিলেতে, কেন না সেখানে তখনকার দিনে বিনা শ্রমে বিনা আয়াসে ব্যারিষ্টার হয়ে আসা যেত। আমার সার্বিস পরীক্ষা পার হওয়া সম্বন্ধে সকলেই সন্দিহান হলেন। কিন্তু তাঁদের আশা, পাস হয়ে যায় ভালই, নইলে ব্যারিষ্টার ত হবে! এদিকে আমি প্রাণপণ টানাটানি করছিলাম যাতে বিলেত না যেতে হয়। শেষে একদিন শুনলাম যে বিলেত যদি না যাই, ত ডেপুটী কলেক্টর হতে হবে। হাকীমী আমার অদৃষ্টে বাজছে। ভাবলাম, তাই যদি হয় ত তপ্ত বালির পূজা কেন করি, দীপ্ত সূর্য্যের উপাসনা করা যাক। বাবাকে জানালাম যে আমি বিলেত যেতে রাজী আছি। এর ভেতর আর একটা কথা ছিল, সেটাও প্রকাশ করি। ব্রেজিলের সেনানী সুরেশবাবুর নাম সকলেই শুনেছেন। তাঁকে আমি খানদুই চিঠি লিখেছিলাম আমাকে সেই দেশে একটা গতি করে দিতে। মনে করলাম, বিলেত থেকে ব্রেজিল যাওয়া সোজা হবে। কিন্তু অদৃষ্ট কি এড়ান যায়? আমি ছমাস কাল bar-এ জমা দেওয়ার টাকাটা ধরে

রাখলাম। শেষে শুনলাম সুরেশবাবু মারা গেছেন। সেপাইগিরি অদৃষ্টে নেই, হবে কোথা থেকে ? এত কথা ত আর কলকাতায় থাকতে জানতাম না। কাজেই শ্বেতদ্বীপে পাড়ি জমাবার জোগাড়যন্ত্র করতে লেগে গেলাম।

৭

ছেলেবেলায় ভূত, প্রেত, দানা দক্ষ, যক্ষ রক্ষ, এর কোন কিছুই মানতে শিখি নেই। জুজু নামক একটা জীবের নামও লোকজন আমাদের কাছে করতে পেত না। আষাঢ়ে গল্প নানা রকমের শুনতাম বটে, কিন্তু সে সব গল্প সত্য নয় জেনেই শুনতাম। এই ত গেল শৈশবের কথা। তার পর ইস্কুল কলেজে বছর পনেরো ধরে শিখলাম যে ইংরাজেরা এ দেশে যে নবীন চিন্তার ধারা এনেছেন, তাতে সংস্কার, বিশ্বাস, এ সবের স্থান নেই ; যুক্তিদ্বারা যা সিদ্ধ হয়, একমাত্র তাই মেনে নেওয়া যেতে পারে, বাকী সব বাতিল। এও মাথা পেতে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন বিষম সমস্যায় পড়েছি। সাহেবেরা যে এত দিন ধরে হাইড্রোজেন অক্সিজেন ইত্যাদি নানা শ্রুতি-মধুর নাম দিয়ে গণ্ডা বিশেক বিভিন্ন গোত্রীয় পরমাণুর অবতারণা করে আমাদের চোখে ভেলকী লাগিয়ে দিয়েছিলেন সে ত শুনতে পাই আজ রদ্দী হয়ে গেছে। আবার না কি মান্ধাতার আমলের সেই এক অদ্বিতীয় পরমাণুর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তার পর, ইথার। বিদ্যার্জ্জনের সময়েই ঐ অদৃশ্য অস্পৃশ্য ভারবিহীন পদার্থটা সম্বন্ধে একটু খটকা লেগেছিল।

এক একবার মনে হত যে যেমন তাপের ক্যালরী বাতিল হয়ে গেছল, তেমনই এটাও যাবে। তবু সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বিজ্ঞানের একটা মূল মন্ত্র আঁকড়ে ধরে ছিলাম যে, পদার্থ আর শক্তি দুটো বিভিন্ন জিনিস, এ দুটোর অদল বদল হতে পারে না। এ সম্বন্ধে প্রাচীনদের মত যখন কানে আসত, অমৃতং বালভাষিতং বলে উড়িয়ে দিতাম। সে দিকেও ত আজ সব গুলিয়ে গেল। বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা বলছেন যে রেডিয়ম বলে না কি এক পদার্থ বেরিয়েছে, যা একটুকুও ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে ক্রমাগত শক্তি বিকীর্ণ করছে। তা হলে আর কি ধরে থাকি? এ অবস্থায় একবার সমস্ত লব্ধবিদ্যাটা কষ্টি পাথরে ঘষে যাচিয়ে নেওয়া ভাল। আলোর কিরণ মাধ্যাকর্ষণের জোরে বেঁকে যায়, এ কথা মনে করতেও যে আমাদের মাথা ঘুরে যায়! একদিন সমস্ত মন্ত্র তন্ত্র দেব দেবীকে হাঁচি টিকটিকির সঙ্গে পুঁটুলীতে বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছিলাম। আজ আবার ডুবুরি না ডাকতে হয়!

বহু দিন পূর্ব্বে ঋষি চার্ব্বাক বলেছিলেন, মানুষের জীবন দীপশিখার মত। তেল ফুরিয়ে গেলে নিবে যায়, তখন তাকে আর তেল ঢেলে উসকে তোলা যায় না। মূর্খ! শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান কাকে করছ! কপিল মুনি জোর গলায় বলেছিলেন, ঈশ্বর অসিদ্ধ, মূলাভাবে, প্রমাণাভাবে। হাল আমলের আমাদের গুরুরা হাজার হলেও ইংরেজের ধামাধরা। চার্ব্বাক কপিলের সাহস পাবেন কোথায়? তাঁরা স্বাধীন চিন্তার ঢং একটা করলেন বটে। অর্থাৎ শাস্ত্রের অনেকগুলো তত্ত্বের মধ্যে মনের মত একটাকে বেছে নিলেন। সেইটা ছাড়া

বাকীগুলোর নাম দিলেন, কুসংস্কার। তাঁদের নিজের বিশ্বাসটা হল প্রমাণসিদ্ধ বিশ্বাস, আর অন্যগুলো হল অন্ধবিশ্বাস। যতদিন ছোট ছিলাম, এ সব মেনে নিতাম। কিন্তু বড় হতেই পাঁচজনা মিলে ক্রমাগত জটলা করতে আরম্ভ করলাম, প্রমাণ কই, প্রমাণ কই? মনে আছে, একদিন জনাকয়েক আমরা বসে পেলীর ঈশ্বরতত্ত্ব খুলে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণের পরিচ্ছেদটা পড়ছি, ও সশব্দে আলোচনা করছি। নিঃশব্দে আমার মাষ্টার মহাশয় ক্ষেত্রবাবু কখন এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারি নেই। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে খুব জোরে হেসে উঠলেন, "এর চেয়ে ঝেড়ে নাস্তিক হয়ে যা, বাবা! পাপ কম হবে।" অথচ, একবার যদি বুক ফুলিয়ে বলি যে যা প্রামাণ্য নয় তা আমার গ্রাহ্য নয়, তাহলে সৃষ্টিকর্ত্তাকেই বা প্রমাণের বাহিরে ঠেলে দিই কি করে?

খুব ছোট থাকতে খিদিরপুরের যোগেন্দ্র বাবুর কাছে বাবা নিয়ে গেছলেন। তাঁকে নাস্তিক বলে জানতাম, কিন্তু তবু বড় চমৎকার লাগল। আমার মনে আছে তিনি বাবার সঙ্গে কথা কইতে কইতে হেসে বললেন, "You can't be an ancient and a modern man at the same time—প্রাচীন, আধুনিক, তুই ত আর একসঙ্গে হওয়া যায় না!" পাঠক, আমার উপর বিরক্ত হবেন না। আমি ঠিক করেছি যে আমি ancient, প্রাচীন। আর সেই প্রাচীনদের মন নিয়েই অর্ব্বাচীনদের বলতে ইচ্ছা করি, "কোনো প্রত্যক্ষ জিনিসকেই ছেঁটে ফেলতে পারে না, যে যথার্থ বৈজ্ঞানিক, যে যথার্থ দার্শনিক। যদি তাঁর বড় সাধের বৈজ্ঞানিক

কুসংস্কারে ঘা লাগে, তা হলেও না।" পুরানো বৈজ্ঞানিক theories যে রকম করে হেলায় আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, নূতন গুলোর অদৃষ্টেও তাই আছে, যদি না নূতন facts-এর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে।

পাঠক, আমার অনধিকারচর্চ্চা ক্ষমার চোখে দেখবেন। আমি কতকগুলো ভুতুড়ে ব্যাপারের গল্প আজ করব তারই জন্য এত কৈফিয়ৎ দিতে হল। ঘটনাবলী অতিপ্রাকৃত হলেও অতিরঞ্জিত নয়। গল্প লিখছি প্রধানতঃ আমার যুক্তিবাদী বন্ধুদের জন্য। তাঁরা তাঁদের সাধের theory-গুলো একবার যাচিয়ে নেবেন।

যখন আমার বয়স বছর দশেক, তখন একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে গেছলাম। আমাদের গ্রামের বাড়ীর দক্ষিণে বারান্দায় ওঠবার যে সিঁড়ি আছে, তার মাঝখানটায় এক চওড়া চাতাল। সেই চাতালে মাদুর পেতে আমরা শুতাম। আমাদের সামনে পাঁচিলের ঠিক বাহিরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এক সজনে গাছ ছিল। লোকের বিশ্বাস যে ঐ সজনে গাছে এক ডাইনী থাকে। কথাটা আমাদের কানে এসেছিল তবে হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে নেই, কেন না আমরা ভূত প্রেত বিশ্বাস করতাম না। একদিন আমি আর আমার মেজোভাই ঐ চাতালের উপর ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সরকার দাদা আমাদের ঘুম না ভাঙ্গিয়ে পাশে এক বালিশ নিয়ে নিদ্রা দিচ্ছিলেন। প্রায় রাত দুটো হবে, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সজনে গাছের দিকে নজর পড়তেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম, এক স্ত্রীলোক ডালে বসে আঁচল দুলিয়ে

আমাকে ডাকছে। চুপি চুপি আমার ভাইকে জাগিয়ে দেখালাম। সে বললে, "বসে বসে দেখা যাক, দাদা, ডাইনীটা কি করে।" আমি উত্তর দিলাম, "না রে, না! তার চেয়ে খুব পা টিপে টিপে আয়। কাছে গিয়ে দেখে আসি। খবরদার, সরকার দাদা না জেগে ওঠেন।" হাত ধরাধরি করে দুভাই এগিয়ে চললাম। ভূত ত মানতাম না, কিন্তু বুক অকারণ ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। খানিক দূর যেতে না যেতে স্ত্রীলোকটা মিলিয়ে গেল, আর তার জায়গায় দেখা গেল একটা কলাপাতা দক্ষিণে হাওয়ায় নড়ছে। সুস্থ-মনে চাতালে ফিরে গেলাম। গিয়েই কিন্তু দেখি কলাপাতার উপর চাঁদের আলো পড়ে আবার সেটা ডাইনীর আঁচল হয়ে গেল। দুজনে খুব হেসে উঠতেই সরকারদার নিদ্রাভঙ্গ হল। তাঁকে ডাইনী দেখালাম। তিনি বেরসিক লোক, ঘাড় ধরে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। মার কাছে পর-দিন গল্পটা করতেই তিনি বললেন, "এই জন্যই ত বলি, ও সব ভূত প্রেতের কথায় কান দিস না। ও সব গল্পই ঐ রকম।"

তা কিন্তু নয়। অনেক বছর পরে আর এক রকম ভূতের সংস্পর্শে এসেছিলাম। তখন আমি আহমদাবাদ জেলায় কাজ করি। ছাপ্পান্ন সংবতের ভীষণ দুর্ভিক্ষের পরের বছর। লোকের বড় দুরবস্থা। আমার প্রধান কাজ ছিল কুলী মজুর জাতীয় লোকদিকে খয়রাতী টাকা বিলি করা, আর খাতেদার চাষীদের বলদ বীজ কেনবার জন্য দাদন দেওয়া। অনেক সময় নগদ দাদন না দিয়ে বলদই কিনে দিচ্ছিলাম। এই সব কাজে সাহায্যের জন্য সরকার আমাদিকে কয়েকজন ফেমিন

অফিসার দিয়েছিলেন। আমার ধোলকা তালুকার সহায় যিনি ছিলেন তাঁর নাম, ধরুন, Mr. S.। তিনি বৃদ্ধ ইংরেজ, পুলিসের পেনশন প্রাপ্ত কর্ম্মচারী! দিনের বেলায় কাজ বেশ করতেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর নিজের পানীয় নিয়েই কাটাতেন। আমি দুই একবার সদুপদেশ দিতে গেছলাম। তবে বালকের উপদেশ তিনি ভাল ভাবে নিতেন না, বিরক্ত হতেন। একদিন আমাকে বললেন, "মশায় আমি বুড়ো মানুষ। আমার কি খেলে ভাল হয়, কি খেলে মন্দ হয়, আমি বুঝি।" বৃথা বড়াই, বুঝতে পারলেন না। শেষে দুদিনের অসুখে মারা গেলেন। সহজ অসুখ নয়। বিকারের অবস্থায়, দুনিয়া-সুদ্ধ লোককে গালাগালি দিতে দিতে গেলেন। যে ঘরে তিনি থাকতেন, সেই ঘরের জানালার সার্সীগুলো ঘুষো মেরে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনার মাস দুই পরে আমাকে কতকগুলো বলদ বিলোতে ধোলকায় যেতে হয়েছিল। এক দিনের কাজ, তাই সঙ্গে তাঁবু নিয়ে যাই নেই। তহশীলদার রাও সাহেবকে বলে পাঠিয়েছিলাম যে সরকারী বাঙ্গলাতে থাকব। আমার ক্যাম্প ছিল ৩০।৪০ মাইল দূরে। সেখান থেকে একজন চাকর নিয়ে টাঙ্গায় রওয়ানা হয়ে ধোলকা বাঙ্গলায় পৌছলাম সন্ধ্যাবেলায়। রাও সাহেব উপস্থিত ছিলেন। বললেন, "আপনার এখানে থাকা হবে না। আমি ডিস্‌পেনসারীর একটা খালী ঘরে আসবাব পত্র সব রাখিয়ে দিয়েছি।" আমি রাজী না হওয়াতে বললেন, "চৌকীদার কি বলছে, তা হলে শুনুন।" চৌকীদারকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে,

"ঐ সাহেবটা বড় দৌরাত্ম্য করে। কাউকে এখনও মারে নেই বটে, কিন্তু রোজ সারা রাত বেড়িয়ে বেড়ায় কুঠীর ভেতর। আমরা রাত্রে ভয়ে কেউ ওদিকে যাই না। বেলা থাকতে থাকতে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে এসে নিজের কুঠরীতে শুই।" আমার সন্দেহ হল। মনে হল, কোন কু-মতলবে মিথ্যা কথা কইছে, বাড়ীটাকে পোড়ো বাড়ী করে রাখতে চায়। তাই জিদ করে ঐখানেই রইলাম। বাড়ীটা আমারই সরকারী আবাস। আগে অনেকবার থেকেছি। উপরতলার একটা ঘর আমার বড় ভাল লাগত। সেই ঘরটাই নিলাম। S. মরেছিল নীচের এক ঘরে। উপর নীচে সব সুদ্ধ শোবার ঘর চারটে। খুব বড় বড় ঘর। মাঝখানে সিঁড়ি। প্রত্যেক শোবার ঘরের লাগা কাপড় পরার ঘর, স্নানাগার। দোতলার মেঝে খুব পালিশ করা তক্তার।

আমি খাওয়া দাওয়ার পর প্রায় একটা পর্য্যন্ত লেখা পড়া করে শুয়ে পড়লাম। বড় ল্যাম্পটা নিবিয়ে দিলাম। একটা লণ্ঠন জ্বলতে লাগল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি ঠিক জানি না। মিনিট পনেরো হবে। হঠাৎ জেগে উঠে শুনলাম, পাশের শোবার ঘরটায় কে একজন ভারী বুট জুতো পরে মশ্ মশ্ করে চলছে। উঠে বসে বেশ করে কান পেতে শুনলাম। ঠিক বুটের আওয়াজ। লোকটা ঘরের এক দিক থেকে আর একদিক ক্রমাগত টহল দিচ্ছে। মাঝে মাঝে মেজের তক্তা মড় মড় করছে, যেমন হয় পুরানো কাঠের মেজের উপর লোক চললে! দু ঘরের মাঝে সিঁড়ির

চাতাল। আমার স্থির বিশ্বাস হল, কোন মানুষ আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। ভয়ানক রাগ হল। বালিসের নীচে এক পিস্তল ছিল। এক হাতে সেইটা নিয়ে, অন্য হাতে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে, তিন চার লাফে সেই ঘরটায় গিয়ে পড়লাম। যে ভাবে যতটুকু সময়ে আমি গেলাম, তাতে কোন মানুষের সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাবার সম্ভাবনা ছিল না। ও ঘরে যেতে যেতে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। বেশ করে দরজা জানালা পরীক্ষা করে দেখলাম। এক চাতালের দিকের দরজা ছাড়া সব ভেতর থেকে ডবল ছিটকিনি লাগান ছিল। ঘর একেবারে খালী। একটা কেদারা পর্য্যন্ত নেই! ভাবতে লাগলাম। যে আওয়াজ আমি পাঁচ মিনিট ধরে শুনে এসেছিলাম, সে নির্ঘাত মানুষের পায়ের আওয়াজ। ইঁদুর, বেরাল, এমন কি কুকুর, ও রকম শব্দ করতে পারে না। আস্তে আস্তে নিজের বিছানায় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। চারিদিক নিস্তব্ধ। কিন্তু যেই তন্দ্রা এসেছে, আবার সেই মশ্ মশ্ মশ্। আবার, একটুক্ষণ শুনে, পিস্তল লণ্ঠন নিয়ে লাফিয়ে গেলাম। এবার আরও তাড়াতাড়ি গেলাম, যাতে সিঁড়ি বেয়ে কারও পালাবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা না থাকে। লক্ষ্য করে এবার দেখলাম যে আমি ঘরে পা দিতেই আওয়াজ থামল, তার আগে নয়। চারিদিকে ফের খুঁজে দেখলাম। সব আগের মতন বন্ধ। বিছানায় ফিরে গেলাম। আবার তন্দ্রা আসতেই শব্দ আরম্ভ। ফের লণ্ঠন নিয়ে দৌড়। আবার চারিদিক চুপ চাপ। তিন বারের পর একটু একটু ভয় হতে লাগল। মানুষই হোক অন্য কিছুই হোক, আমি

ত কিছু করতে পারছি না! অথচ উপায় নেই। লোক-জনকে ডাকাডাকি করতে প্রবৃত্তি হল না। শেষ স্থির করলাম, হোক গে আওয়াজ, আমি ঘুমাব। বড় শ্রান্ত হয়েছিলাম। পায়ের শব্দ শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা আমার চাকর চা নিয়ে এসে আমাকে জাগালে। সে জিজ্ঞাসা করলে, "সাহেবের কি রাত্রে ঘুম হয় নেই?" আমি বললাম, "কেন?" সে বললে, "যে চাপরাসীটা নীচে সদর দরজার বাহিরে শুয়ে ছিল, সে সারারাত কার বুট পরে বেড়াবার শব্দ শুনেছে।" আমি চুপ করে গেলাম।

কাজ কর্ম্ম সেরে সেই দিন বিকেলেই আমার ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। তার কিছু দিন পরে আমার আহমদাবাদ থেকে দাক্ষিণাত্যে বদলী হয়ে গেল। আর ধোলকা বাঙ্গলার কিছু খবর জানি না।

কখন মৃতব্যক্তির ছায়া দেখেছি কি না, অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন। দেখেছি যে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তবে যখন একা দেখেছি, সেটা আমার ভ্রম বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু যেখানে আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কেউ সে ছায়া-মূর্ত্তি দেখেছে, সেখানে ঘটনাটা উল্লেখযোগ্য আর, বোধ হয়, প্রণিধান-যোগ্যও। এ রকম আমার দু তিনবার হয়েছে। তার মধ্যে একটা ঘটনা বর্ণনা করা নানা কারণে অনুচিত মনে হচ্ছে। দ্বিতীয়টার কথা সংক্ষেপে বলি। আমার এক পরমশ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয়ের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বছর পরে তাঁর বাড়ীতে এক শুভ কর্ম্মের আয়োজন

হয়েছে। বাড়ীর সকলেরই বার বার মনে হচ্ছে যে আজ এমন দিনে তিনি নেই, থাকলে কি আনন্দ হত তাঁর! শুভ মুহূর্ত্তে দেখা গেল যে সদর দরজায় তাঁর আত্মীয় স্বজনের পেছনে তিনি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি ঠিক সেই সময় এসে উপস্থিত হলাম। গাড়ী থেকে তাঁর শান্ত প্রসন্ন বদন দেখতে দেখতে নামলাম। ভেতরে যেতে যেতে মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল। আমি কাউকে এ ঘটনা বলি নেই। ছদিন বাদ জানতে পারলাম যে আমি ছাড়াও আর একজন সেই সৌম্য মূর্ত্তি দেখেছিল। যে গাড়ীতে আমি আসি, সেই গাড়ীর শোফেয়ার ঐ বাড়ীর পুরানো চাকর। আমার স্বর্গীয় আত্মীয়ের প্রিয় ভৃত্য ছিল। সে পরদিন সকালে মহিলাদের জানায় যে আগের দিন তার মনিব উপস্থিত ছিলেন সদর দরজায়, সকলের সঙ্গে। পরে আমি সেই শোফেয়ারকে জিজ্ঞেস-পড়া করে জানলাম যে ঠিক যে জায়গায় যে কাপড়ে আমি মৃত মহোদয়কে দেখেছিলাম, সেই স্থানে সেই পোষাকে সেও দেখেছিল। আর একটা উল্লেখযোগ্য কথা আছে। আমার গাড়ীতে সেদিন আরও ছজন ছিলেন। তাঁরা কিছুই দেখেন নেই। তবে তাঁদের সঙ্গে আমার স্বর্গীয় আত্মীয়ের কোন স্নেহ-সম্বন্ধ ছিল না।

আমি অনেক বয়স পর্য্যন্ত কখন কোন Séance দেখি নেই। Séance-এর উপর কোন শ্রদ্ধাও আমার ছিল না। ১৯১৮ সালে যখন আমি রত্নাগিরিতে ছিলাম, আমাদের জেলার কালেকটর ছিলেন B. সাহেব। একদিন বিকেলে B. আমার বাড়ী এসে হাজির হলেন। দেখে মনে হল, তাঁর মন বড় ক্ষুব্ধ

অশান্ত হয়ে রয়েছে। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে, তুমি Seance সম্বন্ধে কিছু জান?" আমি উত্তর দিলাম, "কিছু মাত্র না। কখন চক্ষে দেখার সুযোগও হয় নেই।" "আজ সন্ধ্যাবেলা আমার বাঙ্গলাতে এসো। দেখতে পাবে।" "বেশ আসব। কিন্তু তোমার এ সব ঝোঁক আছে, জানতাম না ত!" B. ভদ্রলোক ছিলেন, যাকে বলে, Canny Scot। তাঁর পেটে এত বিদ্যা, কে জানে! তিনি বললেন, "না হে, আমি এ-সবের কিছুই জানি না। কিন্তু আমার বড় তাক লেগে গেছে। আমি মালবনে ছিলাম, গেল কয়েক দিন। সেখানে ইস্কুলে পড়ে এক ছোকরা, নাম কান্দে। আমাকে একজন উকীল বললেন যে এই কান্দে খুব ভাল medium, পরলোক-গত আত্মা নামাতে পারে। কথা হচ্ছিল এক বাগান পার্টিতে। সন্ধ্যা হতেই কান্দে বসল এক পেনসিল কাগজ নিয়ে। অচ্যুতরাও দেশাইকে চিনতে ত? তাঁর Spirit-কে ডাকলে। প্রথমে কাগজে কতকগুলো যা তা আঁচড় পড়তে লাগল। তার পর ধীরে ধীরে দেখা গেল এক একটা স্পষ্ট ইংরেজী অক্ষর। ক্রমশঃ অক্ষর থেকে কথা, কথা থেকে একটা পূরো বাক্য বের হল। আমি কাগজটা নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। তার পরদিন দপ্তর থেকে অচ্যুতরাওয়ের লেখা বার করে সেটার সঙ্গে কাগজের লেখা মেলালাম। দুটোই এক হাতের লেখা স্পষ্ট বোঝা গেল। এই তুমি নিজেই দেখ না!" বলে আমাকে দুখানা কাগজ দিলেন। আমি বেশ করে পরীক্ষা করলাম। লেখা এক রকমই ত মনে হল! B. ফের বলতে লাগলেন, "আচ্ছা, কি করে

এ সব হয়, বল দেখিনি। Spirit কি করে আসতে পারে? এলেই বা লেখে কি করে? যাক্, আমি কান্দেকে সঙ্গে এনেছি। সে বলেছে আমার ভাই আলফ্রেডকে ডাকবে "এই আল্‌ফ্রেড এক বছর আগে যুদ্ধে মারা গেছল। B. তাকে বড় ভালবাসত, আজও এতটুকু ভুলতে পারে নেই। আমি বললাম, "আচ্ছা বন্ধু, আমি সন্ধ্যাবেলা আসব তোমার ওখানে। আমার স্ত্রীকেও বলে যাও। তিনি এ সব ব্যাপার কিছু কিছু বোঝেন। আগে Séance দেখেছেন।" B. ওঁকেও বলে গেল।

সাতটার সময়ে দুজনে কালেক্টরের বাড়ী গেলাম। সেখানে তিনজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। দুজন আমার চেনা। একজন বৃদ্ধ প-রাও সাহেব থিওসফিকাল সভার অধ্যক্ষ, আর অন্যজন এক মাষ্টার, খুব উৎসাহী থিওসফিষ্ট। তৃতীয় লোকটী বালকমাত্র, বয়স ষোল সতেরো, অত্যন্ত রোগা, কিন্তু বড় উজ্জ্বল চোখ। B. তার সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন, "এইটী মিষ্টার কান্দে। এরই কথা তোমায় বলছিলাম।" নমস্কারাদি সেরে সবাই এক গোল টেবিলের (তেপায়া) চারিদিকে বসলাম। টেবিলটা প্রায় চব্বিশ ইঞ্চি চওড়া। আমার স্ত্রী হাত খানেক দূরে দর্শক হয়ে বসলেন। আমি বললাম, "রাও সাহেব, আমি এ ব্যাপারের কিছুই জানি না। কি করতে হয়, দেখিয়ে দেবেন।" তিনি বললেন, "আমরা আজ কালেকটর সাহেবের ভাই আলফ্রেডের প্রেতাত্মাকে ডাকব। সকলে হাত উপুড় করে টেবিলের উপর রেখে হাতে হাতে ছুঁইয়ে বসা যাক্।" সেই রকম

বসা হলে তিনি B. সাহেবের কাছে তাঁর ভাইয়ের একখানা ছবি চেয়ে নিলেন। সুন্দর চেহারা, একুশ বাইশ বছরের জোয়ান, পুরো জঙ্গী পোষাক পরে তলোয়ার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছবিখানা আমরা সবাই দেখে নিলে পর রাও সাহেব বললেন, "আপনারা এক মনে এঁর কথা ভাবুন।" প্রায় দশ মিনিট ঐ রকম বসার পর B. অধীর হয়ে উঠতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কই রাও সাহেব, আল্‌ফী ত এল না!" রাও সাহেব কান্দেকে বললেন, "কি হে কান্দে?" ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমার কাঁধের পেছনে একজন কে এসে দাঁড়াল। তার মুখ আলফ্রেডের মত, কিন্তু সাজ অন্য রকমের। ছবির মূর্ত্তির গায়ে একটা ঘোর রঙ্গের পলটনী কোট, পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত ঘোড়সওয়ারী বুট, কোমরে তলোয়ার ছিল। আর এর অঙ্গে খাকী কামিজ ও কাটা পেণ্টলুন, পায়ে পট্টি জড়ান আর কোমরে পিস্তল। ছবির মুখটা গম্ভীর, কিন্তু এ মৃদু মৃদু হাসছে। আমি মূর্ত্তিটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম, যদিচ আমার চোখ টেবিলের পানে ফেরানো ছিল। কান্দে উত্তর দিলে, "ঐ যে এসেছেন।" "কোথায়?" "জজ সাহেবের পেছনে। ঠিক তাঁর ডান কাঁধ বরাবর।" এতটা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কান্দে, কি রকম কাপড় পরে এসেছে, বল ত!" ছোকরা যথাযথ বর্ণনা করলে। তার পর প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা কওয়ার একটা উপায় স্থির হল। টেবিলের পায়া একবার ঠুকলে, "হাঁ", দুবার ঘন ঘন ঠুকলে, "না"। রাও সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "লেফটেনাণ্ট সাহেব, কি ঠিক বুঝতে পেরেছেন কি রকম করে

আমাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন?" টেবিলের পায়া একবার ঠক করলে আমরা বুঝলাম spirit জবাব দিতে প্রস্তুত। নানাপ্রকার প্রশ্ন করা হল। কোনো কোনোটার "হাঁ, না," জবাব হয়, কোনো কোনোটার হয় না। "আপনি কোন্ যুদ্ধে মারা যান?" "আপনার কর্ণেলের নাম কি ছিল?" "আপনি কোন্ স্কুলে পড়তেন?" এই রকম প্রশ্নের উত্তর টেবিলটা বানান করে করে দিতে লাগল। একটু বুঝিয়ে বলি, যাঁরা আমার মত আনাড়ী তাঁদের জন্য। ধরুন কোন বিশেষ জায়গার নাম জিজ্ঞাসা করা হল। টেবিল একবার পায়া ঠুকে জানালে যে সে প্রস্তুত। তার পর রাও সাহেব আস্তে আস্তে A B C D বলে যেতে লাগলেন। যেটার বেলায় ঠক করে আওয়াজ হল সেইটে প্রথম অক্ষর। চার বার এই রকম করে পাওয়া গেল A, V, O, N। আমরা বুঝলাম নামটা Avon। তখন একবার সোজা প্রশ্ন করে মোকাবিলা করে নিলাম। যত কথা জিজ্ঞাসা করা হল, তার অধিকাংশের উত্তর B. ছাড়া আর কেউ জানতেন না। Adjutant-এর নাম তাঁরও জানা ছিল না। অথচ টেবিলের কাছ থেকে একটা নাম পাওয়া গেল। পরে B. বিলেতে খোঁজ করে জেনেছিলেন নামটা ঠিক। এ সমস্ত সময়টাই ছায়ামূর্ত্তি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম। হঠাৎ মনে হল কেউ নেই। দুই একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। কান্দে বললে, "আলফ্রেড বেরিয়ে যাচ্ছেন।"

এই কথা বলতে না বলতে টেবিলটা ভয়ানক দুলে উঠল।

প্রায় নাচতে লাগল, যেমন ছোট নৌকা সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর করে। একবার এ পা ঠোকে, একবার ও পা। রাও সাহেব খুব চেঁচিয়ে উঠলেন, "কে তুমি, আমাদের বিরক্ত করতে এসেছ?" কোন সাড়া নেই। টেবিল সেই পাগলের মত নাচছে। খুব জোরে কয়েকবার ধমক দিতে স্থির হল। রাও সাহেব বললেন, "নিশ্চয় সেই White।" আমাকে বোঝালেন, "মহাশয় একটা অতি পাজি spirit আছে। আমাদের জ্বালাতন করে মারে। কখন বলে, আমি Scotchman, কখন বলে পারসী। কিন্তু বোধ হয় ও মুসলমান, কেন না একদিন ফারসীতে নাম লিখেছিল medium-এর মারফত, মীর মহম্মদ মুনশী।" আমি এবার কিছুই দেখতে পেলাম না। কান্দে বললে, "হাঁ, সেই বটে।" একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে ঘর অন্ধকার ছিল না। একটা বড় ল্যাম্প কোণে জ্বলছিল, তবে তার আলোটা কমিয়ে রাখা হয়েছিল। তার পর White-এর সঙ্গে কথাবার্তা। সুবিধা করা গেল না। সে যা তা উত্তর দিতে লাগল। শেষ রাও সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "দেখ তোমাকে কিছুতেই ছুটি দেব না এ রকম করলে। যখন এসেছ একটু খেলা দেখিয়ে যাও। রাজী আছ?" টেবিল আওয়াজ দিলে, ঠক্। মাষ্টার তখন তাঁর গোল টুপিটা টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বললেন, "এটাকে দাঁড় করাও দেখি, White।" আস্তে আস্তে টুপীটা দাঁড়িয়ে উঠে গড়াতে আরম্ভ করলে টেবিলের এ পাশ থেকে ও পাশ। তার পর White (?) দেশালাইয়ের বাক্স নাচালে। বাক্সটা নেচে

নেচে হুকুমমত একবার এর কাছে যায়, একবার ওর কাছে। আলফ্রেডের সঙ্গে কথা কওয়ার সময় যে গাম্ভীর্য্য সকলের মনে এসেছিল, সেটা চলে গেল। B. পর্য্যন্ত হাসতে লাগল। হঠাৎ টেবিল আবার ক্ষেপে উঠে নাচতে লেগে গেল। খানিকক্ষণ কিছুতেই বাগ মানে না। তখন রাও সাহেব টেবিল চাপড়ে বললেন, "আচ্ছা, একটা কাজ করে তুমি চলে যেতে পার। আমাদের টেবিলটাকে হাঁটাও।" আমরা দাঁড়িয়ে উঠলাম। পাঁচজনেরই হাত টেবিলের উপরে। টেবিল দেড় বছরের ছেলের মত টলতে টলতে হাঁটি, হাঁটি, পা, পা, আরম্ভ করলে। দরজার গোড়ায় পৌঁছলে সকলে হাত ছেড়ে দিলে। শুধু আমার হাত রইল। রাও সাহেব বললেন, "মুখে বলতে থাকুন, Go on, go on।" আমি তাই বলতে লাগলাম। টেবিল চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে বাহিরের ছাদে গেল। ঠক্ ঠক্ করতে করতে ছাদটা পার হল। তার পর কে যেন টেবিলটাকে হুড়মুড় করে ছাদের আলসের গায়ে উলটে দিলে। হয়ে গেল Séance!

B. দু তিনদিন ধরে আমায় ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "কি ব্যাপার, বল ত! আল্‌ফী কি সত্যি এসেছিল? না ওদের মধ্যে কেউ আমাদের চোখে ভেলকী লাগিয়ে দিয়েছিল?" আমি কি উত্তর দেব? নিজেই বুঝতে পারি না কিছু। আগে মনে করতাম Séanceগুলো সব জুয়োচুরী। নিজে চোখে দেখলাম যে কেউ হাতে করে টেবিলও নাড়ে নেই, টুপী দেশালাইও কেউ তারে বেঁধে নাচায় নেই। তার পর আমার পিছনদিকে যে মূর্ত্তি দেখলাম সেটা কান্দে

দেখতে পেলে কি করে, যদি আমার মনের ভ্রমই হয়? বুদ্ধিমান পাঠক নিজের বুদ্ধিমত ব্যাখ্যা করে নেবেন। আমি আর কি বলব!

আর এক রকমের ঘটনা একটা বলি। এটাতে প্রেতাত্মার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেবারও আশ্চর্য্য এই লেগেছিল যে আমি যে ছায়াটা দেখলাম তার কথা আর একজন জানলে কি করে? প্রায় পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা। আমি তখন খুব বেশী ছবি আঁকতাম। প্রায় সব ছবিই দেব দেবীর মূর্ত্তি। ছবিগুলোর technique নেই বললেই হয়, কেন না আমি আঁকতে কখনও শিখি নেই। তবে আমার কাছে তার মূল্য খুব বেশী এই জন্য যে ঐ daub আঁকতে আঁকতে আমি আমাদের দেশের প্রাচীন চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি পরিষ্কার বুঝতে পারি। আমার বাঁধা নিয়ম ছিল যে কোন ঠাকুরের ধ্যান বার বার পড়ে মূর্ত্তিটা ধারণা করতে চেষ্টা করতাম। যতক্ষণ না বেশ স্পষ্ট একটা মূর্ত্তি মানসপটে দেখতাম, ততক্ষণ আঁকতে আরম্ভ করতাম না। অবশ্য, শিব গড়তে বাঁদর গড়ার যে কথাটা আছে, সেটা আমারও বার বার হত। কল্পনার মূর্ত্তিটা কাগজে ফোটাতে পারতাম না। তবে প্রাণপণ চেষ্টা করতাম। আমার চেষ্টার সাক্ষী অনেকেই ছিলেন। তার মধ্যে একজন আজ দেশবিশ্রুত সাধু পুরুষ। তিনি প্রায়ই বসে বসে আমার আশা নিরাশার খেলা দেখতেন। দিলাসাও যথেষ্ট দিতেন। একদিন বললেন, "এই ছবি আঁকতে আঁকতেই একদিন আপনার কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হবেন।" পাঠককে

অভয় দিচ্ছি। সে রকম কিছু ঘটে নেই, কুণ্ডলিনী আজও ঘোর সুষুপ্তিতে মগ্ন!

অতসী কুসুম, জবা কুসুম, নবজলধর শ্যাম, নবদূর্ব্বাদল শ্যাম, হিরণ্ময় বপু, নানা রকম রঙ্গ দিবারাত্র মাথার ভেতর ঘুরছে। ক্রমাগত তুলি ঘষে ঘষে এই সব রঙ্গ ফলাতে চেষ্টা করছি, আর চিত্রকর-জাতীয় যাকে কাছে পাচ্ছি তার প্রাণ ওষ্ঠাগত করছি, লজ্জা শরম কিছুই নেই! এখন কিন্তু সে সব মনে করতেও লজ্জা বোধ হয়। অন্যান্য রঙ্গ তুলি থেকে এক-রকম বের হত। মূর্ত্তির ভঙ্গ ও মুদ্রাও কতকটা রপ্ত হয়েছিল। কিন্তু দেবতার পদতল করতলের অলক্তরাগ, আঁকা দূরে থাক, মনেও দেখতে পেতাম না। সেকাল একালের যত ছবি দেখেছি, কোনটাতেই এই জিনিস আমার মনে ধরে নেই। এত করে এ কথা বলবার কারণ এই, যে আমার গল্পটাই ছবির রঙ্গ নিয়ে।

১৯০৯ সালে যখন কুচবেহারে রয়েছি, তখন এক বৈষ্ণব কীর্ত্তনীয়ার সঙ্গে আলাপ হয়। শুধু আলাপ নয়, ঘনিষ্ঠতা হয়। বার বার তার কীর্ত্তন শুনতাম, কখন কখন সারা রাত। সে নীচ জাতীয় ছিল, বিদ্যাবুদ্ধিরও বিশেষ ধার ধারত না। কিন্তু তার ভক্তির পুঁজি অপর্য্যাপ্ত ছিল। তার সঙ্গে বসে বসে গল্প করে বড় আনন্দ পেতাম। সে আমায় কেবলই বলত, "বাবু,আমাকে আমার গোপালের একটা ছবি এঁকে দিন।" আমার ছবি আঁকার কত হাঙ্গাম, তা সে কি জানবে! একদিন কথাটা ভেঙ্গে বললাম, "বৈরাগী, তোর গোপাল যখন ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশী

বাজায়, তখন তার ডান হাতের চেটোর রঙ্গ কি রকম দেখায়, আমি বুঝতে পারি না। আমাকে দেখাতে পারিস।” বলে আমার আঁকা এক বংশীধারী মূর্ত্তি দেখালাম তাকে, “এই দেখ্ না, এ কি তোর গোপালের হাতের রঙ্গ!” বৈরাগী চুপ করে রইল।

পরে, একদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর কোন বন্ধুর বাড়ীতে কীর্ত্তন শুনতে যাওয়ার কথা। বৈরাগী যাওয়ার পথে আমাকে ডেকে নিয়ে যাবে। রাত আটটায় আমি বসে বসে পড়ছি, এমন সময় সে এল। সেইদিন ভারতীতে নন্দলাল বাবুর আঁকা “জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ” ছবিটা এসেছিল। আমার সেটা এত ভাল লেগেছিল যে ছিঁড়ে ঘরের বেড়ায় টাঙ্গিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। বৈষ্ণবকে দেখালাম “ছবিটা দেখ্ ত, চিনতে পারিস্ কি না!” সে একবার দেখেই ছোঁ মেরে ছবিটা খুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে, “বাবু, এ যে আমার গৌর! আমি এটা নেব। আপনি ত আমার গোপালের ছবি করে দিলেন না!” আমি বললাম, “তা নে। আমার আর একখানা আছে। কিন্তু তুই গোপালের হাতের রঙ্গ ত কই বলে দিলি না। কি পূজা করিস্ রোজ রোজ!” বৈরাগী একটু হাসলে।

কীর্ত্তনের আসরে পৌঁছেই সে গৌরাঙ্গের ছবিখানা এক থামের উপর এঁটে দিলে। তার পর সেই ছবির উপর চোখ রেখে গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করলে। কি গানই গাইলে সে দিন! গলা তার চিরদিনই মিষ্টি, কিন্তু সে দিনের মত মধুর স্বর এক দিনও শুনি নেই। সার্থক চিত্রকরের ছবি আঁকা!

গান নাচ নিত্য প্রথামত চলল। বারোটার পর খুব জমেছে। বৈরাগী রাধা কৃষ্ণের এক একটা উপমা দিচ্ছে, আর সেইটে গাইতে গাইতে ঘুরে ঘুরে নাচছে। "শ্যাম নবনীরদ বরণ, রাধা থির বিজুলী", "নীল তমাল ঘেরে কনকলতা রে", এই রকম এক একটা আলাদা পদ গাইছে। আমরা তন্ময় হয়ে শুনছি। অন্ততঃ আমি নিজের কথা বলতে পারি। গানে, সুরে, নাচে, তালে, আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েছে। এমন সময় হঠাৎ দেখি আমার সামনে দুটী নীল হাত বাঁশী ধরে রয়েছে। ডান হাতের চেটো আমার দিকে ফেরান। তার সে রঙ্গ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়। লাল, কিন্তু সে রকম লাল আমি কখনও দেখি নেই। রঙ্গের বাক্স থেকে সে রক্তরাগ কি করে বেরোবে? আঁকতে কখন চেষ্টাও করি নেই। তবে আমার সমস্যা পূরণ হয়ে গেল। আর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না।

এ পর্য্যন্ত সবটা বোঝা যায় এক রকম। ঐ অলক্ত রাগ দেখবার জন্য আমার এত দিনের আগ্রহ যে সেটা ঐ ভাবে দেখব তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। কীর্ত্তন আরম্ভ হওয়ার সময় নন্দলাল বাবুর চিত্রের মন্ত্রের মতন অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে মনে একটু হিংসাও হয়েছিল। কেন ও রকম আঁকতে পারি না? কে জানে, হয়ত গান শুনতে শুনতে ছবির কথা অজানতে মনের মধ্যে তোলা পাড়া করছিলাম। তার উপর সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি। ফলে একটা ও রকম ছায়াচিত্র দেখা অসম্ভব নয়।

কিন্তু যেটা যথার্থ অদ্ভুত, সেটা হচ্ছে এই, যে ঠিক ঐ

মুহূর্তে গায়ক মুখ ঝুঁকিয়ে আমার কানে বলে গেল, "বাবু, দেখলেন ?" এই দুটী কথা চকিতের মত বলে আবার ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। আমার পাশে যে বন্ধুটি বসেছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বৈরাগী কি বললে ?" আমি উত্তর দিলাম, "কিছু না।"

পরদিন আমি বৈষ্ণবকে বললাম, "আমি তোর গোপাল আঁকতে পারব না। তুই যে রঙ্গ দেখালি, ও রঙ্গ আমি কোথায় পাব!" সে হাঁ করে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল। বললে "বাবু, আমি কি দেখালাম ?" আমি বললাম, "কাল রাত্রে নাচতে নাচতে আমায় যে বললি, দেখলেন বাবু ?" বৈষ্ণব আশ্চর্য্য হয়ে গেল, "আমি ত কিছুই বলি নেই, বাবু। আমার ত কোন কথাই মনে হচ্ছে না।" আমি তাকে কি হয়েছিল বর্ণনা করাতে সে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে তার ঠাকুরকে প্রণাম করলে। পাঠক, বৈরাগী কি করে জানলে যে আমার চোখের সামনে দুটো হাত বাঁশী ধরে দেখা দিয়েছে ? কথাটা ভেবে দেখার মতন।

এই বৈরাগীর কথা বলতে বলতে অন্য সাধু সন্তের গল্পও মনে আসছে। তবে তাতে চটকদার কিছু নেই। যোগ-বলের কোন অদ্ভুত নিদর্শন দেখা আমার ভাগ্যে ঘটে নেই। সুদূর প্রদেশে মঠ অনেক দেখেছি। তবে, ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও শচীদেবীর ঢেঁকীশালে ধান ভানবে, অপ্সরাদের সঙ্গীত তার কানে কি করে পৌঁছবে ?

অন্য রকমের দুই একটা আশ্চর্য্য জিনিসের কথা বলে

আজকের লেখা শেষ করব। এ কথাগুলোর সঙ্গে ভূত প্রেতের বা ঠাকুর দেবতার কোন সম্পর্ক নেই। আমার এক কবিরাজ বন্ধু ছিলেন। তিনি অনেক দিন কৈলাসবাসী হয়েছেন। তাঁর চিকিৎসা বিদ্যায় অসাধারণ অধিকার ছিল। কিন্তু সে বিষয়ে কিছু এ প্রসঙ্গে বলা অবান্তর হবে। তবে তাঁর সম্বন্ধে দু চারটা ঘটনা বলব, যা আমাদের বৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। কবিরাজ, বোধ হয়, কোন রকম যোগ সাধনা কবতেন। কখন খুলে কিছু আমাকে বলেন নেই। তবে, আমাকে শিকারে আসক্ত জেনে লক্ষ্যবেধ সিদ্ধির জন্য ত্রাটক যোগ অভ্যাস করতে বারবার উপদেশ দিতেন। উপদেশ নিষ্ফল হয়েছিল। আমাদিকে লোভ দেখাবার উদ্দেশ্যে তিনি একটা বুজরুকী মাঝে মাঝে করতেন। একটা কাগজে কিছু লিখে, সেটা আমরা ওঁর কপালে গঁদ দিয়ে এঁটে দিতাম। তার পর উনি রীতিমত পদ্মাসনে বসে, শিবনেত্র হয়ে, ধীরে ধীরে বানান করে করে সেই লেখা পড়তেন। মনে হত, পড়াতে খুব বেগ পেতে হচ্ছে। কিন্তু সবটা ঠিক পড়তেন শেষ পর্য্যন্ত।

কবিরাজ মহাশয়ের হাত দেখার অভ্যাসও ছিল। এক একটা খুব আশ্চর্য্য কথা বলতেন। বিশেষ ভুল কখন করেছিলেন বলে মনে নেই। একদিন এক বিয়ে বাড়ীতে এসে কনের হাত দেখে হঠাৎ বললেন, “না, বিয়ে ত হবে না ও তারিখে!” সকলে শশব্যস্ত হয়ে উঠল। বিয়ে নির্দ্দিষ্ট তারিখে না হওয়ার তখন কোন কারণই ছিল না। আবার

ভাল করে হাত দেখে পরীক্ষা করে বললেন যে কয়েকদিন পরে অমুখ তারিখে বিয়ে হবে। সেই দিনই বরের হাত দেখলেন। দেখে, অনেক ইতস্ততঃ করে বললেন, "আপনার পিতার সাংঘাতিক অসুখ, পৃষ্ঠব্রণ হয়েছে। অস্ত্র চিকিৎসা করে সারবে। ভোগ অনেক আছে, তবে ভয় নেই!" বরের পিতা সেই দিন সন্ধ্যাবেলা কলকাতায় পৌঁছলেন পিঠে একটা সামান্য ফোড়া নিয়ে। দেখতে দেখতে সেই ফোড়া ভীষণ কারবঙ্কলে দাঁড়াল। কাটাকুটি হল। বেশ কয়েক সপ্তাহ বিছানায় পড়ে থেকে অবশেষে সেরে উঠলেন। বিবাহ কবিরাজের বলা তারিখেই সম্পন্ন হল।

একবার আমার কর্ম্মস্থানে ফিরে যাওয়ার দিন কবিরাজ এসেছেন বিদায় নিতে। আমি ঠাট্টা করে বললাম, "কবিরাজ, হাতটা একবার দেখ, কিছু লাভ লোকসান আছে কি না।" কবিরাজ বললেন, "তোমাদের, ভাই, সব বিষয়েই ঠাট্টা। আচ্ছা, দাও হাত।" হাত বেশ করে দেখে জানালেন, "বিশেষ কিছু দেখছি না। তবে মাস খানেকের পরে কিছু ধনাগম হবে। একটা খারাপ জিনিসও আছে। শীঘ্রই বাম অঙ্গে একটা আঘাত পাবে। কপালগুণে অল্পের উপর দিয়েই যাবে। ভয় পাবার কারণ নেই।" কর্ম্মস্থানে ফিরেই শুনলাম একটু আয় বৃদ্ধি হয়েছে। অভাবনীয় কিছু নয়। তবে আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। বাম অঙ্গে আঘাতটাও বাদ গেল না। সেটা পেলাম পথেই, জাহাজের স্নানাগারে। চৌকাঠটা বাঁ হাতে ধরে দরজা দিয়ে ঢুকছি, এমন সময় অকস্মাৎ একটা বড় ঢেউ লেগে জাহাজটা খুব কাৎ হয়ে

গেল। ফলে লোহার দরজা দড়াম করে আমার হাতের উপর পড়ল। হাতটা সময়ে টেনে নিতে পেরেছিলাম, তাই ভেঙ্গে গেল না। কিন্তু একটা আঙ্গুল চিমটে গেল। কিছু-দিন যন্ত্রণা ভোগ করলাম। শেষ নখটা কালো হয়ে উঠে গেল!

হাত দেখার কথা বলতে আর একজনের কথা মনে হচ্ছে। ভদ্র লোকের নাম বিনয় বাবু। বন্দে মাতরং আপিসে কাজ করতেন। খুব কাজের লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল নেচে গেয়ে, যাত্রা থিয়েটারের নকল করে, লোককে হাসান। একদিন আমরা অনেকগুলি লোক জমা হয়েছি। বিনয় হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বলার ঢং করে সবাইকে হাসাচ্ছেন। স-বাবু সেই সময় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর ভীষণ ঝোঁক ছিল তাস খেলার। এসেই চেঁচামেচি আরম্ভ করলেন, "কেন সময় নষ্ট করছেন সব? তাস বের করুন।" বিনয় তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "একবার হাতটা দেখে দিই আসুন, স্যার!" তিনি হেসে ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, "চটপট সেরে নিন, মশায়!" বিনয় ভদ্রলোকের হাত দেখেই কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে আবার নানা রকম হাসি ঠাট্টা আরম্ভ করলে। একটু পরে সুবিধা বুঝে আমার কাছে উঠে এসে চুপি চুপি বললে "কর্ত্তা, একবার বাহিরে আসবেন? একটু কথা আছে।" বাহিরে আমাকে নিয়ে গিয়ে মুখটা খুব ভার করে বললে, "আপনাদের বন্ধুর হয়ে এসেছে। একটা চিহ্ন হাতে উঠেছে। আগে ও চিহ্ন হবার

দেখেছি, তুবারের কোন বারই তিন মাস কাটে নেই। কথাটা বলতাম না। কিন্তু উনি আমাদের কাগজে উইল করে কিছু দিয়ে যাচ্ছেন না ? সেইটে একটু তাড়া দেবেন। নইলে ফসকে যাবে।" এর কয়েক দিন পরে এক শনিবারে আমরা স-বাবুর বাড়ী বেড়াতে গেলাম। বাড়ী শহরের বাইরে। তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ কাটিয়ে তাঁর গাড়ীতেই কলকাতা ফিরলাম। পথে তিনি সঙ্গীত সমাজে নেমে পড়লেন। স-বাবু লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড মানুষ। বেশ ভাল স্বাস্থ্য। থেকে থেকে দিল্লী, লাহোর, পেশোয়ার পর্য্যন্ত মোটরে পাড়ি দিতেন। তাঁর যে হঠাৎ কিছু হবে, এটা অভাবনীয়। কিন্তু তুদিন পরে সোমবারে সকালবেলা এক ভদ্রলোক এসে বললেন, "স-চন্দ্র যে যায় যায়। আপনারা দেখতে গেছলেন ?" আমরা কিছুই জানতাম না। ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম যে শনিবার দিন ক্লাব থেকে ফেরবার পথে হেদোয় নেমে স-বাবু রক্ত বমি করেছিলেন। বাড়ী গিয়ে আরও বমি হয়। ডাক্তার বলেছেন যে ভেতরের কি শিরা ছিঁড়ে গেছে। যখন এই সব কথা হচ্ছে, তার আগেই স-চন্দ্র ইহলোক ছেড়ে গেছেন। উইল সই হয় নেই, টাকাকড়ি সব এক ধনী আত্মীয় পেলেন।

কোষ্ঠীর ফলাফল সম্বন্ধে একটা ঘটনা বলব। ঘটনাটা আমার এক বন্ধুর জীবনের। সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধেই আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, শোনা কথা নয়। একদিন ইন্দ্রলোকে দেবরাজের সভায় নাচতে নাচতে বন্ধুবরের তাল কেটে যায়। ফলে, স্বাধিকারপ্রমত্ত শাপেনাস্তংগমিত-মহিমা

হয়ে তাঁর কতিচিৎ বর্ষ নির্ব্বাসনে কাটাতে হয়, রামগিরিতে নয়, সিন্ধুতীরে। প্রভু শাপমোচনের কোন দিবস বা উপায় স্থির করে দেন নেই। তবে বন্ধু সেখানে অবলাবিপ্রযুক্ত ছিলেন না। উপরন্তু সেই মরুপ্রদেশে তাঁর পুত্ররত্ন লাভ হল। বন্ধুবরকে মরুবাসী সবাই বড় স্নেহ করতেন। এক ইসলামপন্থী মিত্র অনেক যত্ন করে নবজাত কুমারের জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করতে প্রবৃত্ত হলেন। গ্রহের ফলাফল গণনা করতে গিয়ে জ্যোতিষী পিতার শাপমোচনের কাল জানতে পারলেন। বন্ধুর কাছে গিয়ে বললেন, "আগামী বছর অমুক মাসের বারোই তারিখে তোমার শাপমুক্তি হবে।" আমি নিজে স্থির জানি যে সে সময় পর্য্যন্ত মুক্তির দিন নির্দ্দিষ্টই হয় নেই, বিচারসাপেক্ষ ছিল। অথচ জ্যোতিষীর গণনা ঠিক ফলল এক বছর পরে। নির্দ্দিষ্ট মাসের দশই তারিখে এক মোহর-বন্ধ আদেশ-পত্র বন্ধুর হাতে এল। তিনি ঠিক বুঝলেন, ভেতরে কি আছে। কিন্তু খুলে দেখবার উপায় ছিল না। লেফাফার উপর বড় কর্ত্তার নাম, সুতরাং পত্র তাঁর কাছেই পাঠাতে হল। বন্ধু বড় কর্ত্তাকে এক চিঠি লিখলেন সেই দিনের ডাকে, "আজ তোমার কাছে একটা সরকারী চিঠি পাঠাচ্ছি। যদি ভেতরে আমার নামে কোন হুকুম থাকে, ত তারযোগে খবর দিও।" যদি বড় কর্ত্তা তার করতেন, ত বন্ধু তাঁর মুক্তির হুকুম এগারোই তারিখে পেতেন। কিন্তু তা করলেন না। নানা রকম ভেবে ডাকে চিঠি লিখলেন। ফলে, শাপমোচনের আদেশ ঠিক বারোই তারিখে বন্ধুর হাতে এল। জ্যোতিষগণনা হুবেহুব ঠিক হল।

Coincidence, "কোন রকমে মিলে গেল," বলে এত কথা কাটিয়ে দেওয়া কঠিন।

৮

যখন বিলেত রওয়ানা হই, তখন আমার বয়স কুড়ি বছরও হয় নেই। তবু আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে আমি রীতিমত বড় হয়েছি, সংসারকে বেশ চিনেছি। চেনারই ত কথা! ছটী বছর মাথার উপর কেউ কর্ত্তাব্যক্তি ছিলেন না। মনের সাধে কলকাতার পথ ঘাট চষে বেড়িয়েছি। তার উপর, বিয়ে করেছি, পরীক্ষায় ফেল হয়েছি, দিন ছুপুরে রাত ছুপুরে ফুটবল খেলেছি, সভা-সমিতিতে মোড়লী করেছি। আর কি রকমে মানুষে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে!

কর্ত্তৃপক্ষের কিন্তু ধারণা অন্য রকম ছিল। তাঁরা এই নাবালকটীর তত্ত্বাবধানের নানা ব্যবস্থা করতে লাগলেন। স্থির হল, অমুক আমাকে বোম্বাইয়ে জাহাজে তুলে দিয়ে আসবেন, অমুক মার্সেইয়ে নামিয়ে নেবেন। জলপথটা যে একটু স্বস্তিতে কাটাবে, তারও উপায় এঁরা রাখলেন না। কাপ্তান সাহেবকে আমার অভিভাবক করে ছেড়ে দিলেন। আমি সমুদ্র পার হচ্ছিলাম ফরাসী কোম্পানীর জাহাজে। ওদের ভাষা একটু আধটু বলতে পারতাম বলে অফিসার-মণ্ডলীর কাছে আমার আদর খুব বেড়ে গেল। তারা আমার খাবার জায়গা করে দিলে নিজেদের মাঝে, আর, এটা খাও, ওটা খাও, করে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করতে লাগল। আমার

কেবিনে উইলিয়ামস নামে এক বুড়ো ইংরেজ ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তাঁর পেশা ছিল রাজারাজড়ার ঘোড়দৌড়ি আস্তাবলের তদারক করা। আমি কুচবেহারের লোক জেনে তিনি মহাখুশী হয়ে আমাকে বললেন, "তুমি ত আমার আপনার লোক হে! আমি তোমাদের রাজার কত ঘোড়া রেস-এর জন্য তৈরী করে দিয়েছি।" ফরাসী কাপ্তানকে এই বৃদ্ধ কি বললেন, জানি না। কিন্তু এডেন, পোর্ট-সৈয়দ বন্দরে ইনিই আমাকে ডানা ঢাকা দিয়ে বেড়িয়ে নিয়ে এলেন। পাঠককে আগেই বলেছি আমার সহযাত্রী কাপ্তান ষ্টুয়ার্টের কথা। পোর্ট সৈয়দ ছাড়বার পর তিনিও আমার একজন অভিভাবক হয়ে দাঁড়ালেন। আমাকে একটু বকে ধমকে বললেন, "তুমি বড়লোকের ছেলে, উইলিয়ামসের সঙ্গে অত মাখামাখি কর কেন? লোকটা জাতে সহিস বই ত নয়!" ছেলেবেলা থেকে বাপ-মার হুকুমে ঝি চাকরদের দাদা দিদি বলে ডেকে এসেছি, তাতে ত কোন দিন ইজ্জৎ যায় নেই। আজ উইলিয়ামস আমার জাত মারবে কি করে!

মার্সেই বন্দর চোদ্দ দিনের দিন পৌঁছলাম। কাপ্তান পিঠ চাপড়ে বললেন, "তোমার কর্ত্তাদের লিখো যে আমরা তোমাকে খেয়ে ফেলি নেই, ভালয় ভালয় ইউরোপে পৌঁছে দিয়েছি। তাঁরা যেন আমাব এজেন্ট সাহেবকে জানান।" একটু পরেই দেখি চৌধুরী সাহেব এসেছেন। জাহাজের বন্ধুবান্ধবের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। লণ্ডন পর্য্যন্ত তিনিই আমার কর্ণধার।

এইবার একটু বাজে কথা বলব। আমি বিলেত প্রবাসের গল্প লিখব শুনে এক তরুণ বন্ধু সেদিন ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের সময়ে বিলেত ছিল না কি?" প্রশ্নটা নিতান্ত অর্থহীন নয়। তবে, একটা যেমন তেমন বিলেত ছিল বই কি! যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। আমাদের সেই সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মযুগের ভাবনা সাধনা যে রকম ছিল, আমাদের বিলেতরূপী সিদ্ধিও তদ্বৎ ছিল। এখনকার বাঙ্গালীর উৎকট সাধনার উপযুক্ত সিদ্ধি এখনকার উগ্র বিলেতী সভ্যতা। এ বিলেত আমাদের ধাতে সইত না। হয়ত ভিক্টোরীয় যুগের একজন সেকেলে স্কোয়ার এসে দাঁড়ালে তারও ঠিকে ভুল হয়ে যেত। সকলের কি পেঁয়াজ, রসুন, গরম মসলার গন্ধ বরদাস্ত হয়! তবে একটা কথা বারবার মনে হয়। যে জাত মহাযুদ্ধের সময় চার বছর ধরে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা করেছিল, trench-এর (খাদের) পাঁকের মাঝে শুকনো নোনা মাংস খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছিল, shrapnel গুলির বর্ষণে কাতারে কাতারে প্রাণ দিয়েছিল, তাদের ঘরে ফিরে এসে, কিছু দিন সকল বাঁধন সকল শাসন কেটে ফেলে দিয়ে, জীবনটাকে আবীর গুলালের রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দেওয়ার সাধ হবে বই কি! কিন্তু যারা রণদেবতার তাণ্ডব-লীলার সময় লেপ মুড়ি দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে ছিল, তাদের যোগ্য কণ্ঠাভরণ লৌহশৃঙ্খল। বসন্তোৎসবের ফুলের মালা তাদের জন্য নয়!

আমি যে ইংলণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলাম সেখানে বসন্তোৎ-সবের চিহ্নমাত্র ছিল না। চারিদিকে একটা বিরাট আত্ম-

প্রসাদের হাওয়া। কোন রকমের হালকাপনা সে হাওয়ার সঙ্গে খাপ খেত না। লোকে হাসত মুখ টিপে টিপে, নাচত পা ঘসে ঘসে, চলত গজেন্দ্রগমনে। ইংরেজ তখন তার অগাধ ঐশ্বর্য্য নিয়ে, বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ে, মশগুল। কিসে টাকার থলী আরও ভারী হবে, কিসে রাজ্য আরও বিস্তৃত হবে, এই তার ধ্যান। এই যুগের সম্বন্ধেই এক রসিক ফরাসী লেখক বলে গেছেন, ইংরেজ-বাপ তার ছেলেকে সংসারযুদ্ধে পাঠাবার সময় আশীর্ব্বাদ করে বলতেন, "যাও বাপু! টাকা রোজগার কর গিয়ে। পার, ত সৎপথে থেকে রোজগার কোরো। কিন্তু মনে রেখো, টাকা আনাই চাই।"

মোটের উপর ইংরেজের তখন একটা খুব হাম-বড়া ভাব। তা, হওয়ার কারণও ছিল। তাদের Free trade (অবাধ-বাণিজ্য), তাদের Constitutional monarchy (নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র), তাদের Public school (ইটন, হ্যারো প্রভৃতি), তাদের Varsity (অক্সফোড় প্রভৃতি বিদ্যাপীঠ), জগতের আদর্শ। তাদের বিশাল সাম্রাজ্য কেমন সুশৃঙ্খলায় চলছে! বিদেশীরা দেখুক, শিখুক। যুদ্ধবিগ্রহ অনেকদিন হয় নেই, কিন্তু তাতে কি এসে যায়, ইংলণ্ড সদাই প্রস্তুত! সেই সময়কার একটা গান মনে পড়ছে। তখন কুলী মজুরেও রাস্তায় গাইত:—

We don't want to fight
But, by Jingo, if we do,
We have got the ships,
We have got the men,
We have got the money too.

বড়াই শুনে ভাগ্য-দেবতা হয়ত অলক্ষ্যে আকাশের কোণে বসে হাসছিলেন। তার পর কটা বছরই বা গেছে! এত সাধের Free trade, Constitutional Monarchy, Eton, Harrow, Oxford, Cambridge, আর জগতের চোখে ধাঁধাঁ লাগাতে পারছে না। রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি এখন জগৎকে শিখতে হচ্ছে টিউটন, লাটিন ও শ্লাভ জাতের কাছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর পারের দুই জাতের হাতে। তার পর, জগৎজোড়া একটা বৃহত্তর ব্রিটেন গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা, তাও আজ জেনিভার আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের মহান আদর্শের পাশে একটা অতি ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির পন্থা বলে ধরা পড়ে গেছে। যাকগে, এ সব পুরানো কথা নয়, অতএব আমার অধিকারের বহির্ভূত।

চৌধুরী মহাশয়কে পাওয়া পেয়ে আমার একটা মস্ত সুবিধা হয়ে গেল। তাড়াহুড়ো করে ইংলণ্ডে যেতে হল না। প্রায় হপ্তাখানেক ধরে মার্সেই ও পারিস দেখে নিলাম। আমি অজ-নেটীব ঘরের ছেলে, সাহেবী কায়দা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কলকাতায় শেষ কদিন ইংরেজ দরজী, ইংরেজ মুচী ও ইংরেজ নাপিতে মিলে আমাকে কোন রকমে সাহেব সাজিয়ে দিয়েছিল। কাজেই বড় বড় হোটেলে বাধ-বাধ ঠেকত বই কি! তবে মুরুব্বী সঙ্গে। ছোট বড় সমস্যাগুলো তিনিই মিটিয়ে দিতেন।

ডুমাসের Monte Cristo বইখানা আমার বড় ভাল লাগত। দেশে অনেকবার পড়ে এসেছিলাম। মার্সেই ঘুরে

ঘুরে ঐ কেতাবের জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে লাগলাম। আর কিছু দেখতে পেয়েছিলাম কি না, মনে নেই। কিন্তু মার্সেইয়ের জাহাজঘাটা, আর বন্দরের মুখে শাতো দিফের কেল্লা দেখে বড় ফূর্ত্তি হয়েছিল। আনন্দের আতিশয্যে ফরাসী ভাষায় একখানা Monte Cristo অনেক দাম দিয়ে কিনে ফেলেছিলাম। মার্সেইয়ের আর একটা romance আমার মনে গাঁথা ছিল। আমার মাষ্টার ফোশার সাহেব ফরাসী প্রথম ভাগ শেষ করেই আমাকে যত্ন করে La Marseillaise পড়িয়েছিলেন, আর এই গান রচনার গল্প বলেছিলেন। যারা এই শহরে এক শতাব্দী আগে প্রথম মার্সেইয়েজ গেয়েছিল, তাদের কথা বারবার মনে পড়তে লাগল, যখন পারিসমুখো রওয়ানা হলাম। কানে সুরটা বাজছে। সেই "Allons enfants de la Patrie" (স্বদেশ সন্তান, চল সবে আজি, বিজয়ের অভিযানে)-র তালে আমিও আজ পারিস চলেছি। স্বপ্ন কি সুন্দর জিনিস!

পারিস পৌঁছে এক মস্ত হোটেলে আমরা উঠলাম। হোটেলটা দেখলাম ইংরেজে ভরা। তাদের অনেকে আবার ভারত-ফেরৎ সাহেব মেম। এ বেচারারা আমাদিগকে যে খুব স্নেহ আদরের চোখে দেখছিল, তা বোধ হল না। তবে তারা নিজেরাই বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না। একদিকে চৌধুরী সাহেব বৈঠকী মানুষ, খুব জমিয়ে নিয়েছিলেন সকলের সঙ্গে। তার উপর আবার তাঁর পরিচিত এক ইংরেজ-পরিবার সেখানে ছিলেন, তাঁরা সর্ব্বদা আমাদের নিয়েই থাকতেন। এই দলে দুটি খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল।

নেশা অনেকটা কেটে গেছে, বাড়ীর জন্য ভয়ানক মন কেমন করছে। মাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে এসেছি, সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। এ সময় মিসেস্ পালিতের মাতৃস্নেহ না পেলে কি হত বলতে পারি না। হয়ত পালাতাম, ভারত সরকার একজন অতিযোগ্য সিবিলিয়ান হারাতেন!

বিলেতে এসে আমার একটা মস্ত লাভ হল। আস্তে আস্তে কূপমণ্ডূক ভাবটা কেটে গেল। 'প্রথম, আমাদের বাঙ্গালী-সাহেব সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। তাঁরাও যে আমাদেরই মত বাঙ্গালী, ইংরেজী কাপড় পরলেও, ইংরেজীতে কথা কইলেও অন্তরে বাঙ্গালী, এটা বুঝতে পারলাম। তখনকার দিনে বিলেতে সবসুদ্ধ চারশো ভারতীয় লোকের বাস ছিল। তার ভেতরে অতি অল্পসংখ্যক লোক বিলেতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছলেন। বাকী সবাই আমাদের মত কাজ উপলক্ষে এসেছিলেন, কাজ হলেই বাড়ী ফিরে যাবেন। এই চারশোর মধ্যে দেড়শো বাঙ্গালী, দেড়শো পারসী, আর বাকী একশো অন্য সব জাত মিলিয়ে। মহিলারা অধিকাংশ ইংরেজী ঘাঘরা পরতেন। বিলেতে সাড়ী পরে বেড়ান তখনও রেওয়াজ হয় নেই! কিন্তু এই গাউন-পরা ইংরেজীভাষী মহিলারা আমাদের ছেলেছোকরার দলের অত্যাচার নীরবে সহ্য করতেন, ঠিক দেশের সেকেলে গিন্নীদের মতন। সেই নিঃশব্দে একশো দেড়শো সিঙ্গারা কচুরী ভাজা, সেই প্রসন্ন হাসি সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেলে, বিদায়ের সময় সেই সাদর নিমন্ত্রণ, "আবার কবে আসবে সব?" এঁদের জন্যই ত বিদেশকে বিদেশ বলে মনে হত না! বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালীর

মাঝে তখনও তুর্ভেদ্য প্রাচীর ওঠে নেই। পাঞ্জাব-ক্লাব, মান্দ্রাজ-ক্লাব, ইত্যাদিও গজায় নেই। কোন কোন পারসী একটু দূরে দূরে থাকতেন বটে, তা নইলে সকলের মধ্যে বেশ একটা আত্মীয়তা ছিল। Superiority complex যে মোটে ছিল না, তা নয়! বাঙ্গালীদের বুদ্ধির ও সাহেবিয়ানার বড়াই, আর পারসীদের রঙ্গের বড়াই কতকটা ছিল বই কি! সময় সময় "মেড়ো, মেড়ো" শুনে কান ঝালপালাও হয়ে যেত। তবু মোটের উপর বলা যেতে পারে ভেদবুদ্ধি তখনও প্রবল হয় নেই। এমন কি আঞ্জুমান-ই-ইসলামও জাতীয় আদর্শ একেবারে ছাড়ে নেই। অনেকেই নেশনেল লিবারেল ক্লাবে যেতেন। তাঁরা যে খুব প্রচণ্ড লিবারেল ছিলেন বলে এটা করতেন, তা বলা যায় না। ক্লাবটা মোটামুটি সস্তা ছিল, আর সেখানে প্রবেশলাভ করাও খুব কঠিন ছিল না। আমার মুরুব্বী লোকেন পালিত মহাশয় ঐখানেই সন্ধ্যা-বেলাটা কাটাতেন। আমাকেও তুচার বার বিলিয়ার্ড খেলতে নিয়ে গেছলেন। তবে আমার অত সাহেবস্থবো পোষাত না বলে নাম লেখালাম না।

আমার কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করেছিলেন যে আমি গণিতের অধ্যাপক মিঃ এডওয়ার্ড্সের বাড়ীতে থাকব। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় শেষ পর্য্যন্ত আমাকে নিতে পারলেন না। তাই পালিত সাহেব আমার কলেজে থাকারই ব্যবস্থা করলেন। এর পর থেকে কয়েকমাস কলেজের কর্ত্তা রেন সাহেব আমার অভিভাবক হলেন। তিনি আমাদের খুব কড়া রাশে চালাতেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁকেও ঝেড়ে ফেলে

দিলাম। সে পরের কথা। ইতিমধ্যে আমার বোর্ডার-জীবনের দুই একটা গল্প বলি।

তখনকার দিনে ভারতীয় ছাত্রেরা অর্দ্ধেক থাকত আমাদের Bayswater অঞ্চলে, আর অর্দ্ধেক থাকত গাওয়ার ষ্ট্রীটের দিকে। রেনের কলেজটা পাশাপাশি তিনখানা বাড়ী জুড়ে ছিল। সাহেব নিজে পঙ্গু ছিলেন, নড়াচড়া করতে পারতেন না। তাঁর স্ত্রী পরিবার সকাল সন্ধ্যা আমাদের সঙ্গে খেতেন। টিফিনে আসতেন না। দুচার জন বাহিরের ছেলেও আমাদের সঙ্গে টিফিন খেত। রেন পরিবারের এক-জনের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সে তাঁর মেয়ে Dolly। ডলী বাপের সেক্রেটারী ছিল, আপিসের কাজকর্ম্ম সব করে দিত। কর্ত্তাকে আমাদের কিছু বলবার কইবার থাকলে তাকেই মুরুব্বী পাকড়াতাম। সে হাসমুখী সুন্দরী ছিল, সবাই তাকে ভালবাসত। রেন সাহেব নিজেও খুব ভাল লোক ছিলেন। মন বড় সাদা ছিল। কিন্তু বৃদ্ধের গলা কর্কশ আর কথাবার্ত্তা বড় রূঢ় ছিল। আমাদের মাঝে মাঝে হুজুরে ডাক পড়ত, যেতেও হত, কিন্তু আগ্রহ কারও ছিল না। যে দোর দিয়ে আমরা আপিসে ঢুকতাম সেটা সাহেবের চৌকীর পেছনে ছিল। দোরে টোকা মারলেই যে "Come in" জবাবটা পাওয়া যেত, সেটা ঠিক পিস্তলের আওয়াজের মত। কিন্তু ভেতরে যেতেই আগে নজরে পড়ত সেক্রেটারী সুন্দরীর মুখ। সে একটু হেসে, দরকার হলে চোখ টিপে, আসামীকে আশ্বস্ত করত। তার পর কথাবার্ত্তা কতকটা এই রকম চলত। "ডলী, কে এসেছে?" "মিষ্টার

অমুক এসেছেন, বাবা।" "সামনে এস। গুড মর্ণিং। দেখি, তোমায় কেন ডেকেছিলাম।" "বোধ হয় ইতিহাসের পরীক্ষার কথা বলবে বলে।" "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, ডলী। মনে পড়েছে। তুমি ইতিহাসে মন্দ কর নেই, প্রায় সত্তর নম্বর পেয়েছ। তাই বলে যেন আবার মাথায় হাওয়া ভরে না ওঠে। আমি নজর রাখব, বুঝলে ? বেশ করে পড়াশুনো কোরো।"

একদিন হল কি, আমায় ডাক পড়াতে আমি গেলাম সাহেবের কাছে। ভেতরে ঢুকে দেখি ডলী নেই। অকূল সমুদ্রে পড়লাম। আস্তে আস্তে সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাকে ডেকেছিলেন, মহাশয় ?" "হ্যাঁ, ডেকেছিলাম বই কি! এই নাও।" বলে একখানা নিজের ফোটো আমার পানে ছুড়ে দিলেন। আমি ছবিখানা হাতে নিয়ে দেখছি, সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "দেখ বাপু, নিতে ইচ্ছে হয়, ত নাও। নইলে ফিরিয়ে দাও।" এর আমি কি জবাব দেব! আস্তে আস্তে বললাম, "আমাকে এটা দিন। বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব।" "না, না, তাঁকে আমি পাঠিয়েছি। ওটা তোমার। নিতে চাও ত ?" আমি ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম, তিনি সেটা ধরে খুব ঝাঁকানি দিলেন। ভদ্রলোকের জোয়ান বয়সে নিশ্চয় খুব জোর ছিল! সাহেব আমাকে সত্যি একটু ভালবাসতেন। তবে তিনি যাদু, বাছা, বলতে জানতেন না। আর একটা গল্প বলি ওঁর। মাস দুই পরে আমি খবর পেলাম যে আমার মা মারা গেছেন। বিদেশে বিভূঁইয়ে এ রকম খবর পাওয়া কি ভয়ানক, তা সবাই

বুঝবেন। তার উপর আরও মন খারাপ হল এই ভেবে যে, সামান্য যে অশৌচ পালন, সেটাও করতে পারব না। ভেবে চিন্তে কদিন শুধু রুটি মাখন খেয়ে রইলাম। মনকে বোঝালাম, যতটুকু পারা যায় সেই ভাল। কলেজে কাউকে কিছু বললাম না। পরের মেলে রেন সাহেব বাবার চিঠি পেয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি যেতেই খুব কর্কশ-স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "আমাকে বল নেই কেন? আমাকে সব কথা জানান তোমার কর্ত্তব্য, তা জান না? এখানে তোমার জন্য ত আমি দায়ী!" আমি চুপ করে রইলাম। সাহেব ধমকে উঠলেন, "তুমি নিতান্ত বুদ্ধিহীন। এই ঠাণ্ডা দেশে নিরামিষ খাওয়া চলবে না। শরীরের পক্ষে খারাপ।" আমি ধীরে ধীরে বললাম, "আর তিনদিন মাত্র বাকী, মহাশয়। এর মধ্যে আর মাংস খেতে বলবেন না।" সাহেব আমার পিঠে হাত রেখে ভারী গলায় বললেন, "It is hard lines on you, boy!" বলে চশমা মুছতে মুছতে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন। আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম। পরের তিন দিন আমার জন্য অজস্র দামী ফল ও ক্রীম এল। বুঝলাম, কার হুকুমে এসেছে।

পাঠককে ত আগেই জানিয়েছি আমার পলটনে কাজ করার কি রকম সাধ ছিল। বিলেত পৌঁছানর কিছুকাল পরেই সব কাগজে খবর বেরোল যে ব্রেজিলের সুরেশ বাবু মারা গেছেন। ও দিক ত বন্ধ হল। এখন কি করা যায়? একদিন কপাল ঠুকে রেন সাহেবকে আমার দুঃখের কথা জানালাম। তিনি বললেন, "তাতে কি হয়েছে? তুমি

army পরীক্ষা দাও। তা হলে আমাদের বৃটিশ ফৌজেই চাকরী পাবে। আমি আজই ব্যবস্থা করছি।” আমার প্রাণে আশা হল। কিন্তু আশায় ছাই পড়তেও দেরী হল না। সাত দিন পরে রেন সাহেব আমাকে ডেকে, অনেক দুঃখ করে দরদ দেখিয়ে বললেন, “তোমার হুকুম এসেছে। তুমি Army পরীক্ষায় বসতে পার। কিন্তু first (সকলের উপর) হলেও জঙ্গী কলেজে ঢুকতে পাবে না। তোমার জন্য আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।” তার পর একটু গরম হয়ে উঠলেন, “এ সব ঐ হতভাগা Toryদের চালাকী। ওদের মত সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে কি আর এত বড় বাদশাহী চালান যায়!” বলতে ভুলে গেছি যে রেন একজন গোঁড়া Radical ছিলেন। ব্রেজিল গেল, স্যাণ্ডহর্ষ্ট গেল, এখন আমি করি কি? দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে। ভলন্টিয়ার হওয়া যাক। কিন্তু সে পথেও দেখলাম অনেক বাধা। আমার স্যাণ্ডহর্ষ্ট যাওয়ার চেষ্টাতে লোকেন বাবু সায় দেন নাই। কিন্তু ভলন্টিয়ারী করার বিষয়ে তাঁর খুব উৎসাহ দেখলাম। তিনি নিজেও আমার সঙ্গে বন্দুক কাঁধে করবেন বললেন। অনেক খোঁজ খবর নিয়ে Honourable Artillery Company বলে এক নামজাদা অভিজাত পল্টনে নাম দাখিল করার জন্য দরখাস্ত করা হল। স্বয়ং যুবরাজ এই পল্টনের কর্ণেল, আর এদের উর্দ্দী খুব জাকাল। আমাদের দরখাস্ত গ্রাহ্য হল। লোকেন বাবু রীতিমত গোলন্দাজ হয়ে গেলেন, কিন্তু আমার কিছুই হল না। তিন কেতা উর্দ্দীর দাম ও চাঁদা বাবদ প্রায় দেড়শো পাউণ্ড

দিতে হবে। অত টাকা আমি কোথায় পাব! বাড়ীতে চেয়ে পাঠালাম, কিন্তু গরীবের দুঃখ কেউ বুঝলেন না। আমার যুদ্ধ করা হয়ে গেল। ভাল মানুষের মত ব্যারিষ্টারী আড্ডায় নাম লেখালাম।

নাম লেখালাম বটে, কিন্তু প্রাণপণে বিদ্যাচর্চ্চা করতে লেগে গেলাম বললে মিথ্যা কথা হবে। আমার এত রকম ধান্দা ছিল যে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য খুব বেশী সময় পেতাম না। সে সব কথা ক্রমশঃ জাহির করব। আপাততঃ অন্য একটা গল্প করি। সে সময়কার আবহাওয়া সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা আরও পরিষ্কার হবে। কলেজে আমার ম্যাক্ বলে এক বন্ধু ছিল। সে এবার্ডীন হতে দর্শনশাস্ত্রে এম, এ, পাস করে এসেছিল। ধার্ম্মিক প্রকৃতির মানুষ, প্রাণে রস-কস বিন্দুমাত্র ছিল না। একদিন ম্যাকের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি। ভদ্রপল্লী ছেড়ে Portobello Road বলে এক বস্তীর মতন মহল্লায় গিয়ে পড়েছি। সেখানে কুলীমজুরের বাস। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তারা সব মেয়ে ছেলে নিয়ে ফুটপাথে পায়চারী করছে। নানা রকমের ফেরীওয়ালা চারিদিকে ভিড় করে রয়েছে। আমার কাছে পাড়াটা একেবারে নূতন, তাই ঘুরে ফিরে সব দেখছি। এমন সময় একটু দূরে একটা "Shame, shame!" রব উঠল। চেয়ে দেখি একটী ভদ্রলোকের মেয়ে, বছর পঁচিশেক বয়স হবে, খাটো নিকার-বকার পেণ্টুলেন পরে বাইসিকেল চেপে যাচ্ছে, আর দুধারি লোক তাকে দুয়ো দিচ্ছে। ম্যাকও দেখলে। দেখে ঘৃণাভরে বলে উঠল, "Shameless hussy, বেহায়া ছুঁড়ী!" মেয়েটী তাড়াতাড়ি

বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল এই ছোটলোকের ভিড় থেকে। ম্যাকের স্কচ্ রক্ত গরম হয়ে উঠল। আমাকে বললে "Come, let us hoot her, mon—এস, ওকে খুব হুয়ো দেওয়া যাক।" বলে খুব উৎসাহে হাত তালি দিয়ে উঠল। আমি তাকে জোর করে এক হেঁচকা মেরে টেনে নিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরলাম। পথে তাকে বললাম, "ম্যাক্, তুই ভদ্রঘরের ছেলে, ধার্ম্মিক লোক, এ কি ব্যবহার তোর!" মেয়েটার উপর ম্যাকের রাগ তখনও যায় নেই। সে চেঁচিয়ে উঠল, "এই সব নির্লজ্জ ছুঁড়ীদের প্রশ্রয় দিলে ধর্ম্মই বা থাকবে কোথায়, ভদ্রঘরই বা থাকবে কি করে? ভেবে দেখ, এরাই ভবিষ্যৎ বৃটনের মাতৃকুল!" এই রকম কত কি বক্তৃতা করলে। আমি নির্ব্বাক হয়ে গেলাম। দেশ ছেড়ে এসেছি বটে, কিন্তু পবিত্র সনাতনী ভাব এখানেও ধাওয়া করেছে। বাস্তবিক, ইংলণ্ডের লোকের মনে তখনকার দিনে একটা মস্ত সমস্যা ছিল যে স্ত্রীলোকের ঘাঘরা কত লম্বা হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে অনেক গান ছড়া মনে আসছে, বাহুল্য ভয়ে পাঠককে উপহার দিতে পারছি না। বেচারা ম্যাক্ এখনও বেঁচে আছে কি না, জানি না। থাকে ত তার মেয়েদের আজানুলম্বিত গাউন দেখে কত না মনে কষ্ট পাচ্ছে! তার পর ভেবে দেখুন, আমাদের কালে বিলেতে মেয়ে পুরুষ এক ঘাটে কখনও স্নান করত না। যারা খুব রসিক পুরুষ, তারা তাই স্নান করতে Trouville এ যেত। আজ সে সব গোলযোগ নেই। ম্যাকের মেয়েরা হয়ত স্নানের পোষাক পরে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বালির উপর বসে টিফিন খাচ্ছে। একটা কথা বলি—কেউ

রাগ করবেন না। উনিশ শতকের ইংরেজ মেয়েরা কাপড় পরত অঙ্গ, শুধু অঙ্গ নয় অঙ্গের গড়ন পর্য্যন্ত, ঢাকার জন্য। সে বিদ্যাটা তারা খুব রপ্ত করেছিল। সেই গোড়ালী পর্য্যন্ত লম্বা বেঢপ ঘাঘরা, আর গায়ে একটা ততোধিক বেঢপ লম্বা কোট, পরলে সব মেয়েমানুষকেই Mrs Grundy-র মতন দেখাত। আর আজ, আমাদের এই সভ্য ভব্য Grundy মেম সাহেবটা গেলেন কোথায়! না, তিনিও খাটো চুল কেটে, খাটো পোষাক পরে অঙ্গের অনুপম গঠন দেখাবার জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেড়াচ্ছেন?

আমাদের কলেজে কড়া নিয়ম ছিল, রাত নটার ভেতর বাড়ী ফিরতে হবে। নটার সময় রোজ ভেতর থেকে দোরে খিল পড়ত। কেউ ঘণ্টা বাজালে, বুড়ো খানসামা হোপ দোর খুলে দিত। দিয়ে গম্ভীরভাবে বলত, "মশায়, কাল আপনার নামে রিপোর্ট করা আমার কর্ত্তব্য, তা আপনি জানেন!" অধিকাংশ সময় কিন্তু রিপোর্ট করাটা হয়ে উঠত না। হোপ বুড়োর এই থেকে একটা বাঁধা আয় ছিল। তবু মাঝে মাঝে সে বেঁকে দাঁড়াত, আর অধর্ম্ম করবে না! তখন কিছুদিন আমাদের গবাক্ষপথে প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হত। হোপ লোকটা বড় ভাল ছিল। দিনের বেলায় খুব গম্ভীর গজেন্দ্র গমনে চলাফেরা করত। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় যখন দোর খুলে দিতে আসত, তখন মুখে বেশ একটা রঙ্গীন ভাব দেখা যেত। এমন কি, কখন কখন দাঁড়িয়ে দু পাঁচ মিনিট হালকা খোশগল্পও করত। আগেই বলেছি Wren গিন্নী আমাদের সঙ্গে টিফিন খেতেন না। টিফিন ব্যাপারটার

অধ্যক্ষ ছিল মিষ্টার হোপ। তার "Luncheon is on the table, young gentlemen," বলার কায়দা কি! আমরাও যথাসম্ভব তার মর্য্যাদা রক্ষা করতাম। টেবিলে বেশী গোলমাল করতাম না। কিন্তু একবার হল কি, দিন কয়েক ধরে বড় খারাপ মাংস টিফিনের টেবিলে আসতে আরম্ভ হল। হোপকে বারবার বলেও কোন ফল হল না। তখন একদিন আমাদের দলের চাঁই M. তার মাংসের প্লেটটা তুলে নিয়ে জানালা পর্য্যন্ত কাওয়াজ করে গিয়ে, "Here goes," বলে বাহিরে ফেলে দিলে ছুঁড়ে। আমরা বাকী সবাই দাঁড়িয়ে উঠলাম, হুররে বলে! হোপের মুখে কথা সরল না। দুবার তিনবার Sir, Sir, করে বুড়ো বেচারা কেঁদে ফেললে। কত বড় বড় ঘরে কাজ করেছে সে! এ রকম অপমান তার স্বপ্নের অগোচর। কিন্তু জগতের গতিই ত এই! অত্যাচার অবিচার তিলে তিলে জমে যখন একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন মানুষ ভব্যতার মুখোস খুলে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে দাঁড়ায় প্রতিবিধানের জন্য। M.এর অসমসাহসিক কাজের ফলে কিন্তু কেলেঙ্কার হল অশেষ রকমের। প্রথম, আমাদের সবাইকে গাঁটের পয়সা খরচ করে টিফিন খেতে হল বাহিরে কাফীখানায়। দ্বিতীয়, হোপ চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এক চিঠি লিখলে মনিবকে। তৃতীয়, চায়ের পর আমাদের সবায়ের ডাক পড়ল বড় সাহেবের কামরায়। রোষ্ট মাংসের চাঙ্গড়াটা আনা হল সেইখানে। M. রেন সাহেবকে সেটা দেখিয়ে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা করলে। বক্তৃতার শেষ বাক্য, "The article is more useful as a geological

specimen than as human food." সাহেব কোন রকমে হাসি থামিয়ে বললেন, "Shut up. Go away, you greedy fellows." এর পর থেকে কিন্তু টিফিনে মাংস খুব ভাল আসতে লাগল। আমরা চাঁদা করে হোপকে এক গিনি বকশীশ দেওয়াতে সে ইস্তফা পত্র ফিরিয়ে নিলে। গোল মিটে গেল। তবে Wren গিন্নী দিন দুই তিন খুব মুখ ভার করে রইলেন। ডলী আমাদের খুব ধমকালে, "তোমরা মাকে না বলে হোপের উপর জুলুম করতে গেলে কেন?" M ছোকরা বড় জ্যাঠা ছিল—সে বলে উঠল, "সুন্দরী, তোমার চরণে আমরা সবাই হেঁট মাথা হয়ে মাপ চাচ্ছি।" অনেক বছর পরে এই M-কে বেঁটে মোটা, গাল-ফুলো, কমিশনার সাহেব রূপে দেখে সমস্ত গল্পটা মনে পড়ে গেছল। বহু কষ্টে হাসি চেপেছিলাম।

আমি লণ্ডনে গিয়েই কলেজে বোর্ডার হয়ে গেলাম বলে স্বদেশী বন্ধুবান্ধব জুটতে একটু দেরী লাগল। পালিত, চৌধুরী, সিংহ সাহেব প্রভৃতি বয়স্থ লোকের সঙ্গে প্রথমেই আলাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁদের কাছে ঘেঁসতে সঙ্কোচ হত। অবশ্য মিসেস পালিতের কাছে লুচী পোলাও খেতে সময় পেলেই দৌড়তাম। আমার এক বাল্যবন্ধু শীল মেডা ভেলে এক ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। তাঁরা ধর্ম্মে ক্যাথ-লিক ছিলেন, আর ইউরোপের অন্যান্য ক্যাথলিক জাতের মতই খুব মিশুক ছিলেন। তাঁদের বাড়ী বহুকাল পর্য্যন্ত ফি শনিবারেই যেতাম। গেলে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আস-তাম। গিন্নী প্রথম দিনই বলে দিয়েছিলেন, "এ তোমার বন্ধুর

বাড়ী। এখানে ঘরের ছেলের মত যাওয়া আসা করবে।” এক রকম ঘরের ছেলের মতনই হয়ে গেছলাম। এঁদের বাড়ীতে বিলিয়ার্ড টেবিল ছিল, আর বেশ একটি বাগান ছিল। কাজেই সময় সহজেই কেটে যেত। অন্য পাঁচজন ভদ্রলোকের যাওয়া আসাও ছিল। কখন কখন বাগানে চা-পার্টি হত। এখানে নিয়মিত গিয়ে ইংরেজ ভদ্রসমাজে মেশা অভ্যাস হয়ে গেল। নইলে প্রথম প্রথম লজ্জা করত বই কি! আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর মুস্কিলই ত ছিল ঐখানে। অনেকে Miss Manningএর বিখ্যাত N. I. A-র সান্ধ্য সম্মিলনীতে যেত। সেখানে যত হোমরা চোমরা ভারত-ফেরত ইংরেজ জমায়েৎ হতেন, আর প্রাণ ভরে তাদের পিঠ চাপড়াতেন। বন্ধু শীলের বাড়ীতে সুবিধা এই ছিল যে কালা আদমী বলে কেউ হেনস্তাও করত না, পিঠও চাপড়াত না।

অল্পদিনের মধ্যে Summer (গ্রীষ্ম) এসে পড়ল। এই Summer-ই এদের যথার্থ মধুঋতু। Spring-এর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর! আকাশ পরিষ্কার। চারিদিকে যেন ফুলের মেলা লেগেছে। পার্কে, বাগানে, সর্ব্বত্র দলে দলে লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকলের মুখে হাসি। দীর্ঘ বেলা, সাড়ে আটটা নটা পর্য্যন্ত বাহিরে আলো। দৈনিক কাজ কর্ম্ম সেরে মানুষ অনেকক্ষণ আমোদ আহ্লাদ করে ঘুরে বেড়াতে পারে। এই তিন মাসের ইংরেজ, আর বাকী ন মাসের ইংরেজে অনেক তফাৎ। তবে এ সব সেকালের কথা। তখনও ইংরেজী সমাজ neurosis-এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নেই। তখন এদের ধাত ছিল phlegmatic (কফপ্রধান)। বায়ুর প্রকোপ ছিল না।

আমাদের কলেজ তিন হপ্তার জন্য বন্ধ হল। আমি পাড়া গেঁয়ে ছেলে। বিলেতের পাড়াগাঁ দেখার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছিলাম। রেন সাহেব আমাকে ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দিলেন টেম্‌স্ পারে গোরিং বলে এক গ্রামে। সেখানে পেনী নামে এক farmer (কৃষক) ছিল। সে গোঁড়া লিবারেল ছিল, তাই রেন তাকে বড় শ্রদ্ধা করতেন। তার বাড়ী তিন হপ্তা থাকব ঠিক হল। আমার বিলেত সম্বন্ধে জ্ঞান এত কম ছিল যে ফার্ষ্ট কেলাসের টিকিট কিনে রওয়ানা হলাম। ঐ পথেই উইণ্ডসারের রাজবাড়ী। কাজেই গার্ড সাহেব ধরে নিলেন যে আমি সাম্রাজ্ঞী সন্দর্শনে যাচ্ছি। আমি বুঝিয়ে বললাম যে কোথায় যাচ্ছি। তবু সেলামের ঠেলায় অস্থির হয়ে উঠতে হল, আর বকশীস বাবৎ মব্‌লক পয়সা বেরিয়ে গেল। গোরিং ষ্টেশন পৌঁছতেই গার্ড স্বয়ং জিনিস-পত্র নামিয়ে দিয়ে ষ্টেশন-বাবুকে বলে দিলে, "ইনি পেনীর ফার্মে (খামারে) যাবেন। গাড়ী ডাকিয়ে পাঠিয়ে দিন।" গাড়ী কোথায় পাবে বেচারা! ট্রেন বেরিয়ে গেলে বললে, "আপনি একটু বসুন, আমি ফার্ম থেকে গাড়ী আনাচ্ছি।" এমন সময় আমি দেখলাম যে এক টাকমাথা, টুকটুকে লাল মুখ, সাদা দাড়ী, গোঁফ কামান, বুড়ো দাঁড়িয়ে রয়েছে টিকিট ঘরের কাছে। আমাদের হোপের মত দেখতে, শুধু পোষাক আলাদা। পায়ে গেটার, গায়ে চৌখুপী কম্বুলে কাপড়ের লম্বা কোট, টুপীটা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছে। আমি এগিয়ে গিয়ে ভরসা করে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি ফার্মার পেনী, না? গুড মর্ণিং, আমি এসেছি।" বুড়ো

আমার হাতটাকে খুব নাড়া দিয়ে বললে, "আপনি মিষ্টার রেনের বিদেশী বন্ধু, না? আসতে আজ্ঞা হোক।" মুটের মাথায় জিনিস তুলে দিয়ে চললাম ফার্মের পথে।

ফার্ম দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। এর নাম চাষার খামার বাড়ী! ফটক থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত লাল কাঁকরের রাস্তা, দুধারে আপেল বাগান। বাড়ীটী ঝকঝকে নূতন, পেনী নিজে মজুর লাগিয়ে তৈরী করেছে। হল-এ ঢুকেই ডান দিকে আমার বসবার ঘর! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাবু-লোকের ব্যবহারের উপযোগী আসবাব-পত্র দিয়ে সাজান। বাঁ দিকে রান্নাঘর। পেনী-পরিবার সেইখানে খাওয়া দাওয়া করে। রান্নার চুলো, বাসন-কোসন, টেবিল, তাক, সব তকতক করছে। আমাদের হিঁদু বাড়ীর রান্নাঘরও এককালে এই রকম ঝকঝকে পরিষ্কার ছিল। এখন আর নেই। সে কথা যাক। পেনীর রান্নাঘরের অধিষ্ঠাত্রী বেরিয়ে এলেন মেয়েদুটীকে নিয়ে। তিনজনেই অতিথিকে খাতির করবার জন্য পরিষ্কার ছিটের গাউন পরে রয়েছেন। গিন্নী আমাকে অভ্যর্থনা করে বললেন, "আপনি আসবেন শুনে আমাদের বড় আনন্দ হয়েছিল। আমরা কখনও বিদেশী ভদ্রলোক দেখি নেই। যা দরকার, চেয়ে চিন্তে নেবেন।" মেয়েরা বললে, "আপনার জন্য আমরা কেক তৈরী করছিলাম। আপনি কেক খান ত?" দেখলাম এরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে আমি সাধারণ ইংরেজ ছেলের মতই খাই দাই, থাকি। যতটা পারি অভয় দিলাম। আমার শোবার ঘর দোতলায়। সে ঘরেরও সাজসজ্জা দেখলাম

সাদাসিধে কিন্তু পরিষ্কার। তার পর মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে সমস্ত ফার্ম দেখে এলাম। তখন ক্ষেতে কিছু শস্য ছিল না বটে, কিন্তু ফলবাগান ফলে ভরা। বড় বড় গরু রয়েছে গোয়ালে। অজস্র হাঁস, মুরগী, পেরু। কিন্তু সব চেয়ে তোয়াজ দেখলাম শূয়োরের। সে শূয়োরের সঙ্গে আমাদের দেশের ঐ নামের নোঙ্গরা জন্তুগুলোর তুলনাই হয় না। এদের শূয়োরগুলো যেন মোটা মোটা প্রকাণ্ড খরগোস। নানারকম রঙ্গের, আর কি পরিষ্কার! আমাদের গরুর গাও এত পরিষ্কার নয়। বসে বসে বিট, গাজর, শালগম, এই সব খাচ্ছে। মেয়েরা বড়াই করে বললে, "আমাদের ফার্মের হ্যাম বেকন খেয়ে দেখবেন। এ রকম লণ্ডনেও পাওয়া যায় না।" সব ঘুরে ফিরে এসে সে দিন পেনী গিন্নীর কাছে চা খেলাম। মা মেয়েরা তিনজনেই চমৎকার সরল, যেমন চাষার মেয়ে সব দেশেই হয়। চকোলেট কেকটা সাদা সিধে কিন্তু সুন্দর লাগল। Home-made কেকের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। সন্ধ্যার সময় পেনীর ছেলে এল। সে বিয়ে-থা করে গাঁয়ে মুদীর দোকান করেছে। দোকান-ঘরের দোতলায় থাকে। বাপ মার সঙ্গে খুব ভাব। তবু আলাদা থাকে কেন, তখন বুঝতে পারি নেই। ক্রমশঃ জানলাম, এই ও দেশের প্রথা। প্রথাটা নিতান্ত মন্দ নয়। গোরিং গাঁটী খুব ছোট। তবে ইস্কুল আছে, গির্জ্জা আছে, ডাকঘর আছে। ডাকঘরের আলাদা বাড়ী নেই। এক মেঠাইয়ের দোকানে ডাক-আফিস, আর সেই দোকানওয়ালী ডাক-মাষ্টার।

পরদিন আমার এক বন্ধু লণ্ডন থেকে এলেন। দুজনে গ্রামে গিয়ে ক্রিকেট খেলার বন্দোবস্ত করে এলাম। চারিদিকের ফার্মের মজুর ছোকরারা গাঁয়ের গোচারণ মাঠের এক কোণে খেলত। তাদের খেলার সরঞ্জাম একটু মেঠো রকমের ছিল। আমরা এই ছোকরাদের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে রেডিং থেকে নূতন ব্যাট, বল, সব আনালাম। যত দিন ছিলাম, এদের সঙ্গে প্রায় রোজ ক্রিকেট খেলতাম। খেলার প্রয়োজনও যথেষ্ট ছিল। ফার্মের তৈরী হ্যাম বেকন, তাজা ডিম, তাজা মাখন ক্রিম, সামনে পেয়ে লোভ সংবরণ করা সম্ভব ছিল না। কাজেই একটু ব্যায়াম না হলে চলে কি করে! আমরা ডাকঘর থেকে এক এক ঠোঙ্গা মেঠাই কিনে রোজ গ্রাম প্রদক্ষিণ করতাম, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ভাব করার জন্য। দু চার দিনেই তাদের সঙ্গে খুব আলাপ জমে গেল। আর এক নিয়ম আমরা করেছিলাম। গ্রামের থেকে কাউকে না কাউকে রোজ ডিনার খেতে ডাকতাম। স্ত্রীলোক কেউ এলে মিসেস পেনীও বসতেন। কিন্তু প্রধানতঃ পুরুষরাই আসত। এই রকমে চাষা, কারীগর, দোকানদার, সকলের সঙ্গেই কতকটা ঘনিষ্ঠতা হল। একদিন আমাদের ফার্মার পেনীও খেলেন! এমনি ত আমরা প্রায়ই রান্নাঘরে টিফিন খেতাম! তখন পেনীরা নিত্যকার পোষাকেই বসতেন। কিন্তু মিঃ পেনী যে দিন খানা খেতে এলেন, সে দিন লম্বা কালো কোট, শক্ত খাড়া কলার, কালো বার্ণিস-করা জুতো, এই সব পরেছিলেন। বোধ হয়, ভদ্রলোকের বিয়ের সময়কার কাপড়, গায়ে বড্ড

আঁট হয়ে বসেছিল। নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছিল। কেন না, খাওয়ার পর ঝাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে কাপড় বদলে রোজকার Corduroy পরে এসে, তবে সুস্থির হয়ে পাইপ ধরিয়ে বসলেন। গল্প করতে করতে যখন শুনলেন যে আমি বাঙ্গালী হিন্দু, তখন বললেন, "তা হলে ত আপনার একটা জিনিস দেখা উচিত। এখান থেকে পাঁচ কোশ দূরে এক বড় ইঁদারা আছে। তার নাম Rajah's Well। বাঙ্গালা দেশের রাজা সেই ইঁদারা করে দিয়েছেন। আমরা বললাম, "চলুন না, কালই যাওয়া যাক সেখানে।"

পরদিন গেলাম সেই কুয়ো দেখতে। পেনী গিন্নী নোনা শূকর মাংস, রুটি, মাখন, পনীর, বেঁধে দিলেন সঙ্গে। ফার্মার বলেছিল পাঁচ কোশ পথ। কিন্তু তের-চৌদ্দ মাইলের এক হাত কম হবে না। চাষাদের কোশ-জ্ঞান দেখছি সব দেশেই এক রকম! যাই হোক, বুড়ো হাঁটল কিন্তু সমানে আমাদের সঙ্গে। বেলা বারটায় আমাদের গন্তব্য গ্রামে পৌঁছলাম। খোঁজ নিয়ে কুয়োর কাছে গেলাম। দেখি, সে এক বিরাট ব্যাপার। চূড়োওয়ালা সুন্দর হাওয়া-খানা। তার ভেতর বসবার বেঞ্চি পাতা। মাঝখানে এক গভীর ইঁদারা। শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা রয়েছে যে কাশী-নরেশ ঈশ্বরীপ্রসাদ এই ইঁদারা বেঁধে দিয়েছেন। চৌকীদার এলে তার কাছ থেকে এক ছোট বই ও গোটাকয়েক মেডেল কিনলাম। বই থেকে ইতিহাস জানা গেল। এই গ্রামের এক সাহেব সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজের কিছু উপকার করেছিলেন। মহারাজ

পুরস্কার দিতে গেলেন, কিন্তু ভদ্রলোক নিলেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর এত দূর রাজী হলেন যে পরে তাঁর কিছু অভাব হলে জানাবেন। কিছুকাল পরে নিজ গ্রামে ফিরে ভদ্রলোক দেখলেন যে সেখানে বড় জলকষ্ট। মহারাজকে জানালেন। তিনি অনেক খরচ পত্র করে, তাঁর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন, এই ইঁদারা করে দিলেন। আমরা বেঞ্চে বসে ভোজন সেরে নিলাম। জল বড় মিষ্টি লাগল। লাগারই কথা। ও জলের সঙ্গে যে ভারতের হৃদয়ের যোগ আছে!

৯

বিলেত সম্বন্ধে রঙ্গ চড়িয়ে প্রবন্ধ লেখা আমার পক্ষে বড় কঠিন। ও দেশের সভ্যতা কখনই তেমন রপ্ত করতে পারি নেই। পারি নেই বলেই, হয়ত, আমার মনের ভাব কতকটা সেই কথামালার আঙ্গুর-লুব্ধ শেয়ালের মতন। কপালের জোরে ও আঙ্গুরে অনেকেই মিষ্ট রস পেয়েছেন। আমি সে রসে বঞ্চিত।

তবু পাঠক যেন দয়া করে ধরে নেবেন না যে আমার মনের অবস্থা, "যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা।" সাহেবদের অনেক গুণ আমার টেরা চোখকেও এড়াতে পারে নেই। সেগুলোর কথা অবশ্য বলব। তবে সেখানেও গলদ অনেক। আমি যা দেখেছিলাম, সে সব ত আজ নেই। শুনতে পাই, ইংরেজ তার সাবেক রোষ্ট বিফ ও বিয়ারের সভ্যতা ছেড়ে snacks and cocktail-এর পন্থা নিয়েছে।
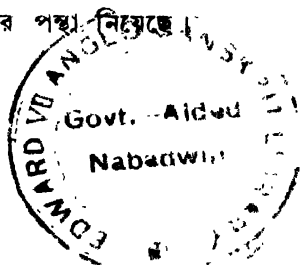
Snacks and cocktail-এর বাঙ্গালা তরজমা করতে পারলাম না। চাট ও মদ বললে অনেকে চটবেন। মোটের উপর, বোধ হয়, আমার এখনকার কথা বেশী কিছু না বলাই ভাল, কেন না পুরানো মানুষ পুরানো কথা লিখতে বসেছি।

আমাদের কালে ইংরেজ সত্যিই Punch পত্রিকার জন বুলের মতন ছিল। পোষাকের কথা বলছি না, কারণ ও পোষাক তখন চলে গেছে। কিন্তু চরিত্রে বিশেষ কিছু তফাৎ হয় নেই। একটু বুদ্ধিহীন, একটু হাঁদা, আর পুরোদস্তুর একগুঁয়ে। চটক নেই, লম্বা লম্বা বচন ঝাড়ে না, তবে এক কথার মানুষ। তাদের বাড়ী ঘর দোর, তাদের সমাজ, তাদের রাষ্ট্র, সব নিরেট পোক্ত ভিতের উপরে তৈরী। তোতাবুলি দরকার মত আওড়ায়, কিন্তু হুজুগে পড়ে নিজের নাক কান কাটে না। এক কথায় অজ-bourgeois, বিংশ শতকের জুজু !

কিন্তু এই ইংরেজকে আমার ভাল লেগেছিল। এদের ঘর-বাড়ী ছিল। এরা হোটেলে হোটেলে ঘুরে ব্যাঙের ভালে খানা খেয়ে বেড়াত না। আড্ডায় আড্ডায় নিত্য নূতন উত্তেজনা খুঁজে বেড়াতে হত না। এদের সত্যি বনেদী ঘরে পর্য্যন্ত কতকটা ছা-পোষা গেরস্তের ধরণ-ধারণ ছিল। বাড়ী ছিল, বাড়ীর উপর টান ছিল, তাই এদের অতিথি-সৎকারও আশ্চর্য্য সুন্দর ছিল। খানার টেবিলে গিন্নী সামনে একটা হাঁড়ী নিয়ে বসে সুরুয়া পরিবেশন করতেন, কর্ত্তা রোষ্ট মাংসের চাঙ্গড়া থেকে বেছে বেছে ফালি কেটে সবায়ের পাতে দিতেন। চায়ের টেবিলে অতিথির জন্য একটা না একটা

কিছু ঘরের মেয়েদের তৈরী খাবার থাকত। আমাদের ছেলেবেলা থেকে পরিচিত একটা স্বচ্ছতা, আনন্দের ভাব, সে দেশেও সর্ব্বত্র দেখতে পেতাম।

কলেজে রেন-গিন্নী স্বয়ং চা ঢেলে দিতেন, স্বরুয়া পরিবেশন করতেন, প্লেটের উপর খাবার তুলে দিতেন। আমার ব্যারিষ্টারী আড্ডায় (Gray's Inn) চার চার জনে এক এক Mess করে খেতে বসতে হত। তার মধ্যে একজন হত কাপ্তান। সেই অতিথি-সৎকারের অভিনয় করত। নিতান্ত ভেটেরাখানা না হলে চাকর দিয়ে খাবার পরিবেশন হত না। অবশ্য রাজা-রাজড়ার কথা আলাদা। তাঁদের বাড়ীতে কি হত, আমি কোথা থেকে জানব!

নিত্যকার ব্যবহারেও ইংরেজ ভদ্রলোকের আদব-কায়দা আমার বড় ভাল লেগেছিল। ফরাসীদের মতন কথায় কথায় মাথা নীচু করা কি টুপী তোলা, চোস্ত জবানে আলাপ করা, এদের না থাকলেও একটা গম্ভীর নির্ব্বাক খানদানী চাল সব কাজে দেখা যেত।

ইংরেজের আর একটা গুণ নিতান্ত অন্ধ ছাড়া সবাই দেখতে পেত। সেটা ওদের অসাধারণ দৈহিক সৌন্দর্য্য। ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশু র্মহাভুজঃ, আমাদের কাব্যেই আছে, ঘরে নেই। ওদের ভদ্রসমাজে কিন্তু শতকরা পঁচিশ জনের বেলা ঐ বর্ণনা খাটে, অন্ততঃ আমার সময়ে খাটত। তাদের পাশে আমাদের অধিকাংশ কৃষ্ণকায়কে হাস্যাস্পদ দেখাত, বিশেষ করে যখন আখাড়ায় কি সমুদ্রের ধারে গা খুলতে হত। এমন কি জার্ম্মান ও ফরাসী সাহেব যারা সব

রকমে ইংরেজের সমকক্ষ, তারাও এ বিষয়ে ইংরেজের তুলনায় অনেক নিরেস। কেন যে এমনটা হয়েছে বলা শক্ত। অনেক ইংরেজের মুখে শুনেছি যে এই দৈহিক আদর্শ তারা সাবেক গ্রীকদের কাছ থেকে পেয়েছে। কিন্তু এত লোক থাকতে শুধু এরাই গ্রীক আদর্শ পেলে কোথা থেকে।

আমি ত ইংরেজের রূপ নিয়ে এতটা উৎসাহ দেখাচ্ছি, কিন্তু একজন সাহেব নিজে কি বলে গেছেন সেটাও প্রণিধান-যোগ্য। সেকালের নামজাদা মুসাফের লিভিংষ্টোন সাহেব কাফ্রীদেশের জুলুদের দেখে লিখে গেছেন, এদের শরীরের গড়ন এত চমৎকার যে এদের সাক্ষাতে পোষাক খুলতে আমার ভয়ানক লজ্জা বোধ হয়।

পুরুষের কথা যখন এত বললাম, মেয়েদের কথাও কিছু বলতে হয়। তবে আমার ঘাড়ে একটা বই মাথা নেই। কালো চোখের সঙ্গে নীল চোখের তুলনা আমি করতে পারব না। কালো কুন্তলের সঙ্গে লাল হলদে কুন্তলের তুলনা করতে আমি অক্ষম! কবির কথায়, "তোমরা সবাই ভালো"। তবে এইটুকু শুধু বলব, যে সে যুগের ইঙ্গসুন্দরীদের চলা-ফেরাতে একটু আড়ষ্ট ভাব ছিল, একটু যেন কমনীয়তার অভাব নজরে পড়ত। এ বিষয়ে তাঁরা ফরাসী সুন্দরীদের চেয়ে অনেক খাটো ছিলেন। তেমনই complexion বা চামড়ার সৌন্দর্য্যেও ইংলণ্ডীয়ারা হার মানতেন। ছোট জাতের ফরাসিনীদের চামড়াও এদের চেয়ে বেশী চিকন মোলায়েম ছিল। এ কথা সবাই নাও মানতে পারেন। যাঁদের চোখে চামড়ার রঙটাই সব, তাঁরা অবশ্য ইংরেজকে

prize দেবেন, কেন না বেশীর ভাগ ফরাসিনীর রঙ্গ ঠিক সাদা নয়, খুব ফিকে একটু গজদন্তের আভা আছে। বর্ণ-সম্বন্ধে আমার নিজের মতামত কতকটা কাফ্রীদের মতন। বিকট সাদা রঙ্গ আমি দেখতে পারি না। তার চেয়ে নিখুঁত কালোও আমার ঢের ভাল লাগে। যখনই ইংরেজের সঙ্গে গা খুলে ঘুরেছি, তখনই মনে হয়েছে যে ওদের ঐ সুন্দর সুঠাম শরীর আরও কত সুন্দর হত যদি অমন ফ্যাকফেকে সাদা না হত। রোদে পুড়ে ওদের মুখের রঙ্গ কেমন চমৎকার হয়ে যায়, গাটা কেন হয় না!

কি কথা বলতে কোথায় এসে পড়লাম। স্ত্রীলোকের রূপের কথা হচ্ছিল। সে সৌন্দর্য্যের আদর্শ যুগে যুগে বদলে যাচ্ছে। মরালগামিনী বললে এখন আর, বোধ হয়, কোন অর্থবোধ হয় না। চকিতনয়নী কথাটাও লোপ পেয়েছে, কেন না আর ত কেউ চকিত হয় না! লতার মত দেহযষ্ঠি, সেও আর শোনা যায় না। এক রইল লাঠির মত দেহযষ্ঠি। সেটা যে যায় নেই, তা আমরা পথে ঘাটেই দেখতে পাই। বিলেতের কথা বলছি, সুতরাং এদেশের কেউ রাগ করবেন না।

রূপের কথা বলতে গেলে এটা ভুললে চলবে না, যে সভ্যজগতে রূপ অনেকটা বেশ-প্রসাধনের উপর নির্ভর করে। আমার সময়ে পুরুষের কাপড় এক ইংরেজ দরজীরাই কাটতে জানত। তেমনই আবার মেয়েদের কাপড় পারিস ছাড়া কোথাও হত না। ভিয়েনাতে কতক কতক হত। এ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। যখন মার্কিন আর স্পেনে লড়াই বাধল, আর স্পেনের রাজা হেরে যেতে লাগলেন, তখন তাঁর

উপর ফরাসীদের দরদ উথলে উঠল। পারিসের খবরের কাগজগুলো দিবারাত্র পৃথিবীকে এই বোঝাতে লাগল, যে ভুঁইফোড় মার্কিনরা জবরদস্তী করে একটা নির্বিরোধী বনেদী বংশের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে, আর তাদের বেইজ্জৎ করছে। মার্কিন কাগজগুলো চটে ফরাসীদের শাসাতে আরম্ভ করলে, যে পারিস শহরের দরজীরা মার্কিন অন্নে পরিপুষ্ট, এইবার তাদের জব্দ করব, আমরা ভিয়েনাতে কাপড় করাব। ফরাসী কাগজওয়ালারা পালটা জবাব দিলে, যে মার্কিনীদের যা গড়ন, ওদের গায়ে কাপড় বসান পণ্ডশ্রম, মজুরী পোষায় না। যা-হোক এ সব অসভ্য কথা কাটাকাটির কোন ফল হল না, কেন না যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার কিছু দিন পরেই মার্কিন সুন্দরীরা কাপড় করাতে দলে দলে আবার পারিসেই দৌড়া-দৌড়ি আরম্ভ করলেন। ভিয়েনার কিছু সুবিধা হল না।

আমার নিজের গল্প আবার ধরি। শরৎকালে মাস চারে-কের জন্য কলেজ বন্ধ হয়। ছুটিটা কোথায় কাটাব, এই নিয়ে নানা জল্পনা করতে লাগলাম। বাবার পরিচিত এক ইংরেজ পরিবার নিমন্ত্রণ করলেন, তাঁদের কাছে দূর পাড়াগাঁয়ে মাসখানেক কাটাবার জন্য। কিন্তু যেতে সাহস হল না। বিলেতে বসে ইঙ্গ-ভারতীয় আবহাওয়া সহ্য করতে পারব কি না, কি বলতে কি বলে ফেলব, তারাই বা কি ভাববে, কাজ নেই, ভেবে নিমন্ত্রণ নিলাম না। ফরাসী ভাষা শিখ-ছিলাম, সেটা রপ্ত করার মতলবে পারিস চলে গেলাম। কপাল জোরে এক মধ্যবিত্ত ফরাসী পরিবারের মাঝে থাকবার সুযোগ মিলল। খুব ভাল লাগল। তাদের আত্মীয় স্বজন

অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল। মোটের উপর দেখলাম, যে ফরাসীদের চাল-চলন একটু একটু আমাদের মতন। হো হো করে হাসে, চেঁচিয়ে কথা কয়, ভুঁড়ি দুলিয়ে চলে, পেটুকের মত খায়। কালো সাদার ভেদজ্ঞান ওদের ইংরেজের মত প্রখর নয়। ইংলণ্ডে আমরা রাস্তায় বের হলে যেমন সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকত, ছোঁড়াগুলো 'Blackie, Blackie,' বলে চেঁচাত, পারিসে তা মোটে দেখি নেই। দক্ষিণ ফ্রান্সের কি স্পেনের অনেক লোকের মুখের রঙ্গ এত কালো বা পাট-কিলে, যে হঠাৎ তাদের সঙ্গে ভারতীয় লোকের তফাৎ বোঝা যায় না। তাই, বোধ হয়, আমাদিকে ততটা আজগুবি দেখাত না ওদের চোখে। তবে সহ্যের একটা সীমা আছে ত! একদিন এক দল কাফ্রী মুসলমান তাদের স্বদেশী পোষাক পরে সরকারী বাগানে বেড়াচ্ছিল, আর খুব হাল্লা করে নিজের ভাষায় কথা কইছিল। এক দল রাস্তার ছোঁড়া খানিকক্ষণ চেয়ে দেখলে, তার পর তাদের পিছু নিলে, আর হাততালি দিয়ে 'boule de neige' (snow ball) বলে ঠাট্টা করতে লাগল। কাফ্রীরা চুপ করে গেল।

ইংলণ্ডেও যে আমাদের অপমান করবার ইচ্ছাতে কালা বলে ডাকত, তা আমার মনে হয় না। অত বড় সাম্রাজ্যের মালিক হলেও, ইংরেজের তখনকার দিনে বড্ড কুনো ভাব ছিল। একটা কিছু আজগুবি দেখলেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। বোধ হয়, বুঝতও না যে ওটা অভদ্রতা। আমাদের কেউ কেউ কিন্তু এতটা না বুঝে ভয়ানক চটে উঠতেন। সিং বলে আমার এক বিশালকায় বন্ধু ছিল। অত্যন্ত ভাল মানুষ।

ইংরেজী বেশী বলতে পারত না। জিমিদার ঘরানার আওলাদ, মেট্রিক কোনক্রমে পাস হয়েছে, ইজ্জৎকে নিয়ে তার লায়ার হওয়ার খাহেশ, নইলে ঘরে টাকার অভাব নেই। দুজনে আমরা রাস্তা দিয়ে চলেছি, এমন সময় এক বছর কুড়িকের কুলী ছোঁড়া "কালা" বলে ডেকেছে। যেই ডাকা, কি সিংজী এক হাত বাড়িয়ে বেচারার ঘাড় ধরে তাকে শূন্যে তুলে ফেললে। তুলে নানা রকম গালিগালাজ করতে লেগে গেল। আমি বন্ধুর হাতে পায়ে ধরে কত কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করে বাড়ী নিয়ে গেলাম। কিন্তু সে কিছুতেই বিশ্বাস করলে না, যে লোকটা ইচ্ছা করে আমাদিকে অপমান করতে চায় নেই।

আর এক দিন হল কি, আমরা তিন জন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি উলউইচ শহরে। তিন জনেরই ঘোড়সওয়ারী পোষাক, হাতে চাবুক। এক শুঁড়ীর দোকানের পাশ দিয়ে চলেছি। এমন সময় একটা প্রকাণ্ড Navvy (কুলী মজুর) বলে উঠল, "হ্যালো, ব্লাকী!" আমাদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বেঁটে, রোগা, তিনি তৎক্ষণাৎ "হারামজাদা!" বলে গর্জ্জন করে লোকটার মুখের উপর মারলেন চাবুক। সাদা একটা দাগ পড়ে গেল বেচারার লাল টকটকে মুখে। সে দু তিন বার ঢোক গিলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "এ কি রকম ব্যবহার, এ কি জুলুম!" লোকটা ইচ্ছা করলে আমাদের তিন জনকেই ধরাশায়ী করতে পারত পাঁচ মিনিটে। যাই হোক, আমি তার পিঠ চাপড়ে একটা শিলিং বকশীশ দিয়ে ঠাণ্ডা করলাম। সে বার বার বললে "আমি কি দোষ করেছি, কি দোষ করেছি?" আমার বন্ধুর সঙ্গে

প্রায় ঝগড়া হয়ে গেল এই ব্যাপার নিয়ে। তিনি আমায় কাপুরুষ, দেশদ্রোহী, ইত্যাদি অনেক কিছু বললেন।

আর একদিন, দূর দেহাতে আমি অনেকখানা বেড়িয়ে শ্রান্ত হয়ে গাঁয়ে ফিরছি, এমন সময় দেখি এক চাষা তার গাড়ীতে ঘাস বোঝাই করে চলেছে। আমি বললাম, "আমাকে গাঁয়ে পৌঁছে দেবে হে?" সে টপ করে লাফিয়ে ভুঁইয়ে নেমে টুপী তুলে বললে, "গুড্ ইভনিং, ব্লাকী। আসুন, নিশ্চয় পৌঁছে দেব।" লোকটা আমাকে বাড়ীর দরজায় নামিয়ে দিলে, এক পয়সাও নিলে না। কি করে মনে করব যে সে আমাকে অপমান করবার জন্য কালা আদমী বলেছিল?

আর এক রকমের একটা গল্প বলি। সেখানেও পাঠক দেখবেন যে অপমান করার চেয়ে ছেলেখেলা করবার ইচ্ছাটাই বেশী। আমরা সব খানা খাচ্ছি আমাদের Inn-এ। আমার বন্ধু সিং আর আমি এক মেসে বসেছি। অদূরে এক মেসে পল পীটার পিলে নামে এক মাদ্রাজী বন্ধু খাচ্ছেন। পিলে ভদ্রলোকটী খুব কালো, ছোট্ট, আর পেট মোটা। লম্বা গলাবন্ধ কোট পরতেন। মাথায় খুব জ্বলজ্বলে লাল সোনালী পাগড়ী। মুখটী বিশেষ বুদ্ধিমানের মত নয়। মহাজন সভার প্রতিনিধি হয়ে বিলেতে এসেছেন। সেই সুযোগে ব্যারিষ্টার হওয়ার কাজটাও কতক এগিয়ে রাখছেন। সাহেবদের সঙ্গে কথা কওয়ার সময় বড় অমায়িক হাসি হাসতেন! ইংরেজ ছেলেরা তাঁর যে নামটা দিয়েছিল সেটা খুব সম্মানসূচক নয়। হঠাৎ একজন ছোকরা পিলের

পাগড়ীটা টপ করে তুলে নিয়ে চালিয়ে দিলে আর একজনের কাছে। দেখতে দেখতে পাগড়ী চলে গেল বহু দূর। বেচারা দাঁড়িয়ে উঠে, "My turban, please," বলে কাকুতি মিনতি করতে লাগল। সবাই হেসে উঠল। কিন্তু বন্ধু সিং রক্তচক্ষু হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, রোষ্ট কাটার ছোরাটা হাতে নিয়ে। অস্ত্র তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "আমার পাগড়ীতে যদি কেউ হাত দিত ত—"! পিলের পাগড়ী ফিরে এল দু মিনিটে। আমি সিংজীর কোটের ল্যাজ ধরে টেনে বসিয়ে দিলাম। সে তখনও রাগে ফুলছে, "পাগড়ী খুলে নেওয়া আর মাথা কেটে ফেলায় তফাৎ কি!" আমি বললাম, "ঐ সব পাঁচরকম ভেবেই আমরা বাঙ্গালীরা পাগড়ী বাঁধি না!" তখন সিং হেসে উঠল। আমি সময় বুঝে বললাম,, "সিং তুই ফার্স্ বুঝিস না। সব তাতেই ট্রাজেডী দেখিস।" সত্যি অপমান কেউ করে না, তা নয়। খুব করে। তবে রজ্জুতে সর্প ভ্রম করে লাভ কি!

১৮৯৬ সালের লণ্ডনে আমি মটর গাড়ী দেখি নেই। শুনেছিলাম যে যুবরাজ এডওয়ার্ডের একখানা আছে! পারিসে অনেকগুলো দেখলাম। কিন্তু এমন বেঢপ অদ্ভুত যান, যে আজকার দিনে লোকে রাস্তায় দেখলে হেসেই আকুল হবে। প্রায় টমটমের মত উঁচু গাড়ী, ছোট্ট বনেট, খাড়া হয়ে বসে একটা লোহার দাণ্ডা ধরে চালাতে হয়। আর আওয়াজ, এখনকার ভদ্রবংশীয় মোটর সাইকেলও অত ফট্‌ফটাফট্ আওয়াজ করতে পারবে না! অধিকাংশ গাড়ীর আবার মাথার উপর রঙ্গীন চাঁদোয়া খাটান। সেই চন্দ্রাতপতলে

দু তিনজন জুলজুলে দাড়ী ছোকরা ফরাসীবাবু সিগারেট মুখে গল্প করতে করতে চলেছে, দেখে ভারী মজা লাগত। সব গিয়ে জমা হত সরকারী বাগান—Bois be Boulogne-এ, এক বড় নামজাদা কাফী-খানায়। পাশে এক কৃত্রিম জলপ্রপাত ছিল বলে তার নাম, Cafe de la Cascade। বড় বড় বাবুলোকের আড্ডা কি না, তাই খাবার দাবারের অসম্ভব দাম নিত। গরীব লোকের গতায়াত ছিল না। আমি কিন্তু রোজ ঐ কাফেতে গিয়ে জুটতাম, আর দুদণ্ড বসে একটা লেমনেড খেয়ে বাড়ী ফিরতাম। লেমনেডের দাম লাগত প্রায় এক টাকা। তখনকার দিনে বাইসিকেলও একটা সৌখীন চিজ ছিল। আমি সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে একখানা লণ্ডন থেকে কিনে নিয়ে গেছলাম। সেটা থাকত পার্কেই, এক দোকানে। রোজ সকাল বাসে করে গিয়ে বাইসিকেল চড়ে বাগানে ঘুরতাম। এই সূত্রে দুচারজন ফরাসী বাবু-লোকের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। এক আধবার তারা মোটরেও চড়িয়েছিল। মোটে ভাল লাগে নেই। রূপ, শব্দ ও গন্ধ, তিনটেই এমন বিকট, যে রস কিছুই পেতাম না। তার চেয়ে আমার দুচাকার পা-গাড়ী চেপে ঢের বেশী আনন্দ পেতাম।

আমি যাঁদের বাড়ীতে ছিলাম, তাঁরা খুব সাদাসিধে লোক। পরিবারে মাত্র একটী পুরুষ মানুষ। তিনি সব দিন বাড়ী ফিরতেন না, দেরী হলে তাঁর কারখানাতেই রাত কাটাতেন। যাঁদের সঙ্গে আমি দিন যাপন করতাম, তাঁরা সবাই স্ত্রীলোক। সব চেয়ে বড় ছিলেন বুড়ী দিদিমা। তাঁর বয়স সত্তর। আর সব চেয়ে ছোট একটী কুড়ি বছরের

মেয়ে, Suzanne। সবাই আমার বন্ধু ও মুরুব্বী ছিলেন। তাঁরা ঠিক করেছিলেন যে আমার মতন নাবালকের ডিনারের পর বাড়ীর বার হওয়া উচিত নয়। কাজেই এ যাত্রা আমার পারিসের নাচ গান দেখা হল না। Champs d'Elysées দিয়ে যেতে যেতে সব নাচ-ঘরের রোশনাইয়ের দিকে লুব্ধনয়নে চাইতাম, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম যে এবার পারিসে এলে হোটেলে থাকব। মাদাম, মাসীমা ও দিদিমাকে কিছু বলতে পারতাম না, কিন্তু মেয়েটাকে খুব শাসাতাম। একদিন তাকে খুব গম্ভীর ভাবে বললাম, "স্যু, এর শোধ আমি নেব। একদিন তোকে নিয়ে এমনি উধাও হয়ে যাব, যে তোর দাদা কেঁদে মরবে।" স্যু একটু মুখরা ছিল। আর আমিও না ভেবে চিন্তে মূর্খের মতন তাকে আমার দেশের কথা, আত্মীয় স্বজনের কথা, ইতিপূর্ব্বেই বলে ফেলেছিলাম। কাজেই সেও খুব মুখনাড়া দিত আমাকে। বলত, "রোস না, তোমার স্ত্রীকে সব লিখে দিচ্ছি। নাচঘরে যাওয়া বের করছি।" বুড়ী দিদিমার সঙ্গে আমার নিত্য রহস্য ছিল যে আমি তাঁকে আমার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার করে দেশে নিয়ে যাব! আমার বন্ধু রায়কে সাক্ষী মেনে প্রমাণ করে দিয়েছিলাম যে আমাদের সমাজে বহু বিবাহ ধর্ম্ম-সঙ্গত। দিদিমাও থিয়েটারী ঢঙ্গে রোজ দুহাত তুলে উত্তর দিতেন, "বাপরে! সে আমি কিছুতেই পারব না, ভাই। যে বাঘ, ভালুক ও সাপের দৌরাত্ম্য তোদের দেশে!" এই রকম খোশগল্পে অমূল্য সন্ধ্যাবেলা-গুলো কাটত। দিনের বেলা সারা পারিস চষে বেড়াতাম,

কখন একা, কখন রায়ের সঙ্গে। কোন কোন দিন রায়ের বন্ধু এক মাদমোয়াজেলও থাকতেন। আমার রাগ ধরল, "এই ত মাদমোয়াজেল আমাদের সঙ্গে কেমন বেড়ায়, স্যু কেন যাবে না!" বললাম তাকে, "আজ তোমাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে।" সে লক্ষ্মী মেয়েটীর মতন উত্তর দিলে, "মাকে জিজ্ঞাসা করব।" একটু পরে মাসীমা এসে বললেন, "ম্যসিঅ, আজ স্যু আর আমি তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাব। নিয়ে যাবে?" খুব সৌজন্য করে বললাম, "তার চেয়ে আর আনন্দের বিষয় কি হতে পারে!" গেলামও দুজনকে নিয়ে বেড়াতে সে দিন। কিন্তু আর কখনও স্যুকে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলি নেই। একদিন তার দাদা আমাকে বেড়াতে বেড়াতে বললে, "মশায়, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে ফ্রান্সে কুমারী মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে বেড়াতে যায় না। ইংলণ্ডের মতন ত নয়! এখানে লোকে বড় নিন্দা করে। আপনি বিরক্ত হবেন না।" আমি হেসে উত্তর দিলাম, "দুঃখ করবার কোন কারণ নেই। আমি ত ইংরেজ নই। আমাদের দেশে আরও ঢের কড়াকড়ি!

এবার পারিসে খেমটা নাচ ত দেখা হল না! কি করা যায়! একদিন এঁদের সবাইকে নিয়ে অপেরা দেখতে গেলাম। মেয়েরা ইভনিং পোষাক পরলেন বটে, কিন্তু গলা পর্য্যন্ত ঢাকা। ইংলণ্ডে শুনেছিলাম যে ফরাসী মেয়েরা ভয়ানক নির্লজ্জ, অর্দ্ধেক গা বের করে খানায়, থিয়েটারে যায়। গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "পারিসে যাদিকে ঐ রকম গা খুলে বেরোতে দেখ,

ওরা ভাল স্ত্রীলোক নয়।" সত্য মিথ্যা ঠিক করতে পারলাম না, তবে বুঝলাম যে আমার বন্ধুরা bourgeois, যারা বিংশ শতকের ভাষায়, "wallow in the mire of chastity"—সতীত্বের পঙ্কে খাবি খাচ্ছে। কয়েক সপ্তাহ পারিস দেখার পর মোটামুটি আন্দাজ করতে পারলাম যে ইংরেজ ও মার্কিন বাবুরা পারিসে যে সমস্ত স্ত্রীলোকের সংসর্গে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ান, তাদের ফরাসী ভাষায় আধ-সংসারী বলে, তাদের সঙ্গে গেরস্ত ঘরের মেয়েছেলের কোন সম্পর্ক নেই। পাঠকের কাছে ক্ষমা চাইছি। এ সব সেই যুগের কথা, যখন মার্কিন দেশের মহিলারা টেবিলের leg (পায়া) বলাটাও নির্লজ্জতা মনে করতেন। সে যুগ গেছে, আপদ গেছে!

অপেরা খুব চমৎকার লাগল। ওস্তাদী বিলেতী সঙ্গীতের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। তবু বেশ উপভোগ করতে পারলাম। দুটো পালার একটা ছিল Cavallieri Rusticana। তার গান ও গৎ এত সুন্দর যে অতি বড় আনাড়ীও মোহিত হয়ে যায়। ইংলণ্ডের অপেরা আমি দেখি নেই। কিন্তু কি প্রকাণ্ড অরকেষ্ট্রা পারিসের এই অপেরায়! নানা রকমের বেহালাই যে কত ছিল তার ইয়ত্তা নেই। একটা দৃশ্য ছিল সুইস্ দেশের বরফের পাহাড় ধসে পড়ার। এই ভীষণ ব্যাপারের সমস্ত আওয়াজটা অরকেষ্ট্রা থেকে বের হল। আর একটা দৃশ্য ছিল, একটি মেয়ে পাহাড়ের ঝরণায় জল ভরছে। তারও সমস্ত ধ্বনি নকল করলে অরকেষ্ট্রা। ছেলেবেলা থেকে স্বদেশী সঙ্গীতকলার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল, সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণধন বাবুর কল্যাণে। কিন্তু এ এক

নূতন ব্যাপার। একটা নূতন আনন্দের দরজা খুলে গেল আমার সামনে। পরে একে একে প্রায় সব বড় অপেরার পালাই শুনেছি।

একটা কথা এইখানেই আমি কবুল করি। ইংলণ্ডের অপেরা যেমন দেখি নেই, তেমনই ওখানের জাতীয় চিত্রশালা, বড় গির্জ্জা, রাজবাড়ী, কিছুই কখন দেখা হয় নেই। কিন্তু পারিসে এই ধরণের জিনিস সবই বারবার দেখেছি। এর বিশেষ কারণ কিছু দেখাতে পারি না। যে মানুষ চার বছরেও একবার ব্রিটিশ মিউজিয়ম কি ওয়েষ্টমিনষ্টার-এবী দেখে নেই, সে আর কৈফিয়ৎ কি দেবে! তার দুর্দ্দৈব!

পারিসে যত বড় বড় গির্জ্জা ছিল সব ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম, কিন্তু সব চেয়ে আমার ভাল লাগত মাদেলিন গির্জ্জা। সেখানকার হাওয়াতে কেমন একটা শান্তির ভাব ছিল। একদিন করলাম কি, আমাদের মাসীমার সঙ্গে মেরী মূর্ত্তির সামনে নীরবে দুঘণ্টা হাঁটু গেড়ে বসে রইলাম। অদ্ভুত-দর্শন কিছু অদৃষ্টে হল না, কিন্তু মনটা বড় হালকা বোধ হতে লাগল। বাড়ীর পথে মাসী জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি খৃষ্টান-মন্দিরে পূজা করলে, তোমাদের ব্রাহ্মণেরা চটবে না?" আমি উত্তর দিলাম, "আমাদের হিন্দু ধর্ম্মগুরুরা ওরকম একচোখো নন।" সত্যি বললাম কি না, কে জানে!

আমার এই এক বাতিক ছিল। যেখানে সেখানে যখন তখন খুব জোর গলায় প্রচার করতাম, যে আমাদের হিন্দু-ধর্ম্মের মত উদার ধর্ম্ম কোথাও নেই, এই ধর্ম্মের কোলে সকল পন্থার, সকাল বিশ্বাসেরই, স্থান আছে। একবার জন্দও

হলাম খুব। সেটা আরও বছরখানেক পরের কথা। জেনিভা শহরে এক ছোট হোটেলে ছুটী কাটাচ্ছি। হোটেলটী শহরের বড় বড় সরাইখানার মত নয়। ফ্রেঞ্চ সীমান্তের কাছে বাগানের মাঝখানে ছোট্ট একটী বাড়ী, সবশুদ্ধ জনাপনেরো কুড়ির থাকবার ব্যবস্থা। আমরা নানা দেশের লোক সেখানে ছিলাম। তার মধ্যে এক মার্কিন মহিলা তাঁর ছোট ছেলেটীকে নিয়ে বাস করছিলেন। মহিলাটীর স্বামী মানোয়ারী জাহাজে কাজ করতেন। জাহাজ ভূমধ্যসাগরে কোন বিশেষ কাজে মোতায়েন ছিল। সাহেব সুবিধা পেলেই এসে দুই একদিন জেনিভায় কাটিয়ে যেতেন। আমার ভাব হল প্রথম তাঁদের বাচ্চা টেডীর সঙ্গে। সে বাগানের বেঞ্চে আমার পাশে বসে রোজ গল্প শুনত। মেম সাহেব দূরে দূরে থাকতেন। একদিন টেডী ডাকাডাকি করাতে কাছে এসে সলজ্জভাবে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, "আমিও বসতে পারি কি ?" তার পর একদিন জাঁকাল জরীর উর্দ্দী পরা টেডীর বাপও এলেন। তিনি সটান আমার কাছে এসে, এক গাল হেসে, আমার হাতে মোচড় দিয়ে, নাকি-সুরে বললেন, "আপনি টেডীর বন্ধু ! আমিও দুদিন বসে আপনার দেশের রূপকথা শুনব। May I ?" মজার কথা নয় ! ছফুট লম্বা, বিশাল-ছাতি লালমুখো এই খোকাটী বসে দুয়োরাণী সুয়োরাণীর গল্প শুনবে ! হাসি চেপে উত্তর দিলাম, "তা বেশ ত ! আমার পুঁজী এখনও ফুরোয় নেই।" টেডীর মহা আনন্দ। বললে, "হ্যাঁ বাবা, খুব ভাল গল্প !" এই ভাবে এঁদের সঙ্গে বেশ

বনে গেল। একদিন হল কি, খেয়ে দেয়ে দুতিনজন ফরাসী বন্ধুর সঙ্গে দালানে বসে রাজনীতিক তর্ক-বিতর্ক করছি, খুব জোর গলায় ভারতের দুর্দ্দশার বর্ণনা করছি, (সেই বছর পুণাতে বিনা-বিচারে জেলে পোরার সূত্রপাত হয়েছে) এমন সময় মার্কিন মহিলাটী এসে আমাকে ডাকলেন। আমি উঠে যেতেই বললেন, "আমার ঘরের বাহিরে যে balcony বারান্দা আছে, একবার আসবেন সেইখানে!" আমি ত তখন ছেলেমানুষ, অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব, তবু মনে হল যে মানোয়ারী সাহেবের আপত্তি থাকতে পারে ত আমার এই রকম যাওয়া আসাতে! জিজ্ঞাসা করলাম, "লেফটেনাণ্ট সাহেব এসেছেন না কি? তাঁকে ত খানার সময় দেখলাম না।" Mrs C. হয়ত আমার প্রাচ্য মনোভাব বুঝলেন। কেন না হেসে উত্তর দিলেন, "না, সে আসে নেই। কিন্তু আমার দেশের কয়েকজন বন্ধু এসেছেন, তাঁরা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।" গেলাম মেম-সাহেবের বারান্দায়। দেখি, জনা তিন চার সাহেব-মেম বসে আছেন। তাঁরা উঠে আমাকে খুব আদর-অভ্যর্থনা করলেন। এক বৃদ্ধা বললেন, "আপনার নাম ত দত্ত? আপনি নিশ্চয় স্বামীজীর আত্মীয়। আমরা সবাই তাঁর ভক্ত। আপনার কাছে হিন্দুধর্ম্মের কথা শুনতে চাই।" শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। কি ভয়ানক! আমি ত Mrs C.-র কাছে এক দিনও বেদান্ত দর্শনের নাম করি নেই। তাঁর ছেলেকে রূপকথা বলি, এই অপরাধ। ভদ্রমহিলাকে ভাল মানুষ বলে জানতাম। তিনি আমার সঙ্গে এই দুশমনী করলেন! তাড়াতাড়ি বললাম,

"আজ্ঞে না, আমি স্বামীজীর আত্মীয় নই, তাঁকে কখন চক্ষে দেখি নেই। আমি আইন পড়ছি, ধর্ম্মের কিছুই জানি না।" আমার কথা কেউ কানেই তুললেন না। বৃদ্ধা বললেন, "আপনি হিন্দু ত! প্রত্যেক হিন্দুরই ভেডাণ্টে জন্মগত অধিকার। আপনি যা জানেন, তাই বলুন! তাতেই আমাদের লাভ।" গোরিং গাঁয়ের চাষাদের কাছে হিন্দুধর্ম্ম কি, তা বোঝাতাম বটে! পারিসে ম্যুতেল পরিবারের কাছে-ও সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন ভাব নিয়ে বড়াই করেছি। কিন্তু এই বিবেকানন্দ-ভক্তদের কি বলব! যাই হোক, বাঙ্গালীর ছেলে, কথায় হার মানব! স্বামীজীর জাতভাইও ত বটে! জুড়ে দিলাম যম-নচিকেতার গল্প। সেটা জানা ছিল। মার্কিনরা, বিশেষ করে সেই বৃদ্ধাটী, "বি-ই-উ-টী-ফুল" ইত্যাদি বলে আমাকে উৎসাহিত করলেন। সেদিন-কার মতন রেহাই পেলাম। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে কেতাবগুলো হাতড়ে হাতড়ে রমেশ বাবুর "Ancient India" টেনে বের করলাম। রাত দুটো পর্য্যন্ত সেটা পড়ে অনেক কিছু বাগালাম। সেই বিদ্যার জোরে দুটী দিন চালালাম ধর্ম্মব্যাখ্যা। তেসরা দিন মার্কিনী দল চলে গেলেন। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম! এদের দলে একটি বছর পনেরো ষোলোর ছোকরা ছিল। দিব্যি দুর্ব্বৃত্ত চালাক ছেলে। যাবার আগে সে আমাকে বলে গেল, "You are a cute fella. How nicely you hoaxed the old birds! তুমি খুব ঘুঘু ছেলে, কি বোকা বানিয়েছ ঐ বুড়ো-বুড়ীদের!"

পারিসের কথা বলি, আমি বুর্বঁ রাজাদের ভক্ত ছিলাম না। ফরাসীরা তাদের মাথা কেটেছিল, বেশ করেছিল, এই আমার মনোভাব। তবু, ভেরসাইয়ের রাজবাড়ীতে চতুর্দ্দশ লুই কি মারী আন্তোয়ানেতের যে সব চিহ্ন ছিল, তা দেখে মনে বড় কষ্ট হত। কষ্ট হত, তবু বার বার দেখতে যেতাম। তাদের বাসের ঘর, ঘরসজ্জা, মায় বিছানা পর্য্যন্ত সাজান ছিল। এই রাজবাড়ী কত পুরানো স্মৃতিতে ভরা। লুইয়ের লাভালিয়ের ও মন্তেস্পাঁর সঙ্গে যৌবনে প্রেমলীলা—তাঁর বুড়ো বয়সে বুড়ী মেন্তেনঁর হুকুম-বরদারী—পরের যুগে পম্পাদুর ও দুব্যারী কর্ত্তৃক শনৈঃ শনৈঃ ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ সাধন—ত্রিয়ানঁতে নবীন সুন্দরী আন্তোয়ানেতের লীলাখেলা—তার পর সর্ব্বশেষ দৃশ্য, ক্ষুধার্ত্ত পারিসিয়ান canaille-এর (জনতার) অভিযান—এ সবই ত ঘটেছিল এই ভেরসাইতে! জরী-জড়োয়া-পরা রাজা রাণীর ভিড়ের মাঝখান থেকে এক একবার উঁকী মারত একটী কালো বেঁটে পাগড়ীবাঁধা মূর্ত্তি—দ্যুবারীর পোষা বাঁদর, জামর—Zamor। বাঙ্গালীর ছেলে সে, ফিরিঙ্গী ডাকাতে তাকে ধরে নিয়ে গেছল ছেলেবেলায় কোন্ নদী পারের ছোট্ট গ্রাম থেকে। পাগড়ী বেঁধে ভাঁড়ামি করত, রাজা রাণীর মন যোগাত। কিন্তু তার অন্তরের আগুন কোনদিন নেবে নেই। ১৭৯০ সালের ভীষণ তাণ্ডবে ফরাসীর সঙ্গে নেচেছিল এই অনামা বাঙ্গালী ক্রীতদাস।

লুভরে কি কি দেখেছিলাম এখন ভুলে গেছি। দুটো জিনিস শুধু মনে আছে। এক, Venus de Milo-র মূর্ত্তি। দ্বিতীয়, সেকন্দর ও পুরুরাজের ছবি। Venus-এর মূর্ত্তিটি

জগদ্বিখ্যাত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ফরাসীরা একে রেখে দিয়েছে আদর করে এক আলাদা ঘরে! চারিদিকে লাল মখমলের পরদা ঝুলছে। সুন্দরের উপযুক্ত সমাদর! কিন্তু আমার এইটুকু দোষ চোখে পড়েছিল যে এ মানবীর মূর্ত্তি, দেবত্বের চিহ্ন মাত্র এতে নেই।

পুরুরাজের ছবি আমাকে মোহিত করেছিল। আজও মনে আঁকা রয়েছে। জগজ্জয়ী সেকেন্দর বসে রয়েছেন ঘোড়ার উপর, সম্মুখে বিজিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হিন্দু নৃপতি, তাকে ধরে রয়েছে গ্রীক সেনানীরা। কি আশ্চর্য্য চোখ এই পুরুরাজের! কি কথা কইছে ঐ চোখ! "আমার শরীর শেকলে বেঁধেছ, সম্রাট্! কিন্তু মনকে বাঁধতে পারবে না তুমি!" মনকেও কিন্তু বাঁধলেন সেকেন্দর! যে সুতো দিয়ে বেঁধেছিলেন, সে সুতো কি আজও পাওয়া যায়!

১০

পারিসে যত দিন থাকবার ইচ্ছা ছিল, তা হল না। কয়েক হপ্তা বাদ এক নিমন্ত্রণ পেলাম পশ্চিম ইংলণ্ড হতে। শ্বশুর-স্থানীয় গুরুজনের আমন্ত্রণ, না বলবার উপায় ছিল না। ছুটীর তখনও অনেক দিন বাকী, পারিসেও দেখবার অনেক কিছু বাকী। তবু, করি কি, তলপী-তলপা বেঁধে রওয়ানা হলাম। ইংরেজের রাজধানী এবার আরও একঘেয়ে নিরানন্দ লাগল। একে ত লণ্ডনের চেহারা চিরদিনই ঐ রকম, তায়

আবার এই মৌসুমে, শরৎকালে, শহর একেবারে খালী। সবাই গেছে বেড়াতে বেরিয়ে। যার নিতান্ত সঙ্গতি নেই, সেই শুধু পড়ে আছে।

দু দিন দুটো নাটক দেখে নিয়ে, তিন দিনের দিন বেরিয়ে পড়লাম পেডিংটন থেকে পশ্চিম মুখে। অনেক পথ অতিক্রম করে নামলাম গিয়ে সমারসেট জেলায় Minehead বলে এক ষ্টেশনে। এই মাইনহেড অঞ্চলেরই চাষারা একদিন ধর্ম্মের নামে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন টলিয়ে দিয়েছিল। পারে নেই কিছু করতে শেষ পর্য্যন্ত। দলে দলে বেচারারা প্রাণ দিয়েছিল কসাই-জজ জেফ্রিসের হাতে। কিন্তু জগৎকে তারা দেখিয়ে দিয়ে গেছল যে ইংলণ্ড আর কোন দিন রোমের হুকুম-বরদারী করবে না। ষ্টুয়ার্ট রাজাদের তখনকার মত জয় হয়েছিল সত্যি, কিন্তু কদিনের জন্য!

আর সত্যিই কেথলিক ধর্ম্ম ইংরেজচরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। আমার যে এক ঘর কেথলিক বন্ধু ছিলেন, তাঁদের যতই দেখতাম, ততই এটা বুঝতাম। তাঁদিকে কেমন মনে হত আধা-ইংরেজ! সাধারণ ইংরেজের চেয়ে তাঁদের ভাব ঢের বেশী cosmopolitan, উদার ছিল।

হপ্তাখানেক রইলাম আমরা Minehead-এর কাছে পোরলক বলে গ্রামে, এক মুচীর দোকানের উপর তলায়। ছোট্ট গ্রাম, চারিদিকে নীচু পাহাড় ও বন। এ দেশের একটা মস্ত সুবিধা যে বনগুলোতে ঝোপজঙ্গল মোটে নেই, অবাধে সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়ান যায়। কোথায় ঘাসের ভেতর থেকে গোখরো সাপ ফোঁস করে বেরিয়ে ফণা তুলে দাঁড়াবে, কোথায়

ঝোপের মধ্য হতে বন-বরা দাঁত উঁচিয়ে তাড়া করবে, এ সবের ভয় নেই। বনের ভেতর সাধ মিটিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কাব্য-চর্চ্চা করা যায়। এক চিত্রকর দম্পতির সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা গ্রাম থেকে বহু দূরে বনের মাঝখানে বাড়ী নিয়েছেন। চাকর-বাকর রাখেন নেই, রান্না-বাড়া নিজেরাই করেন। গ্রাম হতে এক বুড়ী দিনান্তে এক বার এসে হাঁড়ী-কুঁড়ি মেজে ঝাড়-পোঁছ করে দিয়ে যায়। আমাদিকে একদিন তাঁরা চা খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। খুব আনন্দে সারা বিকেলটা কাটিয়ে আসা গেল। বসবার ঘরে প্রকাণ্ড সেকেলে খোলা আতশ-খানা। তাইতে গাছের মোটা মোটা ডাল জ্বলছে! সবাই তার চারিদিকে বসলাম। মেম-সাহের বড় বড় রুটীর চাকতি, মোটা-মোটা নোনা মাংসের ফালি, ডেভনের মালাই ও ভাপা দই, এন্তার খাওয়ালেন। এঁরা নব-পরিণীত, কিন্তু বয়স নিতান্ত কচি নয়। রোজ এগারটার মধ্যে রেঁধে খেয়ে বেরিয়ে পড়েন ছবি আঁকতে। পাঁচ ছয় ঘণ্টা ছবি এঁকে শ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফেরেন। একটু বিশ্রাম করে, চা, টোষ্ট, ডিম খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়েন। এবার এঁদের উদ্দেশ্য নিছক প্রেমচর্চ্চা। বোধ হয়, দুজনে হাত ধরাধরি করে ঘোরেন। হয়ত, বেড়াতে বেড়াতে কানে কানে কত কি বলেন! কে জানে! সে সব ত আর অভিনয় করে আমাদিকে দেখালেন না। তবে বনে সব নিভৃত মনোরম স্থান আমাদিকে দেখাতে দেখাতে তাঁদের চোখে-চোখে যে বিজলী খেলছিল, তা কর্ত্তারা না দেখলেও আমার চোখ এড়ায় নেই। বাবুটীর বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, গিন্নীর বছর

পঁচিশ, অতএব আমার চোখে বুড়ো-বুড়ী। তাদের রকম-সকম দেখে একটু মনে-মনে হেসেছিলাম বই কি! বনের নানা সুন্দর স্থানের ছবি দুজনে এঁকেছেন। কত আনন্দে, কত উৎসাহে সে সব আমাদের দেখালেন। ছবি মন্দ নয়, তবে তাঁদের কাছে অমূল্য। কেন না তাঁদের জীবনের মধুমাসের কতস্মৃতি জড়িয়ে আছে ঐ ছবির সঙ্গে!

পোরলকে সাত দিন মন্দ কাটল না। তবে তখনও পারিসের শোক ভুলতে পারি নেই। নূতন জায়গা লিণ্টনে পৌঁছে কিন্তু সব ভুলে গেলাম। চারিদিকে কি চমৎকার দৃশ্য! গ্রীষ্মকালে টেমস্-তীরে যে সৌন্দর্য্য দেখেছিলাম, তার সঙ্গে এর ঢের তফাৎ। এ সম্পূর্ণ আর এক রকমের জিনিস। ছোট বড় পাহাড়ে ঘেরা গ্রামখানি। অদূরে সমুদ্র। সমতল ভূমি প্রায় নেই। রাস্তা সব উঁচু-নীচু, ঢেউ খেলানো। কাছে বন নেই। রাস্তার দুধারে সবুজ ঘাস। সমুদ্রের ধারের পাহাড়টা একেবারে খাড়া। তার গা কেটে তাকের মতন এক সরু বেড়াবার পথ তৈরী করেছে। এখানকার লোকে তার নাম দিয়েছে কার্ণিশ। সেই কার্ণিশের উপর বড় জোর তিনজন লোক পাশাপাশি চলতে পারে। মাথার উপর নীল আসমান, পায়ের তলায় নীল দরিয়া, একা চলতে চলতে একটু স্বপ্নের আমেজ আসে। কিন্তু ঠিক স্বপ্ন দেখার মত জায়গা নয়। খুব সাবধানে চলতে হয়। সারাক্ষণ একটা ঝড়ের মতন হাওয়া পাহাড়ের গায়ে ঝাপটা মারছে, একবার পা ফসকালেই আর হাড় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কার্ণিশের এক দিকটা থেকে হাজার খানেক হাত

নামলেই লিন-মাউথ বলে আর এক গ্রাম, জেলেদের বসতি। সামনে পোস্তা-বাঁধা। তার নীচে কাতার দিয়ে মেছো ডিঙ্গী সব নোঙ্গর ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঢেউয়ের উপর নাচছে। দুচারখানা ডিঙ্গী আবার বালির উপর টেনে তোলা রয়েছে। তাদের মেরামতি চলছে। জেলেগুলোর রঙ্গ রোদে পুড়ে, নোনা জলে ভিজে, মেহগিনির মত হয়ে গেছে। আমি ত ক্রমাগত চারিদিকে, উপরে নীচে, ঘুরে বেড়াতাম। এ অঞ্চলের জেলে, চাষাভুসো, সকলের সঙ্গেই যেচে আলাপ করেছিলাম। তবে আলাপ বেশী দূর এগোতে পারত না, ভাষা বিভ্রাটের জন্য। এদের বাঙ্গাল ইংরেজী, আর আমার বাবু-ইংলিশ, এ দুয়ের সঙ্গত কিছুতেই জমত না। হাত পা নাড়াই দুপক্ষের প্রধান সম্বল ছিল। হপ্তাখানেক অভ্যাসের পরে তাইতেই কাজ চলে যেত। লিনমাউথ থেকে খানিকটা হেঁটে গেলেই এক সুন্দর বন। কতকটা পোরলকের বনের মতই তবে তার চেয়ে আরও মনোরম। সেই বনের মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে লিন নদী। নামেই নদী, কিন্তু সত্যি একটা পাগলী নির্ঝরিণী। কোথাও পাথর থেকে পাথরে লাফ মেরে মেরে ছুটেছে, কোথাও বা বাধা পেয়ে রাগে ফোঁস ফোঁস করছে, আবার কোথাও বা পাথরগুলোকে পাশ কাটিয়ে কুলু-কুলু করে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে চলেছে। ভারী চমৎকার দেখতে! এ বিলেত দেশটার মজাই এই। বন, পাহাড়, নদী, মায় সমুদ্র পর্য্যন্ত, সব যেন খেলা ঘরের দৃশ্যপট! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। একটুও ভয় করে না। ভয় হয় বরং এখানকার বিশালকায় রক্তবদন মানুষগুলোকে দেখলে।

কিন্তু তাদেরও কেবল বাহিরেটা ঐ রকম। অন্তর ছেলে-মানুষের। আমাদের মতন ইঁচড়ে-পাকা পদার্থ এ দেশে দুর্লভ।

ইংরেজদের খাওয়া-দাওয়া কতকটা আমাদের হিন্দুস্থানী-দের মতন। মোটামোঠা স্বাস্থ্যকর খাবার খানিকটা পেটে পুরলেই হল। যাতে তাকৎ হয়। সে ভোজনের ভেতর সভ্যতা বা মার্জ্জিত রুচির চিহ্নমাত্রও আমার নজরে পড়ে নেই। পাঠককে ত বলেছি যে লিণ্টনে আমি শ্বশুর বাড়ীতে বাস করছিলাম। সুতরাং ভোজনাদি জামাই আদরেই চলছিল। গ্রাউস নামে এক শিকারের পক্ষী ঐ মৌসুমে সকল বড় লোকেই খায়। কর্ত্তা একদিন সে উপাদেয় পদার্থ আমার জন্য ফরমায়েশ করলেন। খবর শুনে আমি খুব খানিকটা jog trot দৌড়ে খিদে বাড়িয়ে এলাম। খানায় বসে প্রথমে মামুলী সুরুয়া ও ময়দার কাইসংযুক্ত সিদ্ধ মাছ খাওয়া হল। আমি তখন অজানার প্রতীক্ষায় একটু উত্তেজিত। বাড়ী-ওয়ালী যখন ধূমায়মান এক বড় বারকোশ হাতে প্রবেশ করলে, তখন আমি মনের আবেগে প্রায় দাঁড়িয়ে উঠলাম। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই একটা উৎকট গন্ধ এসে আমার নাকে ঢুকল। আমি বসে পড়লাম। কর্ত্তা একটু হেসে বললেন, "Hallo, dont you like the flavour? কি হে, গন্ধ কেমন লাগছে? ঐ ত তোমার গ্রাউস। খেয়ে দেখ, কি চমৎকার!" আমি তখন মর্ম্মাহত। এত আশায় ছাই পড়ল! আস্তে আস্তে নিবেদন করলাম, "আমাকে ক্ষমা করতে হবে। ও জিনিস মুখে দিলে ভারী মুস্কিল হবে।"

পেটের তখনও খিদে মেটে নেই বটে, কিন্তু ঐ flavour, খাই কি করে! কর্ত্তা রাগ করলেন। নিজেও মুখে দিলেন না। বাড়ীওয়ালীকে বললেন, “নিয়ে যাও। তোমরা খাও গিয়ে।” গোটা বারো টাকা নষ্ট হল। পরে শুনলাম, যে পক্ষীটী দিন পনের আগে নিহত হয়েছিল, আর ঐ রকম এক পক্ষের বাসি মাংস না হলে সুস্বাদু হয় না! মগেরা ঞাপি খায় বলে তাদের কত নিন্দা! রাজার নন্দিনী, পিয়াবী, যা কর তাই শোভা পায়।

লিণ্টন অঞ্চলে তখনকার দিনে রেল ছিল না। পোরলক থেকে কতকটা হেঁটে আর কতকটা ফেটিন গাড়ী চেপে এসেছিলাম। ফেরবার সময় বার্ণষ্টেপলে ট্রেন ধরলাম। ষ্টেশন পর্য্যন্ত চৌদ্দ মাইল পথ এক প্রকাণ্ড মান্ধাতার আমলের ষ্টেজকোচে গেলাম। চার ঘোড়ার গাড়ী, ঘোড়ার পিঠে postillion সহিস, লোক সরাবার জন্য থেকে থেকে একটা লম্বা শিঙ্গা ফুঁকছে, বেশ মজার লাগল। তবে, পথে Robin Hood কি Dick Turpinএর সাক্ষাৎ না মিললে ষ্টেজ-কোচের পুরো মজাটা পাওয়া যায় কি!

এবার লণ্ডন ফিরে আমার হষ্টেলজীবনের শৃঙ্খল খসল। ব্যাপারটা সহজে সংঘটিত হয় নেই। বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, বিশেষতঃ আমার মাষ্টার মহাশয় রেনকে নিয়ে। তবে কর্ত্তৃপক্ষ শেষ পর্য্যন্ত মানলেন যে আমি সাবালক হয়েছি, আমাকে আলাদা বাসা করে থাকতে দেওয়া যেতে পারে।

শৃঙ্খল খসল বলেই পাঠক যেন মনে করবেন না যে

আমার জীবনটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেল। তা হয় নেই। তবে কতকটা বিশৃঙ্খল যে হল, তা নিশ্চিত। গেল ক মাস লণ্ডনে সাহেব-সংসর্গেই দিন কাটছিল। খাওয়া দাওয়া, ঘোরা-ফেরা, গল্প-গুজব, সবেতেই তাঁরা প্রধান সাথী ছিলেন। মাঝে মাঝে আমার স্বদেশী গুরুজন-স্থানীয়াদের বাড়ীতে উৎপাত করে আসতাম, এই পর্য্যন্ত। কিছুদিনের জন্য, পরীক্ষা পাস করব বলে একটা উৎসাহও মনে এসেছিল। কিন্তু এখন আস্তে আস্তে সব উল্টে গেল। সমবয়স্ক স্বদেশী বন্ধুবান্ধব অনেক মিলল। তাঁদের কেউ কেউ আমার মতন সিবিল-সার্ব্বিসের উমেদার ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশেরই লেখাপড়ার বিশেষ বালাই ছিল না। তখনকার দিনে বার পরীক্ষার জন্য ত পড়াশুনার আবশ্যক ছিল না! আমার এই বন্ধুমণ্ডলীর কেউ কেউ গত হয়েছেন, কেউ কেউ বা আছেন। তাঁরা সবাই আমাকে এত স্নেহ করতেন, যে একবার তাঁদের নাম করে স্নেহাঞ্জলি দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তা হবার নয়! আমি কত কি যা-তা লিখছি, এর মাঝে কারও নাম না করাই ভাল!

আমাদের নানাস্থানে নানা রকমের আড্ডা জমত। কোথাও বা তাস-পাশা চলত, কোথাও বা সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা, কোথাও বা ভারত উদ্ধার। বিলেতে ছাত্রজীবনে সুন্দরী-সন্ধান যেমন বিপদসঙ্কুল, তেমনই ব্যয়-সাপেক্ষ। আমার অর্থাভাব ছিল না, বিপদকেও ডরাতাম বলে মনে নেই। তবু একটা সেকেলে ব্রাহ্ম কুসংস্কার সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা সম্বন্ধে আমাকে কেমন অন্ধ করে রেখেছিল। যাক্, তাতে নোকসান কিছু হয় নেই।

তরুণ বয়সে মানুষ যেটা যথার্থ চায়, সেটা excitement, উত্তেজনা। তাস খেলাতে দু পাঁচ টাকা হেরে জিতে সেটা না পাওয়া গেলেও ভারত উদ্ধারের কাজে তার অপ্রতুল ছিল না! তবে পাঠক হয়ত হেসে জিজ্ঞাসা করবেন, বিলেতে সাহেব সেজে আড্ডা দিয়ে দুঃখিনী জননীর কোন দুঃখটা মোচন করেছিলে? এ কথার আমি উত্তর দেব না। আমাদের সেই বয়সের পাগলামির কথা মনে করে নিজেই যে কম হাসি, তা নয়। তবে কি জানেন, পাগলের কাণ্ড দেখে হাসিও পায়, দুঃখও হয়, কিন্তু রাগ ত হয় না! যারা সে সময় লণ্ডন-ময় প্রকাশ্য সভা ও গুপ্ত মন্ত্রণা করে বেড়াতেন, তাঁদের অনেকেই পরের জীবনে যথেষ্ট কীর্ত্তি সঞ্চয় করেছেন। তাঁদিকে নগণ্য জ্যাঠাছেলে বলে আবর্জ্জনাস্তূপে ঝেঁটিয়ে ফেলে দেওয়া যায় না। এই ছিল আমার বন্ধুমণ্ডলী। আজ আমি সরকারী মানুষ। রাষ্ট্রনীতি আলোচনা করা আমার পক্ষে অশোভন। তবে দু চারটে গল্প না করলে আবার পুরানো কথা লেখকের কর্ত্তব্য পালন হবে না।

পরীক্ষা পাস করার কয়েক সপ্তাহ পরে আমরা জনাকয়েক ভারত-সচিব মহাশয়ের দপ্তর থেকে এক পত্র পেয়েছিলাম, এই মর্ম্মে—যদিচ আপনি এখনও সিবিল-সার্ব্বিসের কর্ম্মচারী নহেন, তথাপি সরকারী চাকরের রাষ্ট্রনীতিক সভা-সমিতিতে যোগদান করা সম্বন্ধে যে নিয়মাবলী আছে, তাহা আপনি পালন করিতে বাধ্য।

একখণ্ড নিয়মাবলীও এসেছিল চিঠির সঙ্গে! তাকীদ-সত্ত্বেও যে নিয়ম মেনে চলি নেই, এ খবর আমার সঙ্গে সঙ্গেই

নিশ্চয় ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল। পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ। ধূম দেখেছিলাম বই কি! তবে এ সব অনেক পরের কথা, এখন মুলতুবী থাক।

আমি হোষ্টেল ছেড়ে প্রথম উঠলাম এক বোর্ডিং হাউসে। সেখানে বেশী দিন টিকতে পারলাম না। সে সব লোকের সঙ্গে সেখানে রোজ বসতে, খেতে হত, তারা ঠিক আমাদের gentry জাতের ছিল না। পাঠক ত জানেন, উনিশ শতকে জাতিভেদ কি রকম প্রবল ছিল! কার্ল মার্কসের দুন্দুভি তখনও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় নেই।

একটা বাজে গল্প বলি এই বোর্ডিং হাউসের। বাড়ী-ওয়ালীর একটি বছর ষোলর মেয়ে ছিল, ভারি দুষ্টু। সে আমাদের সকলের প্রিয়পাত্রী ছিল। ষোল বছরের মেয়েকে সেকালে বিলেতে ত আর কেউ স্ত্রীলোক মনে করত না! আমরা Q-কে পোষা বাঁদরটীর মতনই দেখতাম। ইতিমধ্যে এক মজা হল। দেশ থেকে X নামে আমার এক বন্ধু এসে সেই বাড়ীতে উঠলেন! সে ভদ্রলোক এই মেয়েটার পানে সোজা চাইতে পারতেন না। কখনও গায়ে গা ঠেকলে বিব্রত হয়ে উঠতেন। মুখ কান লাল হয়ে যেত। অথচ মাঝে মাঝে আড় চোখে তার দিকে তাকাতেও ছাড়তেন না। আবার আমরা মেয়েটাকে ঠেলা-ঠেলি ধাক্কা ধাক্কি করলে বিরক্তিও প্রকাশ করতেন। একদিন গম্ভীরভাবে আমাকে বললেন, "মশায়, দেশে যখন চিঠি লিখবেন, Q-এর কথা কিছু লিখবেন না যেন। আমার দাদার কানে যদি কোন রকমে যায়, তাহলেই হয়েছে! ষোল বছরের

তরুণীর সঙ্গে এক বাড়ীতে আছি জানলে কেলেঙ্কারের শেষ থাকবে না।”

Q তরুণী শুনে আমার খুব মজা লাগল। কিন্তু সেই বাড়ীর আর এক বাসিন্দা Z সেখানে বসেছিলেন। তিনি চটে আগুন হয়ে গেলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, “হতভাগা! এ সব লোক বিলেতে কেন যে আসে, জানি না! থাম, দেখে নিচ্ছি ওকে।”

সন্ধ্যাবেলায় এক বাক্স চকোলেট কিনে নিয়ে এসে Z আমাকে বললেন, “ওহে মেয়েটাকে একবার ডাক ত!” Q এলে পর তাকে বললেন, “বাঁদরী! এক কাজ করতে পারিস ত তোকে এই চকোলেট দেব।” “সবটা?” “হ্যাঁ, সবটা।” “আচ্ছা কি করতে হবে, বল!” “আজ খানার পর সকলে আমরা যখন বিলিয়ার্ড ঘরে বসব, তুই আচমকা গিয়ে X-এর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করবি, আর বলবি—আমি তোমায় বড্ড ভালবাসি। পারবি?” মেয়েটা আস্ত বাঁদরী। দর-দস্তুর আরম্ভ করে দিলে। আমাকে বললে, “তুমিও যদি এক বাক্স মেঠাই দাও, ত করব। নইলে পারব না। মার কাছে কানমলা খেতে হবে। আর—মাগো, যে চেহারা!” কি করি, আমি কবুল হলাম। ফলে খানার পর যখন বিলিয়ার্ড ঘরে জমায়েত হয়েছি, তখন Q বন্ধুবরকে আক্রমণ করে বেশ থিয়েটারী ঢঙ্গে প্রেম নিবেদন করলে। বন্ধুর মুখে কথা সরল না। কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে খিল দিলেন। Q মার কাছে হুচারটে কানমলা ঠিক খেলে। রাত্রে Z আর আমি X-এর দরজায় দাঁড়িয়ে অনেক কাকুতি মিনতি

করলাম। তিনি খিল কিছুতেই খুললেন না। সকালবেলা নাগাদ কিন্তু ভদ্রলোক নিজেকে সামলে নিলেন। চায়ের টেবিলে সবাইকে খুব হেসে "গুড্‌মর্ণিং" বললেন, যেন কিছুই হয় নেই। তার পর বিকেলে Q-কে এক বড় বাক্স টফী কিনে এনে দিলেন।

X ঠিক normal হিন্দুর ছেলে ছিলেন, তা আমি বলছি না। তবে গল্পটা থেকে ইংরেজ মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের যে সব অদ্ভুত ধারণা ছিল, তার আঁচ পাওয়া যায় বই কি! সে যাই হোক, X মহাশয়ের পুরো দস্তুর সাহেব হতে বেশী সময় লাগল না।

এই বোর্ডিং হাউসে থেকে উঠে আমি নিজের বাসা করলাম। অর্থাৎ একেবারে স্বাধীনতার ধ্বজা ওড়ালাম। আর অন্য লোকের সঙ্গে খেতেও হত না, বসতেও হত না। আড্ডা আরও বেশী জমতে লাগল। পাঠকের মনে থাকতে পারে যে ১৮৯৭ সালে দেশে নানা রকম বিভ্রাট ঘটেছিল। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, প্লেগ, খুনোখুনি, কিছুই বাকী ছিল না। এই সব ব্যাপারে প্রবাসে আমাদের মন বড় বিচলিত হয়ে উঠেছিল। দিবা রাত্র এই জটলা চলত, যে আমাদেরই পাপে এই সব হচ্ছে। সেই বছর আবার রাণী বিক্টোরীয়ার জুবিলী উৎসব। কথা হল যে লণ্ডনের ভারতসভা সারা দেশের তরফ হতে মহারাণীকে একটা মানপত্র দেবেন, আর আঞ্জুমান মুসলিমের তরফ হতে আর একটা দেবেন। সীমান্তে পাঠানদের উপর অত্যাচার হয়েছে, এই অজুহাতে মুসলমান মানপত্র সহজেই নাকচ করা গেল। কিন্তু ভারত সভায় দেশপূজ্য দাদাভাই

আমাদিকে আমলই দিলেন না। আমরা সভায় রীতিমত একটা খুব শোরগোল করে বেরিয়ে এলাম। আমাদের এতেই কাজ হাসিল হল, কেন না পরের দিন টাইম্‌স্‌ থেকে আরম্ভ করে সব খবরের কাগজই লিখলে যে ভারতের তরুণ দল আর ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না। এর পর আমরা নানা প্রকাশ্য সভায় বিনা নিমন্ত্রণে উপস্থিত হয়ে কংগ্রেসনীতি-সম্বন্ধে আমাদের মতামত জাহির করতে লাগলাম। আমাদের কার্য্যক্রম কতকটা বে-আইনী ছিল বই কি! হঠাৎ সুযোগ বুঝে আমাদের দলের কোন নেতা দাঁড়িয়ে উঠে ছুচার কথায় আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করলেই আমরা হাল্লা করে দল বেঁধে বেরিয়ে আসতাম। এই সব ব্যাপারে মহাত্মা দাদাভাই যে আমাদের উপর সত্যি অসন্তুষ্ট হতেন, তা আমরা মনে করতাম না। তবে তিনি কংগ্রেস দলের কর্ত্তা, আর কংগ্রেসের ধর্ম্ম ত ছিল ভিক্ষাবৃত্তি, তাই প্রকাশ্যে তিনি আমাদিকে কোন আস্কারা দিতেন না। একদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাড়ী গেলাম। আমাদের সমস্ত বক্তব্য তিনি শুনলেন, মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা আমাদের মতন ছুটী অর্ব্বাচীন বালককে নিয়ে তিনি কাটালেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও হাসলেন না, ঠাট্টা করলেন না! আমরা মোহিত হয়ে বাড়ী ফিরলাম। এটা স্থির বুঝে এলাম যে তিনি যথার্থ সারা ভারতের নেতা, একা কংগ্রেসের নয়।

দাদাভাই এই সময়টা অত্যন্ত গরীবানা ভাবে কাটাচ্ছিলেন। দূর শহরতলীতে একটী ছোট্ট কামরা নিয়ে

থাকতেন। তার আসবাবপত্রও নিতান্ত সাদা-সিধে। একটী সরু লোহার খাট, ছোট একটী লেখবার টেবিল, খান দুই অতি সাধারণ কেদারা। চারিদিকে গাদা গাদা বই, কতক তাকের উপর, কতক ভুঁইয়ে পড়ে। খাটের পাশে দেওয়ালে ঝুলছে পিজ-বোর্ড কাগজে আঁটা একখানা ব্যঙ্গ-চিত্র। নাম, "কালা আদমী কে?" বিলেতের প্রধান মন্ত্রী সল্‌স্‌বেরী গায়ের জ্বালায় একদিন দাদাভাইকে black man বলে-ছিলেন। সেই উপলক্ষে এই চিত্র একখানা বিলেতী কাগজে বেরিয়েছিল। চিত্র দেখে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না, যে দাদাভাই মন্ত্রী মহাশয়ের চেয়ে অনেক ফরসা ছিলেন।

আমরা নবভারত সভা বলে এক সমিতি করেছিলাম। ফি শনিবারে কারও না কারও বাসায় বৈঠক জমত। সমিতির কাজ-সম্বন্ধে কোন ঢাক-ঢাক গুড় গুড় ছিল না। বিজ্ঞাপনাদি খোলা পোষ্টকার্ডেই যেত। তা ছাড়া, অল্পদিনের মধ্যেই ভারতসচিবের একজন এল্‌চী এসে আমাদের সমিতিতে দাখিল হলেন। তিনি কি আব বলেছিলেন যে তিনি সরকারী আদমী! বরং ভারতজননীর জন্য আমাদের চেয়েও বেশী ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। তবে ভাবগতিকে বোঝা গেল যে তিনি আমাদের মতন বোকা নন, সমিতি করে দু পয়সা রোজগার কবছেন। বলা বাহুলা, আমাদের রাষ্ট্রনীতি আমাদের বয়সের যোগ্যই ছিল, অর্থাৎ বেজায় গরম। আমাদের দুই একজন মুরুব্বীর নাম করলেই পাঠক আন্দাজ করতে পারবেন যে কত গবম। হাত কাটা ফিনিয়ান মাইকেল ডেভিট্, যিনি সেই সবে দশটী বছর জেল খেটে বেরিয়ে

এসেছিলেন, সোশিয়ালিষ্টদের বড় কর্ত্তা হাইণ্ডম্যান, মজুর-দলের তুর্দ্দান্ত নেতা টম ম্যান, এঁরাই আমাদিকে সলা-পরামর্শ দিতেন। নবভারতের দল ধীরে ধীরে বেড়ে চলল। গরম ভাবনা ও গরম বাক্য (কার্য্য ছিলই না, গরম কি ঠাণ্ডা !) আমাদের বয়সের লোকের বেশ ভালই লাগত। ক্রমশঃ দেখা গেল যে অনেকে শনিবার সন্ধ্যায় অন্য ভালমন্দ আমোদ উত্তেজনা ছেড়ে দিয়ে আমাদের বৈঠকে আসতে আরম্ভ করলে। এতে, আর কিছু হোক আর না হোক, তাদের পয়সা বাঁচত।

একদিন ডেভিট্ আমাদের তুই একজন দলপতির কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। সেই প্রস্তাব মত কাজ হলে ভারতের রাজনীতির একটু তফাৎ হত বই কি! ডেভিট্ বললেন, “আমাদের আইরিশ দলের বড় অর্থাভাব। তোমরা যদি বছরে আট লক্ষ টাকা নগদ দাও, ত তোমাদিকে আয়র্লণ্ডের আটটা seat, মেম্বরের জায়গা, দিতে পারি। বিলেত সংক্রান্ত সব বিষয়ে তোমাদের আট জনকে আইরিশ নেতার হুকুম মাফিক ভোট দিতে হবে, আর ভারত সংক্রান্ত বিষয়ে আইরিশ দল তোমাদের তরফে ভোট দেবে। রেডমণ্ডের সঙ্গে কথা কয়েছি। আমি তাঁকে রাজী করতে পারব। তোমরা কংগ্রেসের কর্ত্তাদের বলে টাকাটার ব্যবস্থা কর।” এ কথায় কিন্তু দাদাভাই কানই দিলেন না। বললেন, “ও রকম কূটনীতিতে ভারতের উদ্ধার সাধন হবে না।” বোধ হয়, ‘অভদ্র’ কথাটাও বলেছিলেন। তখন বিক্টোরীয় ইংলণ্ডের ভব্যতা আমাদের মজ্জায় ঢুকেছে কি না!

একবার আমরা নওরোজী সাহেবকে খুব জোর জবরদস্তি করাতে তিনি প্রকাশ্য সভায় সরকারকে কড়া কড়া দু কথা শোনাতে রাজী হলেন। বেশ জোর একটা মন্তব্যের খসড়া হল। আমরা মহা উৎসাহে কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। ইংরেজ সাধারণের মনেও বেশ একটু উত্তেজনা দেখা গেল। কিন্তু হঠাৎ আগের দিন আমাদের কানে এল যে একজন খুব সিনিয়ার ছাত্র মিঃ নওরোজীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে সভায় বক্তৃতা করবেন। তখন আর কিছু করবার সময় নেই। লোকটাকে, দরকার হলে, তুলে রাস্তায় ফেলে দিতে হবে, এই স্থির করে পরের দিন আমরা চোখ পাকাতে পাকাতে সভায় গিয়ে বসলাম। আমরা ভব্যতার ধার ধারতাম না। এই আমাদের একটা বড় গর্ব্বের বিষয় ছিল। দাদাভাই যখন রায়কে ডেকে পাঠালেন, আমরা ভাবলাম একটা কিছু রফার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা আরও গরম হয়ে উঠতে লাগলাম। একটু পরে রায় একখানা কাগজ এনে আমাদের সামনে ফেলে দিয়ে বললে, "এই M-এর amendment, দাদাভাই বলছেন যে এতে তোমাদের কোন আপত্তি থাকার ত কথা নয়!" পড়ে দেখি amendment-টা আসল মন্তব্যের চেয়েও বেশী কড়া। আমরা আনন্দে হাত তালি দিয়ে উঠলাম। একজন ছাত্র বিশ্বাসঘাত করবে, এ চিন্তা আমাদের অসহ্য হয়েছিল। M খুব জোর বক্তৃতা করলেন। বোম্বাই বন্দর ও বষ্টন বন্দরের নাম করে সরকারের উদ্দেশে যে সব কথা বললেন, তা আজকের দিনে বলা চলে না। খুব হৈ হৈ করে মিটিং ভঙ্গ হল।

যথাকালে এই সভার খবর দেশে পৌঁছল। বোম্বাই ও কলকাতার প্রবীণ মহারথীরা বড় বিচলিত হলেন। বৃদ্ধ দাদাভাই কতকগুলো বাপে-তাড়ান মায়ে-খেদান ছোঁড়ার পাল্লায় পড়ে কংগ্রেসের চিরন্তন নীতির মাথায় মুগুর মারবেন! এ তাঁরা কেমন করে সহ্য করবেন? দু পাঁচখানা কাগজে লিখলে, যে বৃদ্ধ দাদাভাইয়ের ভীমরতি ধরেছে, তাঁর আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই। আমরা শুনে আগুন হয়ে উঠলাম। এত বড় আস্পর্দ্ধা! একমাত্র স্বার্থত্যাগী দেশনেতা নওরোজী, তাঁকে কি না এই সব কথা বলে! আর বলে কে, যত স্বার্থসর্ব্বস্ব পেট-মোটা উকীল বাবুরা! আমাদের দুই একজন তৎক্ষণাৎ দেশে ফিরে গিয়ে practical steps নেওয়ার কথা উত্থাপন করলেন। কিন্তু হঠাৎ কর্ম্মবীর হওয়ার মত উদ্যম আমাদের কারও, বোধ হয়, ছিল না। শেষ, অনেক পরামর্শের পর স্থির হল যে আমরা দাদাভাইয়ের এক শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি করিয়ে দেশে পাঠাব। খবর নিয়ে জানা গেল যে প্রায় তিনশো পাউণ্ড খরচ পড়বে। অত টাকা আমরা কোথায় পাব! আমাদের একশো পাউণ্ড জমা হল। তাই নিয়ে ওয়েডারবার্ণ সাহেবের কাছে দুই একজন গেলেন। এই সাহেব একজন যথার্থ ভারতবন্ধু ছিলেন, আর দাদাভাইকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমাদের সব রকমে সাহায্য করতে রাজী হলেন, কিন্তু বেঁকে দাঁড়ালেন দাদাভাই নিজে। তিনি বললেন, "আমার মূর্ত্তির সাধ হয়, ত মুখের একটা কথা খসালেই ত আমার বন্ধু তাতা কাল একটা মূর্ত্তি খাড়া করে দেবেন। তোমরা গরীব ছাত্র,

আমার বন্ধু, তোমাদের পয়সা আমি কেন নেব।” আমরা তখন প্রস্তাব করলাম যে আমরা সারা ভারতময় চার চার আনা চাঁদা সংগ্রহ করে টাকা তুলব। তাতে ত কোন আপত্তি থাকতে পারে না! ওয়েডারবর্ণ এই প্রস্তাবে দাদাভাইকে রাজী করালেন। তখন আমরা ভারতের সর্ব্বত্র কংগ্রেস আপিসে চিঠি পাঠালাম যে আমাদের একশো পাউণ্ড তৈয়ের আছে, তাঁরা সকলে চেষ্টা করে আর দুশো পাউণ্ড তুলে দিন। সকলে দেখুক যে, দাদাভাই দেশের বিশ্বস্ত নেতা! সুরেনবাবু ও গোখলে আমাদের পত্রের একটা করে উড়ো রকমের জবাব দিলেন। সুব্রহ্মণ্য আয়ার লিখলেন, “এ প্রকার কার্য্যের সহিত আমার এখন কোনও সম্পর্ক নাই।” তিনি তখন হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। বাকী ছোট বড় নেতারা কেউ বা কাড়লেন না। আমাদের রাগও হল, দুঃখও হল। একজন বন্ধু বললেন, “দেশ এখনও জানে না, আমরা কে! একদিন চিনবে।” কথাটা বেশ শোনাল। কিন্তু আমাদের চেনা অতি সহজ। আমরা সেই চিরদিনের সোনার পাথরবাটি, কাঁটালের আমসত্ত্ব!

এই সব ঝড় তুফানের মাঝে আমার I. C. S. তরীখানা প্রায় তলিয়ে গেছল আর কি! কিন্তু হাল ছিল শক্ত হাতে, তাই শেষ পর্য্যন্ত কূল-কিনারা মিলল। তবে আমার তরী কূলে লেগে মঙ্গল হল কি না, কে জানে!

পরীক্ষার বছর-খানেক আগে কলেজটা ঝেড়ে ফেলে দিলাম। রেন সাহেব আমার মতন ভবঘুরের মাঝে কি দেখেছিলেন, জানি না। আমাকে এক বছর অর্দ্ধেক মাইনেতে

রাখতে চাইলেন। বললেন, "আমার টাকা মারা যাবে না। সে ভয় আমার নেই। পাস হয়ে দেশে ফিরে বাকী টাকাটা দিও।"

আমি বোঝালাম, "মহাশয় আমার পরীক্ষা দেওয়া হয়ত হয়ে উঠবে না। আপনি কেন মিছেমিছি টাকা নষ্ট করবেন। আমি পলিটিক্সে ঢুকব মনে করছি।"

সাহেব বললেন, "পলিটিক্স ত বেশ ভাল career (পেশা) হে! তোমার বুদ্ধিসুদ্ধিও একটু-আধটু আছে। কিন্তু তোমাদের দেশে ত পার্লামেণ্ট নেই, সেখানে কি পলিটিক্স করবে?"

আমি চেপে গেলাম। কি হবে পাগলের খেয়াল সব বুড়োকে বলে! শেষে বৃদ্ধের সঙ্গে এক রফা করলাম! আমি অন্য কোন কলেজে যাব না, আর যদি পাস হই, ত তিনি আমাকে তাঁর ছাত্র বলে দাবী করতে পারবেন। আমি এত গোলমালেও পড়াশুনো বন্ধ করি নেই। তবে পড়াটা দাঁড়িয়ে গেছল একটা গৌণ কাজ। আর নানা রকমের ধান্দাবাজি হয়ে দাঁড়িয়েছিল মুখ্য কাজ। সাতানব্বই সালটা এই ভাবেই কাটল।

এই সালে পূজার সময় আমি স্যুইস্ দেশে বেড়াতে গেছলাম। কয়েক সপ্তাহ জেনিভায় কেটেছিল। যে ক্ষুদ্র হোটেলে থাকতাম, সেখানে ইংরেজ সমাগম বড় একটা ছিল না। আমি তাই মনের সাধে দিবারাত্র নবভারত পলিটিক্স আওড়াতাম। কতকগুলি নানা দেশের ভবঘুরে শ্রোতাও জুটেছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা খুব বক্তৃতা করছি, ইংলণ্ড

সম্বন্ধে দুই একটা বেশ অভদ্র কথাও বলেছি, এমন সময় এক প্রকাণ্ড ষণ্ডামার্ক লালমুখো ইংরেজ কোথা থেকে এসে উপস্থিত হল। আস্তে আস্তে আমার কাঁধে হাত রেখে বললে, "মাপ করবেন। আপনার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে। বাহিরে বাগানে আসবেন কি?" বলে বেরিয়ে গেল।

আমার প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। মনে হল, আমার জীবনে একটা মস্ত শুভ মুহূর্ত্ত এসেছে। এক বছর থেকে আমি কিরীচ খেলা শিখছিলাম। পিস্তলও চলন-সই রকম মারতে পারতাম। বড় সাধ ছিল যে continent-এ দুই একটা duel লড়ব। এত দিন মোকা মেলে নেই। আজ বিধি মুখ তুলে চেয়েছেন! কাছে বসেছিল এক ফরাসী বন্ধু। তার পিঠ জোরে চাপড়ে বললাম, "ভাই, আমার সেকেণ্ড হবি ত?" সে হেসে ঘাড় নেড়ে বললে, "Mais oui, mon ami, নিশ্চয় হব! কিন্তু ইংরেজ লড়বে না।"

আমি বাহিরে যেতেই ইংরেজ ভদ্রলোকটী একটু হেসে বললেন, "বসুন, মশায়। আচ্ছা, আপনি এই হতভাগা বিদেশীগুলোর কাছে ইংলণ্ডের নিন্দা করেন কেন, বলুন দেখি!"

আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। খুব নাট্কে ঢঙ্গে বললাম, "আমি ইংরেজ নই, ইংলণ্ডের নিন্দা কেন করব না! আমি সত্য কথাই বলে থাকি, মিথ্যা নয়। তার প্রমাণ চান ত দিতে পারি।"

ইংরেজ তখন হাসছে। বললে, "হলেই বা সত্য!

নিজেদের ঘরের কথা কি অপরকে বলতে আছে? পার্লামেণ্টে জানালে নিশ্চয় প্রতীকার হবে।"

আমি দু পা এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিলাম, "যে আসামী, তাকেই বিচারক করতে আমি প্রস্তুত নই। কিন্তু তর্ক বিতর্ক বৃথা। আপনি পিস্তল ছুড়তে পারেন?"

লোকটা হো হো করে হেসে উঠল, "ওহো! তোমার ফন্দী এতক্ষণে বুঝেছি। তুমি আমাকে duel লড়াতে চাও! আমি লড়ব না। সাফ বলে দিচ্ছি, my lad, লড়ব না।" তার পর সে আমাকে টেনে পাশে বসালে। বসিয়ে বললে, "দেখ, তুমি ত তর্ক করবে না। আমিও লড়ব না। বস, দুজনে একটু গল্প গুজব করা যাক।"

ধীরে ধীরে আমার বীররস উবে গেল। সাহেব বাস্তবিক চমৎকার লোক! এক ঘণ্টা দুজনে বসে গল্প করলাম। উঠবার সময় সে বললে, "বন্ধু, সে দিন এখনও আসে নেই। এখন থেকে রাগারাগি করে কি হবে! তবে বিনা যুদ্ধে আমরা ভারতবর্ষ ছাড়ব না, এটা নিশ্চিত।"

১১

জেনিভা আজ আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। কিন্তু চিরদিনই নির্ভীক, স্বাধীন, অভিনব চিন্তার সঙ্গে এই জায়গাটার কেমন একটা যোগ ছিল। সেকালে পোপের শক্তিকে যারা সব চেয়ে জোরে নাড়া দিয়েছিলেন, সেই কাল্‌ভিনিষ্ট্‌ সম্প্রদায়ের

আড্ডা ছিল জেনিভা। তার পরের যুগে যে দু জন মহাপুরুষ অবাধ-রাজশক্তির ধ্বংসের সূত্রপাত করেন, তাঁদের সঙ্গেও এই জেনিভার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। রেল ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে আসতে প্রথমেই নজর পড়ে হ্রদের মাঝে রুসোর দ্বীপ। শহরের অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে কোশ দশেক গেলেই, ফরাসী সীমান্তের পরপারে ফেয়ার্ণে গ্রাম! সেখানে আজও ভলতেয়ারের শাতো (আবাস) দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাগানে ভলতেয়ারের মূর্ত্তি। মুখে তাঁর বিদ্রূপের হাসি। দেখলে মনে হয়, যেন বলছেন—রাজা! কে রাজা! Un soldat heureux, নসীবদার সিপাহী বই ত নয়! আমি কয়েক হপ্তা সাধ মিটিয়ে এই Lac Leman-এর ঠাণ্ডা হাওয়া খেয়েছিলাম। আশ্চর্য্য হাওয়া! এতে প্রাণের আগুন নেভে না, বরং দ্বিগুণ জোরে জ্বলে ওঠে।

আমি যে হোটেলে বাস করছিলাম, সেখানে একদিন লম্বা চোগাপরা দুজন উত্তর আফ্রিকার শেখ এলেন। এঁরা জাতিতে, যাকে বলে, মূর। বয়সে প্রৌঢ়। মূর্ত্তি শান্ত গম্ভীর। তাদের সঙ্গে আমি যেচে আলাপ করলাম। তাঁরা বললেন যে ইসলাম জগৎ সম্বন্ধে এক সভা হবে, তাইতে উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশে এখানে এসেছেন। পরদিন বেড়াতে গিয়ে লেকের কিনারে দেখলাম অনেকগুলি তূর্কী যুবক বেড়াচ্ছেন। তাঁদের সব গায়ে কাল সাহেবী পোষাক ও মাথায় লাল Fez-টুপী। আমার শেখদের কাছে খবর পেলাম তাঁরা তূর্কী ও মিশরী তরুণ দল, তাঁরাও ইসলামী সভার জন্য এখানে এসেছেন। দিন দুই বাদে আমাদের

হোটেলেই এঁদের সভা হল। সকাল বেলায় আমি লাইব্রেরী ঘরে বসে বিলেতী ছবির কাগজগুলো দেখছি, এমন সময় ছুজন সুদর্শন তুর্কী যুবক এসে চোস্ত ফরাসীতে বললেন, "ম্যসিয়, আপনার অনুমতি পেলে আমরা এই ঘরে বসে আমাদের একটু জরুরী কাজ করে নিই।" বুঝলাম যে আমাকে সরে পড়তে বলছেন। বেরিয়ে গেলাম। ঘণ্টা ছুই চারিদিক বন্ধ করে ওঁদের মন্ত্রণা সভা চলল। বেরিয়ে যাবার সময় সেই তুর্কী যুবক ছুটী বাগানে আমার সঙ্গে ছুদণ্ড কথা কয়ে গেলেন। এঁদের এক জন কায়রোর রাষ্ট্রীয় নেতা মুস্তাফা কামাল, অন্য জন ইস্তাম্বুলের আনোয়ার বে। মুস্তাফা বেশীদিন বাঁচেন নেই। তবে যতদিন ছিলেন তার মধ্যেই লোকের শ্রদ্ধাভক্তি যথেষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁর আল্-লেওয়া কাগজের একদিন খুব নামডাক ছিল। অন্য ভদ্রলোকটীর কথা আর কি বলব! স্বাধীন তুর্কীর ছুর্দ্ধর্ষ জেনারেল Enver Pasha'র নাম কে না শুনেছে। আমি কিন্তু তখন এঁদের পরিচয় জানতাম না। তাই ভারতের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সবেগে নিজের মত জাহির করেছিলাম। আনোয়ার যাবার সময় বলে গেলেন, "আপনারা কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের হাত না করতে পারলে আপনাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের ব্যবস্থা আমরা ত একরকম করে এনেছি। ছুই এক বছরে সবাই জানতে পারবেন।"

সুইৎসারলণ্ডে থাকার সময় আমি অনেকগুলো ছোট ছোট পাহাড় চড়েছিলাম। চার পাঁচ হাজার ফুট উঁচু চূড়া ওদেশে অনেক আছে। আমার সাধ ছিল সেগুলো চড়ে চড়ে

কতকটা অভ্যাস হলে পরের বছর বরফের পাহাড়ে (Mont Blanc) উঠব। কিন্তু মঁ ব্লাঁ চড়া ব্যয়-সাপেক্ষ। দেশে টাকার জন্য দরখাস্ত করলাম। মঞ্জুর হল না। কাজেই আবার—উত্থায় প্রবিলীয়ন্তে দরিদ্রস্য মনোরথাঃ। যাক, সে পরের কথা। ইতিমধ্যে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে লাগলাম। সালেভ, (Salevo) চড়বার সময় এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। সে গল্পটা করি। হয়ত তাতে আমার মূর্খতা প্রমাণ হবে। কিন্তু মূর্খতা ছাড়াও আর পাঁচ রকম ভাব যে বিদেশী বাঙ্গালী ছেলেদের মনে খেলে বেড়ায় তারও কিছু আভাস পাওয়া যাবে বই কি! সালেভ-এর পথে এক জার্ম্মানের সঙ্গে আলাপ হল। তার টুপীতে পালক লাগান। হাতে লম্বা লাঠি। নানা রকম লম্বা চওড়া কথা কয়ে শেষ আমাকে টীপ্পনী কাটলে, "তুমি ত বাঙ্গালী, সমতল দেশের মানুষ। তুমি কি একদমে সাড়ে চার হাজার ফুট চড়তে পারবে?" "তুমি ত বাঙ্গালী", কথাটা গিয়ে একেবারে মর্ম্মস্থলে বিঁধল। আমি একটুও দ্বিধা না করে উত্তর দিলাম, "হয়ত সুইস কি হাইলাণ্ডারের কাছে হার মানতে পারি, কিন্তু মশায়, তোমার অনেক আগে চূড়ায় পৌঁছাব।" সে হেসে বললে, "দেখা যাবে।"

চড়াই আরম্ভ হতেই আমি খুব বেগ দিলাম। লোকটাকে অনেক দূরে ফেলে হন হন করে এগিয়ে যেতে লাগলাম। যাঁরা পাহাড়ে চড়েছেন তাঁরাই জানেন যে এর বাড়া আর মূর্খতা নেই। নিজের দমটাকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে চড়াই ভাঙ্গতে হয়। কিন্তু আমার কি তখন অত বুদ্ধি ছিল!

"বাঙ্গালী বলে ব্যাটা টিটকারী দিয়েছে: ওকে খতম করবই!" এই এক চিন্তা আমার মনে। যখন অর্দ্ধেক পথ উঠেছি, হঠাৎ মনে হল যেন চারিদিক অন্ধকার; আর বুকটা যেন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। উপস্থিত বুদ্ধিমত তৎক্ষণাৎ সেই পথের ওপর চিৎ হয়ে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম। মিনিট পাঁচেক ওই অবস্থায় থেকে যন্ত্রণাটা কমে গেল। ইতিমধ্যে এক ফরাসী-দম্পতি সেই পথে আসছিলেন। তাঁরা আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মহিলাটী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে, অত দৌড়ে চড়াই উঠছিলেন কেন?" আমি উঠলাম। তাঁদের সঙ্গে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে জার্ম্মান বাবুটীর গল্প করলাম। ফরাসী ভদ্রলোক নাক সিঁটকে বললেন, "ওদের স্বভাবই ওইরকম। বড়াই বড্ড ভালবাসে!" তিন হাজার ফুটের ওপর এক ছোট্ট কাফিখানা ছিল। ফরাসীরা সেইখানে সরবৎ খেতে বসলেন, আমি সর্দ্দি-গরমির ভয়ে কিছু খেলাম না, এক বেঞ্চে বসে তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। একটু পরে জার্ম্মানটী এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে উপহাস করলেন, "কি হে, তোমার হয়ে গেছে ত!" আমি বললাম, "হ্যাঁ, আপনি এগোন, মশায়।" সে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল। তখন আমি কাফিখানার বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "একটা চাকর আমার সঙ্গে দিতে পার, যে আমাকে বনের মধ্যে দিয়ে সোজা পথ দেখিয়ে দিতে পারবে?"

তিনি এক ছোকরাকে সঙ্গে দিলেন। সে সোজা খাড়া পথে আমাকে অল্পক্ষণের মধ্যে চূড়ায় পৌঁছে দিলে। প্রায়

আধ ঘণ্টা পরে Mein Herr (জার্ম্মান বাবু) আবির্ভূত হলেন। তখন আমি এক বেঞ্চে কাত হয়ে পড়ে পাইপ খাচ্ছি। আমাকে দেখে ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, কতক্ষণ?" আমি উত্তর দিলাম, "অনেকক্ষণ এসেছি, মশায়। আমরা বাঙ্গালীরা সুবিধা পেলেই পাগদাণ্ডি বেয়ে পাহাড় চড়ি।"

ফস্ করে মুখ দিয়ে এই সত্য কথাটা বেরিয়ে গেল। বাঙ্গালী জাতটার দোষই বলুন, আর গুণই বলুন, ত এই, যে ক্রমাগত শর্ট-কাট খুঁজছে।

একবার আমার এক বন্ধুবর ও আমি ছোট এক খেয়া জাহাজে নর্থ-সী পার হচ্ছি। সমুদ্র সেদিন প্রথম থেকেই একটু অশান্ত ছিল। জল যেন ফুলছিল। শেষের দিকটায় জোরে তুফান উঠল। জাহাজ ভীষণ রকম দুলতে আরম্ভ করলে। মাল্লারা পেসেঞ্জারদের ধরে সব জাহাজের খোলে বন্ধ করে দিলে। আমরা কাপ্তানের হাতে পায়ে ধরে উপরেই রইলাম। দাঁড়ান যাচ্ছিল না, কোন রকমে দুজনে রেলিং ধরে ঝুলছিলাম। মাঝে মাঝে জাহাজের গায়ে বড় বড় ঢেউ ভেঙ্গে জল উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমাদের কাপড় ভিজে সপ্ সপ্ করতে লাগল, কিন্তু কি আনন্দ! একবার একজন মাল্লা এসে জিজ্ঞাসা করে গেল, "আপনারা নীচে যাবেন না?" আমরা বুক ফুলিয়ে বললাম, "না"। "আচ্ছা, সাবধানে থাকবেন।" বলে সে হাসতে হাসতে চলে গেল। সুহৃদ্বরের উৎসাহ আমার চেয়েও বেশী। তিনি বলতে লাগলেন, "এই রকম করে আমরা দাঁড়িয়ে থাকব শেষ পর্য্যন্ত! কাল

দেশ-বিদেশে সবাই জানবে যে ঘোর বিপদের মাঝে দুটী বাঙ্গালীর ছেলে কেমন শান্ত ধীরভাবে তলিয়ে গেছে, প্রাণ বাঁচাবার জন্য নির্লজ্জ হুড়োহুড়ি কামড়াকামড়ি করে নেই।” জাহাজ কিন্তু ডুবল না। হয়ত ডোববার সত্যি ভয় কখন ছিল না। যখন আমরা শেল্ড নদীর শান্ত জলে পৌঁছে গেলাম, বোধ হল যেন বন্ধুবর একটু নিরাশই হলেন।

রিগি-র (Righi) চূড়ায় উঠবার সময় আমার সঙ্গে জুটেছিল বিখ্যাত সিবিলীয়ান রিসলী সাহেবের এক পুত্র। দিব্যি ছেলেটী! পাব্লিক স্কুলের ছাত্র। হাসিহাসি মুখ। খোলা মন, চমৎকার মেজাজ। আমার কু-পরামর্শে আড়পথে পাহাড় চড়তে গিয়ে মিছেমিছি দুঘণ্টা বেশী ঘুরতে হল। বেচারা ছেলেমানুষ, একেবারে কাবু হয়ে পড়ল, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও মেজাজ খারাপ করে নেই। সন্ধ্যাবেলা ষ্টীমারে লুসার্ণ ফেরবার সময় আবার ঝড় উঠল। নিতান্ত মন্দ ঝড় নয়। একটুক্ষণ সবাই ভয় পেয়ে গেছল। কিন্তু এ ছোকরার দৃকপাতও নেই। যাই হোক, সন্ধ্যাবেলা তাকে তার মার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

রিসলীদের Sylvia বলে একটী ছোট্ট ছবছরের মেয়েও এই হোটেলে ছিল। সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। নীল চোখ, সোনার বরণ চুল। সর্ব্বদা যেন প্রজাপতিটীর মতন উড়ে বেড়াত। আমার সঙ্গে তার বড় ভাব হয়েছিল। ক্রমাগত পালিয়ে পালিয়ে আমার কাছে এসে হিন্দীতে গল্প করে যেত। হিন্দী কইলে তার মা কিন্তু রাগ করতেন। বলতেন, “এত বড় মেয়ে হয়েছিস, এখনও নেটীব ভাষায় কথা কওয়া কেন?”

ভদ্রমহিলা আমাকে একদিন বললেন, "কি জানেন, ভদ্রলোকের হিন্দী ত ও কইতে জানে না! চাকরদের ভাষা শিখেছে। ওটা যত শীঘ্র ভুলে যায় সেই ভাল।" আমি হেসে বললাম, "আমার কাছে ত আর চাকরদের ভাষা শিখবে না! আপনি এ কটা দিন আর ওকে কিছু বলবেন না।" এই হিন্দী বলা নিয়ে একদিন ভারী রগড় হল। আমি হোটেলের বারান্দায় বসে আছি, Sylvia আমার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অনর্গল বকে যাচ্ছে। কাছে কয়েকটী আকাঠ অজ-ব্রিটিশার মেয়ে পুরুষ বসেছিলেন। তাঁরা আমাদের দুজনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন। আমি অতটা নজর করি নেই। Sylvia আমাকে কানে কানে বললে, "ওরা কি দেখছে?" হঠাৎ তাদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "মাপ করবেন, মহাশয়। আপনি কোন দেশের লোক?" আমি উত্তর দিলাম, "আমি ভারতবর্ষের লোক।" ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করে Sylvia কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর তুমি, ডারলিং?" ডারলিং অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, "আমিও ইণ্ডিয়ান। শুনছেন না, আমরা হিন্দুস্থানীতে গল্প করছি?" ভদ্রলোক একটু আমতা আমতা করে আমাকে আবার বললেন, "কিন্তু আপনারা দুজন ত মোটেই এক রকম দেখতে নন! মাপ করবেন এ কথা বলছি বলে।" আমি হেসে উঠলাম, "এক দেশের সব লোক কি এক রকম দেখতে হয়, মশায়!" লোকটী আরও ভ্যাবাচাকা লেগে গেল দেখে আমার দয়া হল। আমি বললাম, "আপনার ভয় নেই। মেয়েটী আপনারই মতন ইংরেজ। আমার দেশে জন্মেছে মাত্র।

ওর বাপ মা ভারতবর্ষেই যাবজ্জীবন কাটিয়েছেন।” Sylvia নাছোড়বান্দা; খুব জোরে ঘাড় নেড়ে বললে, “কিন্তু আমি ইণ্ডিয়ান।” বৃটিশ দলটী কি বুঝল, কে জানে! বোধ হয় মনে করলে আমরা দুজনেই ফিরিঙ্গী। রিসলী সাহেবকে গল্পটা বলাতে তিনি হেসে উঠলেন, “আর দিন কয়েক বাদে কোন ইংরেজ নিজেকে ইণ্ডিয়ানও বলবে না, এংলোইণ্ডিয়ানও বলবে না।” হয়েছেও তাই!

১৮৯৮ সালে শীতকালে বাড়ী থেকে কড়া হুকুম এল যে আমাকে পরীক্ষা দিতে বসতেই হবে, চাকরী নেওয়া না নেওয়া তাঁরা পরে বিবেচনা করবেন। কাজেই কেতাব-পত্র নিয়ে এক অজ-পাড়াগাঁয়ে বসে মাস তিনেক খুব লেখা পড়া করে এলাম। কতকটা সেই লেখাপড়ার ফলে, আর অনেকটা নসীবের জোরে, পাস হয়ে গেলাম। এখানেই বলে রাখি, যে শেষ পর্য্যন্ত চাকরীও নিতে হল। বাঁধন ছেঁড়বার মতন শক্তি আমি কোনদিন সঞ্চয় করতে পারি নেই।

একবার এক বাঁধা বেলুনে চড়েছিলাম। সে দিন খুব জোরে হাওয়া দিচ্ছিল। চারিদিকে লোকের রুমাল নাড়া আর হুররে হুররে রবের মাঝে যখন আমার বেলুন হেলে দুলে আকাশ পথে উঠল, তখন কি ফর্ত্তি, কি আনন্দ! মনে হতে লাগল যেন আমি একজন রীতিমত বিমানচারী হয়েছি। কিন্তু হাজার বারশো ফুট ঊর্দ্ধে উঠে বাঁধনের রশি গেল ফুরিয়ে, রথও গেল থেমে। আধ ঘণ্টা খানেক উপরে খুব দোল খেলাম বটে, দূরবীন ধরে চারিদিকের দৃশ্যও দেখলাম, কিন্তু শেষে ভাল মানুষটীর মতন আবার ভূপৃষ্ঠে নেমে আসতে হল।

মুহূর্ত্তেক আশা হয়েছিল যে, দমকা হাওয়ার জোরে দড়ী ছিঁড়বে ছটকে বেরিয়ে যাব এক দিকে। কিন্তু শক্ত বাঁধন, ছিড়ল না।

শেষ বছরটা বেশীর ভাগ উলউইচে কাটালাম। সেখানে পলটনী আবহাওয়াতে বেশ লেগেছিল। কেডেটদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়তাম। নানা রকমের বাচ্চা অফিসারের সঙ্গে আলাপও হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আমার খুব বনত। চিরকালই এটা দেখে এসেছি যে আমাদের সিবিলীয়ানের চেয়ে এই জঙ্গী-অফিসাররা লোক ভাল! ওদের মুখে এক, মনে এক নেই। একটা সরল ছেলেমানুষী ভাব ওরা অনেক দিন বজায় রাখতে পারে।

ঘোড়ায় ত ছেলেবেলা থেকেই চড়তাম কিন্তু উলউচের চড়া দেখলাম একটু আলাদা রকমের। শুধু ঘোড়া ছোটালেই হবে না, বসার কায়দা, রাশ ধরার কায়দা, সব নির্ভুল হওয়া চাই। কাজেই যত্ন করে ফিরে-ফিরতি সব শিখতে হল। রেকাব ছেড়ে দিয়ে, রাশ ছেড়ে দিয়ে, দৌড়ান, লাফান, এও কেডেটদের সঙ্গে করতে হত। সবই সযতনে করতাম। প্রাণে সদাই ভয় যে কেউ ভাববে—বাঙ্গালী, তাই ভয় পেয়েছে। বাঙ্গালীর ভয় পাওয়া কথাটা কিন্তু নিতান্ত বাজে। মায়ের আঁচলে বাঁধা না থাকলে বাঙ্গালীও যা, অন্যেও তা। বাঙ্গালী যারা নয়, তাদিকেও যথেষ্ট ভয় পেতে দেখেছি উল-উইচে। এক মিলিশিয়ার সাহেব একদিন বিনা কারণে ঘোড়া থেকে ধপ করে পড়ে গেল। ঘোড়াটা কিছুই করে নেই, একটু তাজা ছিল, এই মাত্র। সার্জ্জেণ্টরা যখন তাকে তুলতে

গেল সে তখন বেহোস, সেরেফ ভয়ে। ওখানে ত ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রথা ছিল না! লোকটাকে ঝট করে ষ্ট্রেচারে তুলে হাঁসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তার তাকে খুব বকে ধমকে দশ মিনিট পরে ফিরে পাঠিয়ে দিলেন। আবার ঘোড়ায় চড়তে হল।

উলউইচের একটা মজার গল্প বলি। আমার Land-lady, বাড়ীওয়ালী, একদিন তড়বড় করে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "স্যার, আপনি কি বাঙ্গলা দেশ থেকে এসেছেন?" আমি উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, I have that honour. কিন্তু তুমি কি করে জানলে?" "নীচেতলার কাপ্তান অমুক বলছিলেন। আপনাকে আজ আমি বেঙ্গল কারী-ষ্টু রেঁধে খাওয়াব।" আমি প্রমাদ গণলাম। কি খাইয়ে বুড়ীটা আমাকে বধ করবে দেখছি! তখনকার দিনে কারী জিনিসটাকে লোকে সন্দেহের চোখে দেখত। মাংস বেশ একটু বাসি না হলে তাকে কারী করা হত না। সন্ধ্যা-বেলায় খেতে বসে কিন্তু দেখি যে ভাতের সঙ্গে এক ডোঙ্গা ভরে মাছের ঝোল দিয়েছে। ঠিক আমাদের বাড়ীর ঝোলের মতন দেখতে। মালেট মাছ, আলু কপি কড়াইশুঁটী দিয়ে বুড়ী অতি উপাদেয় পদার্থ রেঁধেছে। একবার মনে হল হাতে করে শপাশপ খাওয়া যাক। কিন্তু সাহসে কুলাল না। যাই হোক, কাঁটা চামচ দিয়েও ডোঙ্গাটা সাবাড় করতে বেশী সময় লাগল না। বাসন তুলতে এসে বুড়ী এক গাল হেসে বললে, "আমি ত জানতাম না, আপনি বাঙ্গালী! আমি যে অনেক বছর বারাকপুরে ছিলাম, স্যার! আমার স্বামী

সেখানে পল্টনের সার্জ্জেণ্ট ছিলেন।" এর পরে কয়েক সপ্তাহ ধরে নানা জিনিসের বেঙ্গল কারী-ষ্টু খাওয়া হল। লণ্ডনের মিত্র-মণ্ডলীও এসে পরখ করে গেলেন। বুড়ী অনেক বক-শীস পেলে। আমাদের সময় লণ্ডনে এখনকার মতন দেশী খাবারের হোটেল ছিল না। একবার মাস তিনেকের জন্য মিস সোরাবজীর ভগ্নী বণ্ড ষ্ট্রীটে ধূম করে এক রেস্তরাঁ খুলে-ছিলেন। কিন্তু চালাতে পারলেন না। আমাদের নির্ভর ছিল মিসেস টার্ণার বলে এক বাড়ীওয়ালীর উপর। সে ফরমায়েশ পেলে পোলাও কোর্শ্মা কাবাব পরেটা রেঁধে দিয়ে যেত। কিন্তু dear old মাছের ঝোল, আর কোথাও পাই নেই!

কলকাতায় ছাত্র-অবস্থায় আমরা যেমন ছুটো মুরগীর কাটলেটের লোভে অসাধ্যসাধন করতাম, বিলেতেও তেমনি দেশী খাবারের, সামান্য কারী-ভাতটীর পর্য্যন্ত, গন্ধ পেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাতাম। একটা গল্প বলি। একবার আমার দিদি দেশ থেকে এক বড় বাক্স ভরে নানা রকমের বড়ি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন, "ছুটী ছুটী করে খাস, ও বড়ি ছমাস চলবে।" যেদিন বড়ি এসে পৌছল, তার পরদিন কোথা থেকে একেবারে জনা আষ্টেক অনশনক্লিষ্ট বন্ধু বাড়ী চড়াও হয়ে এসে বললেন, "এই, তোর কাছে আজ চা খেতে এসেছি।" রুটী দিলাম, মাখন দিলাম, সার্ডিন মাছ দিলাম, কেক কিনে এনে দিলাম, সব খেলে। তার পর একজন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "এইবার তোর বড়ি বার কর দেখিনি।" কোথা থেকে জানলে এরা,

কে জানে! কি করি, এক লিপটন চায়ের কৌটা ভরা ভাজা-বড়ি এনে দিলাম। ঘরে আগুন জ্বলছিল। নিজেরাই বড়িগুলোকে মাখনে ভেজে নিলে। তার পর পোস্ত-বড়ি টোপা-বড়ি, মায় কুমড়ো-বড়ি পর্যান্ত, যা কিছু ছিল, একে একে পুড়িয়ে পুড়িয়ে নুন দিয়ে মেরে দিলে। আমাকে তুচারটে দেয় নেই, তা বলছি না। কিন্তু আমার ছয় মাসের খোরাক এক বেলায় লোপাট করলে! দিদিকে সেই মেলেই লিখে দিলাম, "এ তুর্ভিক্ষের দেশে আর বড়ি পাঠিও না।"

বিলেতে সব চেয়ে তুষ্প্রাপ্য পদার্থ ছিল লুচী। আমার এক বাড়ীওয়ালীকে আমি শিখিয়ে নিয়েছিলাম। কাজটা সহজে সাধিত হয় নেই। প্রথম দিন টেবিলে যে চীজ উপস্থিত হল, তাকে Dog Biscuit (কুকুরের বিস্কুট) ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তবে বুড়ী ভাল রাঁধুনী ছিল। যখন একবার বুঝতে পারলে লুচী দ্রব্যটা কি, তখন বেশী দেরী হল না। যে দিন প্রথম রসাল শুভ্র নিটোল লুচী টেবিলে এসে পৌঁছল, সে দিন কি ফূর্ত্তি। যত বা ফূর্ত্তি আমার, তত ফূর্ত্তি রাঁধুনীর। নূতন নামকরণ হল, Fried wafers। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুরেন্দ্রনাথ যখন ওয়েলবী কমিশনে সাক্ষী হয়ে বিলেতে এসেছিলেন, তখন একদিন আমার বাসায় এই লুচী খেয়ে গেছলেন। লুচী দেখে বৃদ্ধের কি আনন্দ! হেসে বললেন, "তোমরা যথার্থ ন্যাশনালিষ্ট হে! বিলেতে ভারতীয় সভ্যতা প্রচার করছ।"

সুরেনবাবুর সঙ্গে বিলেতে এসেছিলেন ওয়াচ্চা সাহেব ও গোপালরাও গোখলে। আমরা নব ভারতীয় দল, এঁদিকে

ষ্টেশনে স্বাগত করেছিলাম, ও একদিন বড় হোটেলে খানায় নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ওয়াচ্চা ও সুরেনবাবু ছিলেন বিচক্ষণ নেতা। তাঁরা আমাদের মতন অর্ব্বাচীন বালকের দলকেও অবজ্ঞা হেনস্তা করেন নেই। কিন্তু গোখলে নিজে তখন ছেলেমানুষ, প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাদিকে বিদ্রূপবাণে এমনই জর্জ্জরিত করেছিলেন, যে আমরা আর বড় একটা তাঁর কাছে ঘেঁসি নেই। আমার সব চেয়ে খারাপ লেগেছিল তাঁর বাঙ্গালীর উপর, কি বলব, হিংসা না বিদ্বেষ? আমি ভুলি নেই। বহুকাল পরে যখন সুযোগ পেয়েছিলাম, নব ভারতের ঋণ পরিশোধ করেছিলাম। এত বড় লোকের এই ছোট মন! রাগ হয় বই কি!

একটা কথা বলব? সুরেনবাবু আমাদের স্পষ্টই আদেশ দিয়ে এসেছিলেন যেন আমরা দেশে ফিরে একটা Extromist (গরম) দল গড়ে তুলি। আমার বেশ মনে আছে, তিনি বললেন, "ওতে দেশের অনেক মঙ্গল হবে। কিন্তু মনে রেখো, আমি প্রকাশ্যে তোমাদের গালাগালি দেব।" অবশ্য সত্যের খাতিরে এটাও এখানে উল্লেখ করতে হয় যে আমরা দেশে ফিরে কোনও দলই গড়ি নেই। আমি ত একেবারে আমলাতন্ত্রভুক্ত হয়ে পড়লাম। তবে আমাদের জন্য কি আর কোন কাজ আটকে ছিল!

আগেই বলেছি যে আমি ব্যারিষ্টার হওয়ার অভিপ্রায়ে Gray's Innএ খানা খাচ্ছিলাম। তখন আমাদের Inn ছিল কৃষ্ণকায় ছাত্রদের প্রধান আড্ডা। লোকে ঠাট্টা করে "এশিয়া মাইনর" বলত। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ

আবার নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ইংরেজ ছোকরাদের স্বভাবের দোষ এই যে নিরীহ লোক দেখলে তারা খোঁচা না দিয়ে থাকতে পারে না। এই খোঁচা দেওয়া নিয়ে কিন্তু নানা গণ্ডগোল বাধত। কেন না আমরা সবাই ত আর নিরীহ গোবেচারা ছিলাম না! ক্রমে এমন হল, রোজই একটা না একটা কিছু নিয়ে খিটিমিটি লাগত। কেবলই ভয় হত, কোন দিন একটা বড় কিছু বাধবে। পাঁচ রকম ভেবে আমি শেষে ডিনার খাওয়া ছেড়ে দিলাম। তখন পাস হয়ে গেছি, ব্যারিষ্টার হওয়ার সে রকম তাড়া ত আর ছিল না!

১৮৯৯ সালে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় লড়াই বাধল, তখন ইংরেজ জাতটার দেশপ্রেম এমনি গেঁজে উঠল, যে আমরা পাঁচজন বাইরের লোক [illegible] হয়ে পড়লাম। যেখানে সেখানে, যখন তখন, বিনা কারণে, গর্দ্দভবিনিন্দিত রাগে রাষ্ট্রীয়-সঙ্গীত চীৎকার শুনতে শুনতে কান ঝালা-পালা হয়ে উঠল। সভা-সমিতির ত কথাই নেই, একদিন থিয়েটারে একজন লোক গ্যালারী থেকে গেয়ে উঠল,

> **Till we have wiped the stain,**
> **Off Britain's name,**
> **Of black Majuba Hill.**

খানার কাপড় পরা Stalls-এর সাহেবরাও দাঁড়িয়ে উঠে গাইতে লেগে গেলেন! চিরদিন শুনে আসছিলাম যে ল্যাটিন জাতির লোকেরা বায়ুগ্রস্ত, তারাই এই রকম আত্মহারা হয়। ভব্য, শিষ্ট, ইংরেজের এ কি হল!

শেষ, এই রকম বাঁদরামি সুরু করলে আমাদের Inn-এর ডিনারেও। খানার টেবিলে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রীয়-সঙ্গীত জুড়ে দিত। আমাদের ভারী বিরক্ত বোধ হত। একদিন এই রকম মশগুল হয়ে গান চলেছে, সবাই দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচাচ্ছে, আমার এক বন্ধু স. ও আমি দাঁড়ালাম না। বড় বিরক্ত বোধ হল। বসেই রইলাম। অমনি চারদিক থেকে রব উঠল "দাঁড়িয়ে ওঠ, দাঁড়িয়ে ওঠ!" এ পর্য্যন্ত আমাদের গরম হয়ে ওঠবার কোন কারণই ছিল না। আমি বন্ধুবরকে বললাম, "চল ভাই, বাড়ী যাওয়া যাক। এদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" দুজনে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় কতকগুলো লোক হুয়ো (hiss) দিয়ে উঠল! আমরাও দাঁড়িয়ে পাল্টা হিস্ করলাম। আমাদের নসীব খারাপ। কেন না, ঠিক সেই সময়ে গান চলেছিল—God bless the Prince of Wales। সবাই ভয়ানক চটে গেল। মনে করলে আমরা মাননীয় রাজপুত্রের অপমান করছি। সেদিন মার খেতে খেতে বেঁচে গেছলাম। তবে মারটা, বোধ হয়, একতরফা হত না। যাই হোক, এ সব গল্প আজকের দিনে না করাই ভাল। বরং একটা মজার গল্প বলি। তার থেকে পাঠক বুঝবেন যে কি রকম সামান্য কথা নিয়ে ঝগড়া বাধত। একদিন আমার বন্ধু সেন ও আমি এক টেবিলে খাচ্ছি। পাশের টেবিলে খাচ্ছে তিন জন সাহেব ও একজন ভারতবর্ষীয় মুসলমান, নাম আবদুল লতীফ কমরুদ্দিন। তিন জনে মিলে তাকে ক্ষেপাতে আরম্ভ করলে ভারতবর্ষের কথা বলে। শুনলাম একজন

বলছে,"তোমাদের ইণ্ডিয়ান নামগুলো কি রকম অদ্ভুত লম্বা !" আমরা চুপ করে গেলেই পারতাম। তা নয়, দুজনে মার-মুখো হয়ে উঠে গেলাম সেই টেবিলের কাছে। লোকটাকে সেন বললে, "তোমার নামটা কি বল দেখি, Throgmorton, না Higginbotham? আমাদের দুজনের নাম Sen ও Dutt." সাহেবটা ফোঁস করে উঠল। এরকম ছোট-খাট ব্যাপার ত নিত্য হত! ভায়া আবদুল লতীফ কমরুদ্দিন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর নামটাকে কেটে ছেঁটে ছোট করেই নিলেন। ভারতবর্ষে ফিরে এসে তাঁর নূতন আখ্যা হল, আলমা লতীফী। আমাদের ঝগড়া করা বৃথায় গেল!

বিলাতের পর্ব্ব এইখানে শেষ করব। ১৮৯৯ সালের শেষের দিকে চাকরীর করার-নামা সই করে, সরকারের ছাড়-পত্র নিয়ে ফরাসী জাহাজে দেশমুখো রওয়ানা হলাম। স্বতন্ত্র জীবনের শেষ কটা দিন সমুদ্রবক্ষে বেশ কাটল। প্রকাণ্ড জাহাজ, লোকে ভরা। খেলা-ধূলোয়, নাচ-গানে, সবাই মশগুল। যেন কারও সংসারের ভাবনা চিন্তা নেই। অনেকগুলি পলটনের অফিসার এই জাহাজে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছে। তারাই সব চেয়ে বেশী হৈ-চৈ করছে। প্রাণ দিতে চলেছে ভদ্রলোকেরা, ওদের হৈ-চৈ করার অধিকার আছে বই কি! প্রতি বন্দরেই আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খারাপ খবর পাচ্ছিলাম। কিন্তু এই সৈনিক পুরুষদের পরোয়া নেই। আমি একজনের কাছে দরদ দেখাতে গেছলাম। সে গম্ভীরভাবে বললে, "Makes no odds, really !" এর মানে, বোধ হয়—কি এসে যায় হার জিতে!

সত্যিই ত, কি এসে যায়, যদি মরদের মতন জান দিতে পার! কত তফাৎ এদের সঙ্গে সেই লণ্ডনের বানরগুলোর, যারা স্থানে অস্থানে "Britannia rules the waves," গেয়ে লোককে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল!

পোর্ট সৈয়দ বন্দরে জাহাজে কেমন এক গানের জলসা দিয়েছিলাম, তার গল্পটা বলে আজকের মত বন্ধ করি। প্রায় চার বছর পরে ইউরোপের ধূলো পা থেকে ঝেড়ে ফেলেছি, মনের আনন্দে এক তূর্কী টুপী (Fez) মাথায় দিয়ে নামলাম বন্দরে। সঙ্গে বোম্বাইয়ের রতন তাতা। তাঁরও তূর্কী তাজ মাথায়। খুব খানিকক্ষণ শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে শ্রান্ত হয়ে এক কাফীখানায় দুজনে বসলাম তূর্কী কাফী খাব বলে। একটী ভিখারী মেয়ে এসে মেণ্ডোলীন বাজিয়ে গান গাইতে লেগে গেল। বেশ গলা মেয়েটার, আর আমাদের জানা ফরাসী ও ইটালীয়ান চুটকী গান অনেক-গুলো গাইলে। আমরা মাঝে মাঝে সিকিটা দুয়ানীটা ফেলে দিয়ে গায়িকার উৎসাহবর্দ্ধন করছিলাম। ক্রমশঃ বেশ ভিড় জমে গেল। তখন আমি বললাম, "চল, একে জাহাজে নিয়ে যাওয়া যাক, তাতা! খুব মজা হবে।" রতনজী রসিক লোক ছিলেন, তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। বন্দরে পৌঁছলে, তিনি গিয়ে কাপ্তানের অনুমতি নিয়ে এলেন। জাহাজের বড় ডেকের উপর গান জুড়ে দেওয়া গেল। ইংরেজ অফিসারের দল সেই দিকে ভেঙ্গে পড়লেন। প্রায় ঘণ্টা-খানেক জলসা হল। শেষ হয়ে গেলে মেয়েটা তাতার ও আমার সামনে এসে "Pasha!" বলে মুসলমানী প্রথায়

কুর্ণীশ করলে। আমরা কিছু কিছু বখশীস দিলাম। ব্রিটিশ সেনানীরা নেটীবের কাছে হার মানবেন! তাঁরাও বেশ কিঞ্চিৎ পেলা দিলেন।

গায়িকা যখন নেমে গেল, তার চোখে জল। এর ভেতর একটু romance ছিল। তবে নিতান্ত মামুলী রকমের। মেয়েটী মল্টা দ্বীপবাসিনী। বয়স কুড়ির বেশী হবে না। বছর দেড়েক আগে একজন ইটালিয়ান ওকে ভুলিয়ে এখানে নিয়ে আসে। কয়েকমাস একত্র ঘর করার পর, একদিন হঠাৎ লোকটা কোথায় উধাও হয়ে যায়। সেই থেকে মেয়েটী রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে ভিক্ষা মেগে খাচ্ছে। অত্যন্ত কষ্টে দিনপাত করছে। কিছু টাকা সংগ্রহ হলেই সে ধারধোর শোধ করে দিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারে। এই কাহিনী সে বন্দরে আসতে আসতে আমাদিকে বললে। আমি বিশ্বাস করলাম। তাতা করলেন না। ইংরেজ অফিসারেরা, জাহাজের কাপ্তান, এরা ত কিছু জানতই না। জানতে চায়ও নেই! তাতে কিছু এসে গেল না। মেয়েটার সবসুদ্ধ ছয় সাত পাউণ্ড রোজগার হল সেদিন। সে তার দেশে ফিরে গেল কি না, কে জানে!

আমি কিন্তু যথাসময় আমার দেশে ফিরলাম, যদিচ বুকে চাপরাস!